দিনান্ত

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

লেখকের অন্যান্য বই :

ফসল	(গল্পগ্রন্থ)	—১৲
বৃত্ত	(উপন্যাস)	—১॥০
মরামাটি	(উপন্যাস)	—২৲
সংকলিতা	(কবিতা)	—১॥০
কার্ল মার্ক্স	(জীবনী)	—১৲

দিনান্ত

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র
এভিন্যু, কলিকাতা হইতে সত্যপ্রসন্ন
দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন—১৩৫০ বাংলা
মূল্য—৩৲ টাকা।

ভ্রম-সংশোধন :
১৭৩—১৭৬ পর্য্যন্ত পত্রাঙ্কগুলি ভুলক্রমে
দুইবার ছাপা হইয়াছে

দিনান্ত

এক

এখন অবনীবাবুকে দেখে সবাই বল্‌বে পুরুষ-সিংহ। চোখে তাঁর আশ্চর্য্যরকম একটা প্রশান্তি। উঁচু পাহাড়ে উঠে দূরের সমতলের দিকে মানুষ যে রকম চোখ নিয়ে তাকায় তেমনি একটা বুদ্ধ-ভাব তাঁর চোখে। মনে হয় তাঁর রক্তে আছে কেমন যেন নিরুত্তেজ গভীরতা—নদীর মোহনার মত।

সত্যি, একটা দুঃসাহসিক জীবনের দুরন্ততা ত ফুরিয়েইছে তাঁর। পঞ্চাশোর্দ্ধে মানুষের অশান্ত প্রাণের আর কতটুকু শক্তি থাকে? ক্লান্ত। অবনীবাবু খানিকটা ক্লান্ত হয়েই পড়েছেন। কিন্তু সে-ক্লান্তি সুস্বাদু। সার্থক শ্রমের শেষে একটা সিগারেট টানার মত আরাম আছে তার। মধ্যপথের বিশ্রাম এ নয়, তাই উদ্বেগ নেই। তাই কাঁটার মত খচ্ করে বিঁধে এক একটা মুহূর্ত্তকে তা সজাগ করে দেয়না। এ তাঁর নিটোল অবসর, জীবন প্রসন্ন হাতে বিতরণ করেছে। বিস্ময়কর, স্তূপীকৃত কীর্ত্তির গায়ে হেলান দিয়ে আছেন অবনীবাবু—সে-কীর্ত্তি মজবুত, জীবন্ত, যৌবনদৃপ্ত। সে আর তাঁর বুদ্ধির কাছে বা ক্ষমতার কাছে ঋণ গ্রহণ করতে আস্‌বেনা। যেন ইন্সিওরেন্স পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে, ফুরিয়ে গেছে প্রিমিয়ামের দুশ্চিন্তা।

প্রথম যৌবনের রুক্ষ, তামাটে চেহারাটারও অদ্ভুত তাঁর পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। শক্ত, কুচকুচে চুলগুলো উঠে গিয়ে একটা ধোঁয়াটে সিল্কের মসৃণতা এসেছে মাথায়। মাথার সৌষ্ঠব, অনেকটা শালীনতাও যেন এসেছে মনে হয় তাতে। চুলের সঙ্গে মানানসই কপালের পালিশ

যৌবনের মাংসহীনতায় যে পাথালি রেখাগুলো জাঁকিয়ে বসেছিল তা-ও যেন বুঁজে আস্ছে এখন। গায়ের চামড়ায় একটা স্নিগ্ধ হল্‌দে ছোপ। দীর্ঘ ঋজু্ শরীর একটু ঝুঁকে পড়েছে। এটুকু শৈথিল্য আভিজাত্যব্যঞ্জক, ঘানিটানার স্মৃতি তাতে নেই।

কর্ম্মঠ জীবনকে অবনীবাবু্ পরম নিশ্চিন্ততায় গুটিয়ে এনেছেন, বাইরের জগত থেকে টেনে-টুনে নিজের মধ্যে এনে জড়ো করেছেন। সামাজিক নিমন্ত্রণ এড়ানো অসম্ভব হলে যখন তাঁকে বেরুতে হয়, সিডান-বডির বিরাট বুইক গাড়িটার পেছনের সীটের কোণ-ঘেঁসে ঝিলিতি সিগারের পাতলা ধোঁয়ার আড়ালে জড়সড় হয়ে তাঁকে বসে থাক্‌তে দেখা যায়। পায়ে বাছুরের চামড়ার নিউ কাট্‌ জুতো জোড়া প্রায় সবসময়ই নূতন। নূতন অবিশ্যি তাঁর ক্রোমের চটি জোড়াও, যা শুধু দিনের পর দিন ল্যান্সডাউন এক্সটেনশ্যনের ফিকে বাদামী রংএর তেতলা বাড়িটার পেটেণ্ট ষ্টোনের মেঝেতে পায়চারি করতে দরকার পড়ে।

বাড়িতে ভীড় আছে। বিরাট ইস্পাতের কারখানাটার মতো এ ভীড়ও তার নিজেরই সৃষ্টি। যেম্নি অবধারিত আর নির্ভুল তাঁর কারখানার যন্ত্রগুলোর নড়াচড়া, এ ভীড়ের জীবনকেও তেম্নি ভেবে নিয়েছেন অবনীবাবু। তাঁর অগোচরে থেকেও বাড়ির মানুষগুলো সূর্য্যোদয়-সূর্য্যাস্তের মতোই অপ্রচ্ছন্ন নিয়মানুবর্ত্তিতায় জীবন যাপন করে যাচ্ছে। এ সান্ত্বনাতেই তিনি ভীড় থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পেরেছেন।

দিগন্ত যতটুকু দেখা যায় অবনীবাবুর চোখে তার সবখানিই নির্ম্মেঘ। ফুস্‌ফুস ভরে তিনি নিশ্বাস নিতে পারেন। তাঁর এই উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের আকর্ষণেই হয়ত অ্যাপোপ্ল্যাক্সি-ভীত রিটায়ার্ড সাবজজ মুকুন্দবাবু রোজ একবার হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। দক্ষিণের

মস্ত দুটো জানালা দিয়ে অবনীবাবুর দোতলার ঘরে ঝড়ের মত লেকের হাওয়া আসে। অবনীবাবুর পাতলা চুল আর আদ্দির ফতুয়া উড়তে থাকে—দুলতে থাকে এমন কি মুকুন্দবাবুর ঢিলে-গলার লং-ক্লথের পাঞ্জাবীটাও।

"বেড়িয়ে এলেন?" টাইসনের 'ক্যাপিটেল' কাগজটা থেকে মুখ তুলে চোখে অভ্যর্থনা নিয়ে তাকান অবনীবাবু।

"হেঁটে এলুম—প্রায় তিন মাইল চক্কোর।" হাঁপ-ধরা নিশ্বাসের ফাঁকেও মুকুন্দবাবুর কণ্ঠে উৎসাহ শোনা যায়।

"হাঁটা ভালো।"

"ভালো, নয়? সার্ভিস্ লাইফের এ অভ্যাস আমার!" মুকুন্দবাবু যেন একটা পারিতোষিক পাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

"খুব ভালো অভ্যাস। চলা-ফেরাই ত জীবন, বিশ্রামটা মৃত্যুর কাছ থেকে ধার নেওয়া।" অবনীবাবুর কথায় একটু দার্শনিক ভঙ্গী আসে।

প্রসঙ্গত-ও মৃত্যুর কথা শুন্‌লে মুকুন্দবাবু একটু চম্‌কে ওঠেন। এম্নিতেই অবসর-পাওয়া জীবনে অভিশাপের মতো মৃত্যু তাঁর পেছু নিয়েছে। সে অভিশাপকে ভুলে থাকবার জন্যে খুঁটে খুঁটে কাজ তাঁকে আবিষ্কার করতে হয়। নিরুৎসাহ চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে লেক-মার্কেটে রোজ তাঁর যাওয়া-আসা। পাশ বই হাতে নিয়ে কোনো সুপরিচিত বাঙালী ব্যাঙ্কের 'দক্ষিণ-কলিকাতা শাখা'য় তাঁর নিয়মিত আবির্ভাব হয়। বাঙালী ব্যাঙ্কের এজেন্টের কাছে আতিথেয়তা পাওয়া যায় প্রচুর, কেবলমাত্র সেই প্রলোভনেই তাঁর সাবধানী মন বাঙালী ব্যাঙ্কের আংশিক পক্ষপাতী। তাঁর আবির্ভাবে এজেন্টের তটস্থ ভাব দেখে তিনি যে বাঁধান দাঁত কাঁপিয়ে খানিকক্ষণ সৌজন্যের হাসি হেসে নিতে পারেন তা বড় কম কথা নয়। হাস্‌তে পারাটা ভালো, স্বাস্থ্যকর। তারপর আছে তাঁর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বা প্রফেসরদের কাছে যাতায়াত। কয়েক বছর ধরে ছেলে

বা মেয়ে কেউ-না-কেউ তাঁর য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষা দিয়ে আস্‌ছে। তাদের সাফল্য শুধু বই পড়ার উপর নির্ভর করে না—তাই প্রথম-প্রথম একটু বিরক্ত হয়ে আর শেষটায় নিজেরই আগ্রহে পরীক্ষকদের সঙ্গে তিনি পরিচয়ে জম্‌তে সুরু করলেন। এ সবই তাঁর ঘরের বাইরেকার জীবনের জন্যে। হাঁটবার জন্যে কতগুলো লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে নেওয়া।

"আপনি ত ঘর থেকে বেরুনই না!" ব্যাপারটা হাসির না হলেও মুকুন্দবাবু উঁচু গলায় হেসে ওঠেন।

"ভালো লাগে না। টই-টই করে ত সমস্ত জীবনটাই কাটিয়ে দিলুম!" সেই জীবনের ক্লান্তিতেই যেন এখন অবনীবাবুর ঠোঁটের দু'পাশ নীচের দিকে ঝুলে পড়ে।

"বিশ্রাম আপনার প্রয়োজন। এত বড় অ্যাক্‌টিভ লাইফের শেষে শরীর বিশ্রামই চায়। কিন্তু একদম চলাফেরা বন্ধ করে দিলে কিন্তু বিপদ আছে—" একটু থেমে নিয়ে মুকুন্দবাবু সে-বিপদটারও আভাস দেন: "ধরুন না অম্বলই হল!"

"না-না, হজমে আমার গোলমাল নেই।"

তাইত অবাক হয়ে যান মুকুন্দবাবু, বসে বসে থেকে একটা লোক কি করে স্বাস্থ্য ঠিক রাখে। অবনীবাবুর মসৃণ শরীরটার দিকে তাকিয়ে একটু যেন ঈর্ষাই হয় তাঁর। ঈর্ষা-টা অপূর্ণ জীবনের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কি? শুধু স্বাস্থ্যের জন্যে নয়, সাফল্যের জন্যেও মুকুন্দবাবু অবনীবাবুকে ঈর্ষা করতে পারেন।

"রোদে জলে গড়া-পেটা শরীর ত আপনার—" ঈর্ষাটা শেষে তাচ্ছিল্য দেখাবার ইচ্ছা হয়ে দাঁড়ায়।

"সে খুবই ঠিক। ভাব্‌তে নিজেই অবাক হয়ে যাই একেক সময়—" ছোট ছোট শাণিত চোখে অবনীবাবু যেন ঠিক্‌রে ওঠেন: "অফুরন্ত খেটে

গেছি মশাই দশ-দশটা বছর। কোম্পানী করব, কেউ বলেছে চোর কেউবা জুচ্চোর। একটা সামান্য লেদ-মেসিনের টাকা যোগাড় হয়নি পঞ্চাশ দুয়োর হেঁটে। শেয়ার যারা কিনতেন তাঁরাও ভাবতেন টাকাটা আমায় ভিক্ষা দিলেন। আজকের কথা বল্‌ছিনে, আজ ত কোম্পানী করে হোটেল ষ্টার্ট করলেও শেয়ার বিক্রী হয়। ভাবুন ১৯১০ সনের কথা যখন চাকরী-তীর্থ ছাড়া বাংলা দেশ আর কিছু জান্‌তনা।"

মুকুন্দবাবু কথা শোনেন না—কথাগুলোর দিকে যেন চেয়ে থাকেন। নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে যাবার মত অপর্য্যাপ্ত দমও আছে অবনীবাবুর! কিন্তু শেষের কথাটা সত্যি যেন তিনি শুন্‌লেন—তাঁর হাকিমী বুদ্ধির সূক্ষ্ম জালে কথার হুলটা সহজেই আটকে গেল। একটু ব্যথিত হয়েই তিনি বল্‌লেন: "জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সাহস ছাপোষা বাঙালীর কোত্থেকে হবে বলুন।"

"কিন্তু ছা পোষা নিয়েই বিব্রত থাক্‌লে জীবনকে কি পাওয়া যায় মুকুন্দবাবু?"

না পাওয়া যাবার কারণ কি? সমস্তটা জীবনের উপরই যেন মুকুন্দ বাবু একবার চোখ বুলিয়ে আনেন। বেশ ত কাটিয়ে এলেন তিনি জীবন। মাকে কাশীবাস করিয়েছেন, ভাইদের মানুষ করে তোলবার চেষ্টাও তাঁর ছিল—মানুষ তারা হতে চাইল না, তা আর কি করা? তারপর স্ত্রীর কাছে পাতিব্রাত্য পেয়েছেন প্রচুর—সেবায়, একনিষ্ঠায়, সন্তান-উৎপাদনে। দু'টি মেয়ের বর এঞ্জিনিয়ার আর ডেপুটি, বড় ছেলে বিলেতে। বাকি একটি ছেলে আর একটি মেয়ে কলেজের ধাপে ধাপে। তার জীবনের উপর দোষারোপ করবে কে? খুঁত ধরবার মত কিছু নেই তাতে। বাঙালীর সহজাত অর্থনৈতিক নিষ্পেষণকেও তিনি তাঁর সুশৃঙ্খল জীবনের কাছে ভিড়তে দেন নি। বলুক লোকে তাঁকে কৃপণ, তিনি ত নিজেকে জানেন

মিতব্যয়ী বলে! মুন্সেফির বহুনিন্দিত আয় নিয়েও টাকার টানাটানিতে কোনো দিন তাঁকে আক্ষেপ করতে হয়নি। জীবনের নিরুত্তেজ অথচ গভীর স্বাদ পেয়েছেন মুকুন্দবাবু। তৃপ্তিতে কোথাও ত্রুটী নেই। এই অভ্যস্ত সুস্বাদটাই তাঁর জীবন। তাই অনভ্যস্ত মৃত্যুকে তাঁর এত ভয়।

ঠোঁট আর থুত্নীর উপর হাত চালিয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করেই বসে থাকেন মুকুন্দবাবু। কেমন নিরুপায়-মত মনে হয় তাঁর চোখগুলো। অবনীবাবু সহানুভূতিতে একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়েন: "অবিশ্যি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে পরিবারটাই সব। তার পাকচক্রেই ঘুরে মরছি—" অবনীবাবুর সুস্থ হাসির সঙ্গে মুকুন্দবাবুর অসুস্থ হাসি এসে যোগ দেয়: "নিজেও আমি কি করেছি বলুন? জীবনের সঙ্কটগুলো জয় করতে চেয়েছি পরিবারে সুখশান্তি আন্বার জন্যেইত!"

একটু খুসী হলেন মুকুন্দবাবু: "আপনার কথা আলাদা! আপনার মত কৃতীলোক বাংলাদেশে লাখে একজন মিল্বেনা। দেশের কত লোককে খাওয়াচ্ছেন আপনি।"

অন্যের চোখে নিজের আরেক রকম চেহারা দেখে সাম্লে গেলেন অবনীবাবু খানিকটা: "স্বদেশী করিনি মশাই কোনোদিন। কিন্তু বন্ধুবান্ধব সেদিনে অনেকেই স্বদেশী ছিলেন—তাঁদের স্পিরিটটা আমার ভেতরে গিয়ে হয়ত হজম হয়ে গিয়েছিল। দেশের ক'টা লোক খেতে পরতে যাতে পায়, লোহালক্কড়ের ব্যাপারে দেশ যাতে খানিকটা আত্মনির্ভর হতে পারে—এধরণের চিন্তা হয়ত তখন করতুম।"

"বড় কাজের পেছনে একটা উদার আদর্শ থাকতে হয় বৈ কি!" নানানসই রকম অনেক কথাই মুকুন্দবাবু বল্তে পারেন যাদের মানে তাঁর জীবনে কোনোদিন সক্রিয় হয়নি। অবসর-প্রাপ্ত জীবন চিন্তাজগতের নৈরাজ্য উপভোগ করে। সে-জীবনের উপর কোনো রকম কাজেরই যখন

দাবী নেই, কাজের জীবন থেকে যখন তোমাকে বাতিল করা হয়েছে—যে কোনো দুঃসাহসিক আলোচনায় নির্ভয়ে যে কোনো রকম দুঃসাহসিক মন্তব্য তুমি করতে পার। তখন সার্ভিসে ছিলেন মুকুন্দবাবু—সি, আর, দাশ যখন অসহযোগ আন্দোলনের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ক'টা বছর কি আশঙ্কাতেই গেছে তাঁর—কখন কোন্ ছেলেমেয়ে সে-আগুনে গিয়ে হাত দেয়! বড় মেয়ে তাঁর তখন বিয়ের জন্যে তৈরী হচ্ছে—শিল্প-প্রতিভার সম্পদ একে একে জড় করে তুল্‌ছে ভবিষ্যৎ পাণিপ্রার্থীর কাছে যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে। একটা কালো সাটিনের টুক্‌রোর উপর তুলো দিয়ে মোটা মোটা 'বন্দেমাতরম্' অক্ষর বসাবার আয়োজন করছিল মেয়েটি—দেখ্‌তে পেয়ে মুকুন্দবাবু একটা দৃশ্য তৈরী করে ফেল্‌লেন। বন্দেমাতরমের গা থেকে তুলো খসে 'God save the King' তৈরী হল।

"একা আপনি উদার আদর্শ নিয়ে কি করতে পারেন? শেয়ার হোল্ডার বা ডিরেক্টররাত চাইবেন টাকা—তাঁরা বোঝেন বোনাস আর ডিভিডেণ্ড—দেশকে বোঝেন তাঁরা? বুঝ্‌তে পারেন দেশ কি করে বড় হয়? নিজের স্বার্থ ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করবার সময় নেই আমাদের মুকুন্দবাবু—" অবনীবাবু যে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন তা নয়, এ ধরণের কথাগুলো আজকাল তাঁর খুব মুখরোচক।

কিন্তু তাতেই মুকুন্দবাবুর মুখ তেতো হয়ে এল: "টাকা মারা যাবার ভয় থাকে কি না তাই টাকার উপরই শেয়ার হোল্ডারদের ঝোঁক থাকে বেশি!"

এবার অবনীবাবুর চোখে সত্যি-সত্যি বিদ্রোহী বুর্জ্জোয়ার দীপ্তি এসে যায়: "নিজের টাকাটাই কি সব—জাতীয় সম্পদ কথাটার তা হলে মানে নেই? কোম্পানী তৈরী হবে—ফেঁসে যাবে—মানি—মানি তাতে লোকের টাকা মারা যাবে। একটা ন্যাশন্যাল কন্সার্ণ দাঁড় করিয়ে তুল্‌তে

এ বিপদ ত আছেই। বাধা জয় করবার স্বার্থত্যাগটুকুও যদি আমাদের না থাকে তবে কি দেশ বড় হয়ে উঠ্বে হাওয়ায় ?”

অবনীবাবুর কথাগুলো মেনে না নিলে নূতন নূতন সঙ্কটে পা বাড়াতে হয়—মুকুন্দবাবু তা জানেন। তেমন তুর্লভ স্বাস্থ্য মুকুন্দবাবুর নেই—ফুস্ফুসে হাওয়াই নেই তত। খানিকক্ষণ চুপকরে থাক্লেই তাঁর শিথিল ঠোঁটের চামড়া জুড়ে যায়। তেমনি মুখ নিয়েই কলের পুতুলের মত ঘাড় নাড়তে থাকেন মুকুন্দবাবু।

অবনীবাবুর সিংহবিক্রমও তাঁর বয়েসের পক্ষে খুব অনুকূল নয়। হঠাৎই আবার তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন।

অবধারিতভাবে তুকাপ পাতলা সুগন্ধ চা নিয়ে আসে কা[illegible]। এসময়ে এ-ঘরে তুকাপ চা পাঠাতে হয়—অবনীবাবুর স্ত্রী তা জানেন। ঋতুভেদে তু'এক চিল্তে আম, শশা, আপেল, আনারস কি পেঁপে-ও আসে।

উস্খুস্ করে মুকুন্দবাবু পাতলা হাসি হাস্তে চেষ্টা করেন। স্বচ্ছ পোর্সেলিন কাপের কানটা তুআঙুলে ধরে নিয়ে অবনীবাবু বলেন: “অনেক তর্ক করা গেল।”

“তর্ক আর কি ? আলাপ আলোচনা করেই ত এখন সময় কাটানো!”

“চা খান।”

“আজ আর খাবনা ভাব্ছি। অম্বলটা দেখা দিচ্ছে।”

“এত হাঁটেন, তবু ?”

“ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম—আমারই ভাগ্নীজামাই, নতুন প্র্যাক্টিসে এসেছে—এম্-বি—বল্লে তুদিন নিয়ম করে চল্তে।”

“অনিয়ম ত আপনার হবার কথা নয়!”

“হয়ত হয়েছে।”

"চা খেতে বারণ করেন নি নিশ্চয় ডাক্তার—যখন চা খেয়ে অভ্যাস আছে।"

"চা-য়ে একটু অম্বল হয়!"

"ডাক্তার বল্‌লে?"

"না, আমার হয়।"

চুপ করে গেলেন অবনীবাবু। একটু বিষণ্ণই যেন হয়ে পড়লেন। রাগ করেছেন কি মুকুন্দবাবু? ঠিক মেজাজ রেখে কথাবার্ত্তা বলা হয়নি। অবনীবাবু অন্যমনস্ক হয়ে যেতে চাইলেন।

"চেঞ্জে যাব ভাবছিলুম। ডাক্তারও বল্‌ছিল তা-ই।" আবার জমে এলেন মুকুন্দবাবু।

"চেঞ্জ? খুব ভালো।"

"আপনিও চলুন না গিরিডি কি ঝাড়গ্রাম!"

"আমি?" ভুরুগুলো টেনে কপালে তুলে নিলেন অবনীবাবু: "কারখানাতে যাওয়াই আমার চেঞ্জে যাওয়া—শরীরে অসুখ থাক্‌লে সেরে যায়!"

"কাজ থেকে ত প্রায় অবসরই নিয়েছেন আপনি! অসিত ত দিব্যি চালাচ্ছে কোম্পানী!"

"অবসর নিয়েছি বলেই ত ওটা আমার হাওয়া বদলের জায়গা হয়ে উঠেছে—আগের কালের লোক যাকে বল্‌ত তীর্থ!"

"কিন্তু ও তীর্থে যে মোক্ষ নেই—আগাগোড়াই অর্থ!" জোরে হেসে উঠলেন মুকুন্দবাবু—বাঁধান দাঁতগুলোর অস্বাভাবিক সাদা রং-এ হাসিটা কেমন বিশ্রী দেখাল।

"অর্থে আর মোক্ষে কি তফাৎ আছে আজ মুকুন্দবাবু—এটা বেনিয়া-যুগ!"

একথা মনে ভাবলেও মুকুন্দবাবু বাইরে তা মানতে চাইবেন কেন? সপরিবারে তিনি ওঙ্কারানন্দ পরমহংসের শিষ্য। পরমহংসদেবের আশ্রমে মাসিক দু'টাকা চাঁদাও পাঠান। সাড়ে সাতটাকা দিয়ে তার একটা ফটো এনলার্জ করে মাল্যবিভূষিত করে ঘরে রেখেছেন। এইত মাত্র সেদিন ছেলের এগজামিনের আগে গুরুজীর প্রসাদীফুল এয়ার মেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন বিলেত। আমরা মোহান্ধ বলে কি ঈশ্বর-জানিত পুরুষ নেই? খুব আছে। তাঁদের বাণী মিথ্যা নয়। অলৌকিক তাঁদের শক্তি। তাঁদের আশ্রিত হ'য়ে থাক'—মোক্ষের পরোয়া কিসের তোমার? দু'টাকা চাঁদায় মুকুন্দবাবু তেমন একজন মহাপুরুষের আশ্রয় নিয়েছেন।

"সত্যি, আমরা বড্ডই সাংসারিক হয়ে পড়ছি।" অত্যন্ত উদারতায়ই তবু মুকুন্দবাবু নিজেকে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন। এ উদারতায় তাঁর ভয়ের আশঙ্কা নেই, মনে-মনে তিনি ভালো ভাবেই জানেন অপর থেকে তিনি খানিকটা আলাদা। গুরু-সম্পদ ত সবার নেই!

চায়ের কাপটা একটা শ্বেতপাথরের তেপায়ার উপর ফুলদানীর পাশে রেখে দিয়ে অবনীবাবু বল্লেন: "তাতে অবিশ্যি আমরা গুরুতর কোনো অপরাধ করছিনে!"

"অপরাধ হচ্ছে বৈ কি একজায়গায়!" বিজ্ঞের মত হাস্লেন একটু মুকুন্দবাবু অনেকক্ষণ পর।

"ভুল, মশাই, ভুল!" অবনীবাবুর চোখ বিজ্ঞতর দেখাল: "আমাদের সংসার, যা আমরা গড়ে তুলি—এখানে কি তিনি নেই? এখানেই তিনি আছেন—তাই মনে হয় এ-ই আমাদের স্বর্গ!"

সংসারকে নরক মনে করবার মতো মুকুন্দবাবুরও কোনো কারণ উপস্থিত নেই—তবু যদি স্বর্গ বলে আরেকটা কিছু থেকে থাকে সেখানে যাবার

পাথেয় যোগাড় করে রাখাটা মন্দ কি? সবদিক দিয়ে আঁটঘাঁট বেধে ফেলাই মুকুন্দবাবুর অভ্যাস। যাতে কোনোদিকে একটু ফাঁকি বা ফাঁক না পড়ে। নিজের অনুমানে তিনি জীবনকে সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। কাজ কি জটিলতার ফাঁদে পা দিয়ে সন্দেহের গর্ত্তে তলিয়ে যাওয়ায়?

"তাহলে আপনি যাচ্ছেন না? ভেবেছিলুম দুজনেই গিরিডি থেকে ঘুরে আস্‌ব!" মুকুন্দবাবু খুব বেশি নিরাশ হলেন না।

"কলকাতা ছেড়ে গেলে হাঁপিয়ে উঠ্‌ব মশাই—" গভীর মনোযোগে অবনীবাবু একটা সিগার ধরিয়ে নিলেন।

হাঁপিয়ে অবনীবাবু এখনই উঠেছেন। অসিতের অপিস থেকে ফিরে আসবার সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অসিতের মুখে কারখানার আদ্যোপান্ত খবর শুনে নেওয়া তাঁর অভ্যাস। শুনে চম্‌কে ওঠবার বিশেষ কিছু থাকে না—'কারখানা ভালো চল্‌ছে'—এই সহজ, নিরুত্তেজ কথাটাই দিনের পর দিন শুন্‌তে হয়—তবু তা-ই তিনি শুন্‌তে চান। নিশ্চিন্ত ভাবেই জানেন অবনীবাবু কারখানা খারাপ চল্‌তে পারে না। নিজের মত করেই তিনি অসিতকে তৈরী করেছেন—স্বার্থপরের মত ভাবলে বল্‌তে হয়, নিজের প্রয়োজন মতই ছেলেকে তৈরী করে নিয়েছেন। তারপর শেয়ার দিয়েছেন ছেলেকে, ডিরেক্টর হবার মত উপযুক্ত শেয়ার। অসিতকে নিজেদের মধ্যে পেতে আর-আর ডিরেক্টরের আপত্তি হয়নি, শুধু যে অবনীবাবুকে খোসামোদ করবার জন্যেই অসিতকে ডিরেক্টর করবার প্রস্তাবে তাঁরা সায় দিয়েছেন তা নয়, অসিতের উপযুক্ততা মেনে না নেবার তাঁদের কারণ নেই। শিবপুরেরই এঞ্জিনিয়ার অসিত, বিলিতি-ডিগ্রী অবিশ্যি তার নেই—কিন্তু ডিগ্রীটাই ত বড় কথা নয়। কোম্পানীকে গলিয়ে নিতে যে সূক্ষ্মবুদ্ধি আর দূরদৃষ্টির প্রয়োজন, কোনো ডিগ্রী তা এনে দিতে পারে না। তা অসিতের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তাছাড়া

মেসিনগুলো বুঝে নিতে শিবপুরের বিদ্যাই যথেষ্ট। অসিতের চেয়ে উপযুক্ত লোক কোম্পানী কোথায় পাবে ?

এবার উঠে পড়লেন মুকুন্দবাবু। লাঠিটা হাতে তুলে নিয়ে কাপের ঠাণ্ডা চায়ের দিকে নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে বল্লেন: "ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী হয়ে বাড়ী ফিরব।"

"হাঁ—অম্বল হতে থাক্‌লে অষুষপত্র খান !"

"তারজন্যে নয়—উমার হার্টটা কেমন ভালো যাচ্ছে না !"

"ছোট মেয়ের ?"

"হাঁ—এম্নিতেই ও একটু রোগা।"

"পড়াশুনো বন্ধ করে দিন।"

"বলেছিলুম—ও রাজী হয় না।"

রাজী হয় না! একটু তাচ্ছিল্যেই যেন অবনীবাবু চুপ করে গেলেন। আবার 'ক্যাপিটেল'টা টেনে নিলেন হাতে। পরিচিতের ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে বাইরের জগতে এসে ডুব দিলেন।

দুই

অবনীবাবুর বাড়িতে ভীড় আছে কিন্তু তা সাংঘাতিক নয়। তাঁর ছেলে মেয়েরা একজনের প্রায় হাত ধরে আরেক জন পৃথিবীতে আসেনি। অসিতের পাঁচ বছর পর সুপ্রিয়া এসেছিল, তার চার বছর পর সুনন্দা—সুনন্দার পাঁচ বছরের ছোট অজিত পোষ্টগ্র্যাজুয়েটে পড়ে। সুপ্রিয়ার স্বামী ছিল জলপাইগুলির এক চা-বাগানওয়ালার ছেলে—বিয়ের তিন বছর পরেই মারা যায়—বাবার কাছে ফিরে আসে সুপ্রিয়া। সুনন্দা শ্যামবাজারে থাকে—মধ্যবিত্ত একজন প্রফেসরের স্ত্রী—দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রায়ই বাবার বাড়িতে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। অসিতের স্ত্রী অলকা—একটি মাত্র মেয়ে তার—ঝুমুর, সাত বছর বয়েস বলে ঐ নাম, আট বছর বয়েসে স্কুলে দেবার সময় অলকা ভেবে রেখেছে নামের জন্যে রবিবাবুর শরণ নেবে। এরা ছাড়া বাড়িতে আর যিনি আছেন—মনোরমা, অবনীবাবুর স্ত্রী, তাঁর বাড়িতে থাকাটা অবনীবাবুর মতই প্রায় পরোক্ষ। ঝুমুর ছাড়া ঠাকুরচাকরদের মত গলাবাজি অবিশ্যি কেউ-ই করে না—সবাই প্রায় নিজ ঘরের দেয়ালেই নিজেকে নিয়ে বন্ধ হয়ে আছে। যদিও অলকার ঘরই অসিতের শোবার ঘর—তবু আলাদা করে অসিতেরও একটা ঘর আছে। সবার ঘরে যে সবার প্রবেশ অধিকার নেই এমন নয়, তবু সে-অধিকার কেউ খাটাতে যায় না—এমন কি মনোরমারও এ বন্দীদশা, ঝুমুর এ-বাড়ির অভ্যাসটা শিখে উঠ্‌তে পারেনি বলে তিনি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন—আর রক্ষা করে তাঁকে ঠাকুর-চাকররা জ্বালাতন করে'।

তিনি হয়ত চান সবাই তাঁকে বিরক্ত করুক—কিন্তু কার এত অঢেল সময় পড়ে আছে ? অলকা দুবার স্নান করে'—তিনবার মুখে সাবান মেখে'—চারবার চুল বেঁধে'—পাঁচবার কাপড় পাল্টে' যা একটু সময় পায় তাতে খাওয়ায় পাঁচ মিনিট, রবিবাবুর বই উল্টোতে দশ মিনিট আর ঘুমে বিশ-ত্রিশ মিনিটই দিতে পারে না। সুপ্রিয়া তিন বছর ধরে আই-এ পরীক্ষার পড়া তৈরী করছে—বৈধব্য যথাসম্ভব বজায় রেখে তার উপর প্রসাধনও করতে হয়। অজিত বাড়ি থাকেই বা ক'মিনিট ! এক সুনন্দা এলে সংসারের বিলীয়মান দৃশ্যটা মনোরমার চোখের উপর ফুটে ওঠে। সুনন্দার কপালে আর সিঁথীতে সিঁদূর ল্যাপ্‌টানো। আছে রোগা দুটি ছেলেমেয়ে ! দেখা হলেই সুনন্দার মুখের আর শরীরের উপর মনোরমা একবার চোখ বুলিয়ে নেন—আবার কিছু হবে না কি ! সুনন্দা সুপুরি কেটে মাকে পান তৈরী করে দেয়।

তবু বাড়িতে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। আলাদা মৌচাকের সব মৌরাণী বাড়ির লোকরা—তবু সবাই বাড়ির আহ্নিকগতি আর বার্ষিকগতিতে একসঙ্গেই ঘুরছে। কয়েকটা জায়গায় যে এদের মিল আছে তা-ই যথেষ্ট। বাড়ির সবাই জানে তারা সম্ভ্রান্ত, এমন কি মনোরমাও নিজকে তা-ই ভাব্‌তে সুরু করেছেন আজকাল। তবু অতীতটাকে ত সম্পূর্ণ ছেড়ে আসা যায় না !

"এ নোংরা অভ্যাসটা তুমি আর ছাড়লে না, মা, কোনোদিন !" সুপ্রিয়া প্রায়ই বলে : "দাঁতগুলো কি করেছ পান খেয়ে খেয়ে ?"

মনোরমা জবাব দিতে পারেন না পাছে ওর বৈধব্যের ঘায়ে খোঁচা লাগে।

তাতে যেন সুপ্রিয়া আরো পেয়ে বসে : "জান্‌লে বৌদি, সুনিটা-ও যে কি হয়ে উঠেছে আজকাল ! গালে ওর একটা পানের ঢিপি দেখ্‌বে সবসময় !"

হাসির টানে অলকার টুস্‌টুসে ঠোঁটগুলো আরেকটু টান-টান হয়।

বিভ্রান্ত হয়ে মনোরমা বলেন: "বলেছি ত কালুকে বাজার থেকে হত্তুকী আন্‌তে—ছেড়ে দোব পান খাওয়া।"

"হত্তুকী?" কল্‌কল্‌ করে ওঠে সুপ্রিয়ার কপোতী-কণ্ঠ: "তার চেয়ে পানই তুমি খাও মা, সেই ভালো।"

অলকা যাবার আগে ছোট্ট গলায় বলে যায়: "তুমি যে সারাদিন চায়ের কাপ ঠোঁটে নিয়েই আছ—আর মার বুঝি পান খেলেই দোষ?"

"ওটা আমার জলপাইগুড়ির অভ্যাস!"

জলপাইগুড়ির নামেই আবহাওয়াটা থম্‌থমে হয়ে ওঠে। সুপ্রিয়া নিজেও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। স্বামীকেই যে তার মনে পড়ে তা নয়। নিজের অবস্থাটা সম্বন্ধে হয়ত সচেতন হয়ে ওঠে সে। সাদা থান তাকে পরতে হয় না—কালোপেড়ে শাড়ী পরে, হাতে আছে চুড়ি—কিছু খাওয়া-তেও তার আপত্তি নেই কারো—এম্নি ভাবেই আছে সুপ্রিয়া যেন তার বিয়ে হয়নি। কিন্তু বিয়ে যাদের হয়নি, একদিন তাদের বিয়ে হয়, অন্তত আশা করে তারা, বিয়ে তাদের হবে। সুপ্রিয়ার সেদিকে অন্ধকার—সেদিকে সত্যিকারের বৈধব্য। সেদিক থেকে কোনো আলো এসে লাগে না তার চোখে—কোনো ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মনের উপর হাত বুলিয়ে যায় না।

কয়েক বছর আগেও বাবা-মার কথাবার্তায় কৌতূহল ছিল সুপ্রিয়ার। মাকে দোতলায় নেমে যেতে দেখ্‌লেই সে তাঁর পেছু নিত চুপিচুপি।

"হয় না—ছোটলোকরাই বিধবার বিয়ে দেয়। আমি তা পারব না।" বাবা হয়ত বল্‌তেন।

"আজকাল সবই ত হয়!" মেয়ের জন্যে মনোরমা কুসংস্কারও জয় করেছিলেন।

"ভালো ছেলে কাউকে পাবে যে তোমার বিধবা মেয়েকে বিয়ে করবে? ভালো ছেলের জন্যে ঢের কুমারী পড়ে আছে। তাছাড়া বিধবা-বিয়ের আদর্শটাই আমি পছন্দ করিনে!"

"খুকীর মুখের দিকে চেয়ে দেখেছ তুমি?"

"খাওয়া-পরার কষ্ট ওকে দিওনা! শেয়ার লিখে দিয়েছি ওর নামে. টাকা পয়সার অভাব থাক্‌বে না—করুক না পড়াশুনো যতখুসী—বিয়েটা-ই কি সব?"

ঘরের বাইরে আর দাঁড়িয়ে থাকেনি সুপ্রিয়া। অবসন্ন শরীরটা টেনে তেতলার নিজের ঘরে সে উঠে এসেছে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে জড়পিণ্ডের মত চেয়ে রয়েছে বইগুলোর দিকে কতক্ষণ। তার বিছানায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠেছে কান্নায়।

এখন অবিশ্যি আর কাঁদে না সুপ্রিয়া। অনড় অবস্থাটাকে হয়ত তার স্নায়ু খানিকটা সহ্য করেই নিয়েছে। তবু সামনের দিকে তাকালে স্বাভাবিক সে থাক্‌তে পারে না। অন্যমনস্ক হয়ে যায় আর তাই যেন কেমন গম্ভীর দেখায়।

গম্ভীর হয়ে থাকাটা এ বাড়ির রোগ। অলকাও বা কি? চুপ করে আছে সে—কিন্তু তাকে তা মানায় না—তার চোখ, তার ঠোঁট—সমস্ত শরীরটাই তার যেন প্রগল্‌ভ হয়ে উঠ্‌বার জন্যে অস্থির—তবু সে ভীষণ চুপচাপ। মধ্য-সমুদ্রের উচ্ছৃঙ্খলতা শান্ত তট-রেখায় যেমন অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক। চুপ করে থাকতে হবে বলেই হয়ত নিজেকে সে অসম্ভব ভালোবেসে ফেলেছে আজকাল। কথা বল্‌বে সে কার সঙ্গে? ঝুমুরের বক্‌বক্ শুন্‌তে গেলে কান ঝালাপালা হয়ে যায়—ধম্‌কে দিতে হয় ওকে শেষটায়। ঝুমুরের সঙ্গে ছাড়াছাড়িই হয়ে গেছে অলকার একরকম।

আজকাল ঘুমোয়ও ঝুমুর মনোরমারই ঘরে। অসিত আসে রাজ্যের ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা শরীরটাতে বয়ে নিয়ে। দু'একটা কথা বলে অসিত—হাসেও হয়ত। কিন্তু সে-হাসি কেমন যেন অন্যমনস্ক। অনেক—অনেক আগে অপিস থেকে এসে অসিত বল্‌ত : "সিনেমায় যাবে না কি ?"

"মাথা ধরবে !" ইচ্ছা থাক্‌লেও আব্দার আস্‌ত অলকার গলায়।

"তাহলে ষ্ট্র্যাণ্ডে ঘুরে আসি চলো খানিকক্ষণ—গাড়ী বার করতে বল্‌ব ?"

আর এখন ? চোখ বুঁজেই অলকা বলে দিতে পারে অসিত কি করবে। আধ ঘণ্টা ধরে স্নান করবে সে। কালুর হাত থেকে এক কাপ নিয়ে তিন মিনিট তাতে চুমুক দেবে। অলকা হয়ত আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছে, অবিশ্যি সব সময়ই কাজের একটা ছুতো নিয়ে—অসিত চোখ তুলে একবার চাইবেওনা তার দিকে। তারপর চটির আওয়াজ করে নীচে নেমে যাবে নিজের ঘরে। অসিতকে দেখাবার জন্যেই খানিক আগে যে অলকা চুল আঁচ্‌ড়ায় আর নতুন শাড়ী পরে তা নয়—ওটা একটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেছে অলকার। তবু ছোট্ট একটু ব্যথার মত উপেক্ষা পাওয়ার অনুভূতিই তার মনে টনটন করে ওঠে। শাড়ীর বদলে আটপৌরে একটা কাপড় পরতে ইচ্ছা হয়।

রাত্রিতেও সেই একই রকম। দিশি-বিদেশি কতকগুলো কমার্শিয়াল ম্যাগাজিন নিয়ে অসিত হাত-পা ছড়িয়ে পাশের খাটে শুয়ে পড়ে। জানা আছে ঘুমিয়ে পড়লে অলকাই বাতি নিভিয়ে দেবে। কি যে পড়ে অসিত অলকা তা জানে—তবু মাঝে-মাঝে পাশে বসে বলে : "কি পড় ?"

ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে অলকার দিকে তাকায় অসিত। ডান হাতটা জড়িয়ে আনে অলকার শরীরে। একটু হাসেও সে—আগেকারই মতো। লেকের হাওয়া ঘরে ঢোকে। তবু বলে অলকা : "বড্ড গরম।"

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আগেকার মতোই ক্যানটা খুলে দেয়। তারপর অসিতের পাশ ঘেঁসে আবার এসে নিবিড় হয়ে বসে।

"সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়!" অসিতের চোখে নির্লোভ-প্রশংসা দেখা যায়। হাতটা আর জড়িয়ে ধরে না অলকাকে। উদাস হয়ে যায় অলকার চোখ—মনে মনে একটি মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষায় থেকেও বাইরে সে অন্যমনস্ক দেখায়। কতক্ষণ এভাবে কাটে কে জানে! তারপর অসিতের দিকে তাকিয়ে দেখে অলকা—সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উঠে এসে অলকা ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। কলেজে পড়বার সময় ছেলেরা তার দিকে চেয়ে থাক্‌ত। এখনো হয়ত চেয়ে থাক্‌বে।

বাতিটা নিভিয়ে দেয় অলকা। বাতিতে গরম বেশি মনে হয়। সত্যি, বড্ড গরম। গা' ভরে অন্ধকার মেখে নেয় সে। সেমিজের টেপ্‌গুলো কাঁধ থেকে সরিয়ে বিছানায় গা' এলিয়ে দেয়। রাত্রিতে কোনোসময় অসিত জেগে উঠ্‌তে পারে। বাতি জ্বেলে দেখ্‌তে পারে অলকাকে। জাগ্‌তে পারে হঠাৎ তেমন কৌতুহল আর আকর্ষণ যা কলেজের ছেলেদের জাগ্‌ত। পেছনের দিকে তাকিয়ে অলকা এই একটি রোমাঞ্চময় তৃষ্ণার ছবিকেই আজকাল স্মরণ করে।

এ তৃষ্ণাও জ্বরের মতো এ-বাড়ির অনেকের রক্তে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে।

অজিত এ তৃষ্ণার হাতে নূতন শিকার।

বি-এ অনার্স নিয়ে যখন সে পড়ছিল—পুরোপুরি ছাত্র ছাড়া আর কিছু তাকে বলা যায়নি। বাবার সফল জীবনের ছবিটা তাকে উদ্দীপিত করেছে। ভালো হ'তে হবে—খুব ভালো, খুব বড় হতে পারলেই থাক্‌বে তার বাবার মান, বাড়ির ইজ্জৎ। পড়াশুনো ছাড়া কিছুই জান্‌ত না

সে তখন—দিনরাত বই-এ মুখ গুঁজে থেকে পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর উত্তর মগজে সারবন্দী করে নিয়েছে। এবং সত্যি শেষে ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স পেয়ে অবনীবাবুর মুখ উজ্জলতর করে তুলেছে।

পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটে ভর্ত্তি হয়ে অজিত দেখ্‌তে পেলে সে-জগৎ আলাদা। ভারতীয় অর্থনীতির পুঁথিতে ভারতবর্ষের যে শোচনীয় অবস্থার কথা সে শুন্‌তে পেয়েছিল, এখানে এসে দেখলে তার সবটুকুই মিথ্যা। ছেলেরা কেউ হবে হাকিম, কেউ বা দেশনেতা। অফুরন্ত সভা-সমিতি, গান-বাদ্য-সংস্কৃতি। সিগারেটের টিন হাতে আর দামী স্যুট যাদের নেই—মার্সিরাইজড্‌ আদ্দিতে আর কাপড়ে তারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের গোড়াপত্তন করছে। এসব ফ্যাস্নি-ড্রেসে আবার অনেকের বিশ্বাস নেই—তারা খদ্দর পরে, প্রায়ই ময়লা; লম্বা বক্তৃতার ভঙ্গীতে কথা বলে; খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফে তাদের বিপ্লব রোমাঞ্চিত; উস্কো-খুস্কো চুলে বিপ্লবের বৈরাগ্য-শোভা! অজিত শুনেছিল এরা হাকিম, এরা দেশ, জাতি, সমাজ আরো কতো কি! আসলে যে তারা সবাই ময়ুরের মত ময়ুরীকে দেখাবার জন্যেই পেখম ধরেছে এই দিব্যজ্ঞান লাভ হল অজিতের স্যুট-পরার দলে ভিড়ে গিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এখন আর মেয়েদের মনে খুব বেশি কাজ করছেন না। আদ্দি-পরার দল বর্ষামঙ্গল বা শারদোৎসব অনুষ্ঠান করে সহপাঠিনীদের মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারে না। মেয়েরা প্রত্যেকেই অর্থনীতিজ্ঞ—চুলে আর শাড়ীতে এত বেশি খরচ করে এরা যে স্যুটপরা উচ্চাভিলাষী ছাড়া আর কারো উপর চোখ আটকায় না।

এটা ঠিক পড়ার জায়গা নয়—মনে-মনে এক রকম ঠিকই করে নিয়েছিল অজিত। পড়া যদি ছাড়তে হ'ল—তাহলে আর কিছু পাওয়া দরকার। আর তা পেতে যখন আকাশ-পাতাল উল্টোতে হয় না, অজিত

সে সুযোগ ছেড়ে দেবে কেন? স্যুট আর গাড়ি—দুটি দুর্লভ ডানায় ভর দিলে অজিত। আকাশ তখন তার হাতের মুঠোয়।

কোনো বিশেষ মেয়েকে যে অজিত ভালোবাস্‌ত তা নয়। গোড়ায় সে সব পছন্দসই মেয়েদের উপরই ভালোবাসাটা চারিয়ে দিয়েছিল। দৃষ্টি চালিয়ে দিত সে সবার মাথার উপরে, কথা বল্‌ত পরিমিত, হাস্‌ত ঠোঁটগুলো নীচের দিকে ভেঙে দিয়ে। তাকে মেয়েরা দেখুক, ভালোবাসুক আর পুড়ে যাক্। নিরোর মতো হিংস্র আনন্দই ছিল যেন তার কতকটা। মেয়েদের কমনরুমের পাশ দিয়ে অবিশ্যি যাতায়াত করত সে অনেকবার, অকারণে লাইব্রেরীটা ঘুরে আস্‌ত—সব সময়ই কান খাড়া রেখে আশা করত মেয়েরা তার কথাই বলাবলি করবে। তাকে দেখবার জন্যে কমনরুমের দরজায় যে মেয়েদের ভীড় হয়নি এমন নয়—টের পেয়ে আরো নির্লিপ্ত ভঙ্গী আস্‌ত তার চোখে-মুখে।

একদিন শোনা গেল হিষ্ট্রি ছেড়ে একনমিক্সে এসে ভর্ত্তি হয়েছে মন্দার-মালা সেন। আরো শোনা গেল অজিতের জন্যেই না কি তার এই অ্যাড্‌ভেঞ্চার। অজিত শুন্‌ল—লক্ষ্য করল ক্লাশে মন্দারকে। দেখ্‌তে ভালো মেয়েটি, সবচেয়ে ভালো তার চুলের ভঙ্গী, শাড়ীর রং আর ব্লাউজের কাট্। অজিত অপেক্ষা করছিল কবে মন্দার তার কাছে নোটের খোঁজে আস্‌বে।

এবং একদিন মন্দার সত্যি অজিতের কাছে এলো—সিঁড়ির গোড়ায় একটু নিরিবিলিতে দেখা করল অজিতের সঙ্গে।

"আপনার কাছে আমি কারেন্সি পড়ব—পড়াবেন আমায়?" দুপায়ের গোড়ালির উপর মন্দার সমস্ত শরীরটাকে দোলাতে লাগল।

"মাষ্টাররাই ত পড়াচ্ছেন!" অভিজাত হাসি হেসে বল্‌লে অজিত।

"তা কি আমার জানা নেই? আপনি পড়াবেন কি না তা-ই বলুন।"

"আমার কাছে পড়তেই হবে ?"

"ভয় নেই—আপনার ফার্ষ্ট ক্লাশ কেড়ে নোব না।"

"বলা যায় না !"

"যায়। কারণ আমি ত আমাকে জানি।"

"মাষ্টাররা আপনাকে অন্যরকম জানতে পারেন !"

"সে রিস্ক নিয়ে পড়াতে আপনি রাজী নন ?"

"পড়াতে আমি রাজী—রিস্ক যা-ই থাক্ !"

"তাহলে এত কথা বলার কি দরকার ছিল ?" মন্দার তার চোখের তুলি আস্তে বুলিয়ে আন্‌লে অজিতের মুখের উপর।

"দরকার ছিল এত কথা বলার জন্যেই।" মন্দারের চুলের আর শাড়ীর ফিকে সুগন্ধের মতই একটা ফিকে উজ্জ্বলতা লেগে রইল অজিতের চোখে। চোখ তার নির্লিপ্ততার কুয়াশা ছেড়ে তখন লিপ্সার রশ্মিপথ ধরেছে।

তারপর এখন মন্দারকে অজিতের মোটরেও দেখা যায়।

কমনরুমে মন্দার প্রায় দিগ্বিজয়িনী।

এম্নিভাবে অবনীবাবুর সৌরমণ্ডলে গ্রহগুলো যে যার অক্ষপথে ঘুরছে। তবে কারুর ছিট্‌কে সরে যাবার উপায় নেই। সোণার তালে যে যক্ষপুরী তৈরী করেছেন তিনি, তারই সম্মোহনে হয়ত এ-রকম হতে পেরেছে। এ-রকম হয়ে যাচ্ছে ব্যাঙ্কের লেজারে অবনীবাবুর নামের সঙ্গে কালো-কালির একটা বিরাটকায় সংখ্যা ঝুলে আছে বলে'—তাঁর কারখানার লোহাগুলো রূপোর চাক্‌তি হয়ে বেশির ভাগ তাঁরই ভাণ্ডারে এসে জমা হয় বলে'। মন ওদের যতদূরেই যাক—অবনীবাবুর মনের শাসানির বাইরে যাবার শক্তি নেই কারো।

তিন

অসিতও বা কি? যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তার, অন্তত ততটুকু বয়েস যখ পৃথিবী মানুষের স্বাধীনতার কাছে ধরা দেয়। কিন্তু ল্যান্সডাউন এক্স টেনশনের ফিকে বাদামী রং-এর তেতলা বাড়ীতে তার মর্য্যাদা একট শিশুর চেয়ে বেশী নয়। এখানে তাকে কেউ দেখ্‌লে বল্‌বে না, ে এতবড় একটা লোহার কারখানার ওয়ার্কিং ডিরেক্টর!

"ক্রোমিয়াম ষ্টীল তৈরী করবার আরেকটা আলাদা প্ল্যাণ্ট বসানে দরকার এবার।" তিন মাস আগে অবনীবাবুকে একদিন অসিত বলেছিল।

"আমাদের সে হাঙ্গামায় দরকার নেই।" অবনীবাবু একটা বাংল সাপ্তাহিকে নিজের জীবন কাহিনীর উপর চোখ বুলোচ্ছিলেন।

"হলে বেশ একটা ইনোভেশন হত।"

"ইনোভেশন ব্যবসা নয়। পিওর কার্বন ষ্টীলেরই বাজার হবে না— আমরা তৈরী করলে।"

"কারখানার প্রোগ্রেসের দিকটা ত দেখ্‌তে হয়।"

"মুনফা দিয়েই এদেশে তা নির্দ্ধারিত হয়।"

"টেক্‌নিক্যালি আমরাই যদি প্রোগ্রেস না করব—নতুন কোনো কোম্পানী ত সে-দিক্‌ই মাড়াবে না।"

"বড় বড় আদর্শের চেয়ে কোম্পানীর স্বার্থ অনেক বড়!" অবনীবাবু এবার মুখ তুললেন: "জানো, দেশ, জাতীয়তা—এসব জিনিষগুলো অত্যন্ত অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট—আমাদের কারু জীবনে তার কোনো মানে নেই।

কন্‌ক্রিট্‌ ব্যাপার হচ্ছে সচ্ছলতা। তুমি সচ্ছল হয়ে ওঠ—জীবনে যা কল্পনা করনি এমন সব আদর্শের একনিষ্ঠ সেবক বলে সমাজ তোমায় সম্মান করে চল্‌বে।”

বাবার কথাগুলো কেমন স্বার্থপরের মতো শোনাল অসিতের কানে। আজকাল সত্যি যেন তিনি স্বার্থের চারপাশেই ঘুরতে সুরু করেছেন—অথচ দেশের লোক তাঁকে কত ধন্যধন্যই না করছে! স্বার্থপরতা বার্দ্ধক্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য! কোম্পানীর ব্যাপার নিয়ে বাবার সঙ্গে আর আলাপই করতে ইচ্ছা করে না অসিতের। অতীতের গোঁড়ামিকে প্রাণপণে তিনি আঁকড়ে থাকবেন—অ্যাড্‌ভেঞ্চারে তাঁর ভয়—পাছে সাচ্ছল্যের স্রোতে ভাটা আসে। তাছাড়া নিজের বিচার বিবেচনার উপর অন্যায়ভাবে বিশ্বাস করে চলেছেন তিনি—অপরের কথা রাখ্‌তে গেলে মনে করেন তাঁকে ছোট হ'তে হল। তাঁর কাছে অপরের স্বাধীনতার কোনো মানে ত নেই-ই, সুযুক্তিরও মানে নেই।

তার প্রতিক্রিয়াতেই কি অসিত অনেকটা আল্‌গা হয়ে এসেছে অলকার কাছ থেকে? অবনীবাবু মনোরমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না।

এ প্রতিক্রিয়া সত্যি সাংঘাতিক হয়ে উঠ্‌ছে অসিতের বাইরের জীবনে।

কারখানার ফোরম্যানদের পিঠে স্নেহকাতর হাত বুলিয়ে চল্‌তেন অবনীবাবু। সব সময়ই যে কাজ হাঁসিল করবার মতলব ছিল তাঁর তা নয়। অভাব যখন তাঁর নেই—তখন খানিকটা উদার হতে আপত্তি কি? তাতে কারখানার লোকগুলো খুসী থাকে—ভালো মনে কাজ করে—কোম্পানীর উন্নতি হয়। সততার মত উদারতাও ব্যবসায়ের একটা পলিসি। সে-ই পলিসিকে উল্টোতে সুরু করেছে অসিত।

ওদের সঙ্গে মুখ মিষ্টি রাখবার দরকার কি এত ? টাকা নেবে, কাজ করবে। বেকার দেশে টাকা দিতে পারলে লোকের অভাব হবে না তোমার। তাছাড়া ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের কি মানে হয় ? তার মর্য্যাদা ওরা রাখবে না। সব সময়ই তোমাকে ভেবে নেবে তুমি ধনী, কারখানার মালিক, ওদের শুধু ধাপ্পা দিতে চাও। অসিত তাই ওদের ভালোমন্দে নেই। সুইচ টিপলে যেমন নির্ব্বিকার ভাবে কারখানার ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেসে কাজ সুরু হয়—তেমনি একটা অদৃশ্য সুইচের ইঙ্গিতে অসিত কারখানায় চলাফেরা করে।

চারটা বাজতেই তার কামরার পুশ্‌-ডোরটা ঠেলে নিয়মিতভাবে আবির্ভাব হয় দীপকের। ব্লু-প্রিণ্ট গুলোর এষ্টিমেটে ডুবে থেকেই অসিত বলে ঃ "বোস্‌।"

দীপক রুমালটা বার করে মুখ মুছে নেয়—হিমালয় বোকের ফিকে গন্ধ ছড়ায় তার রুমাল। ঘামশুদ্ধ ঘাড়ের পাউডারটা উঠে আসে রুমালের গায়ে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে দীপক, তারপর বলে ঃ "অনেক সময় আমি কি ভাবি জানিস অসিত, তোর শরীরের ভেতর গ্লাণ্ড-ফ্ল্যাণ্ড কিছু নেই—সমস্তটা ভেতর জুড়ে আছে একটা ইন্‌টারন্যাল কম্‌বাশ্চন্‌ এঞ্জিন।"

"তা হলেত ভালোই ছিল—উড়তে পারতুম।" ফাইল গুছোতে সুরু করে অসিত।

"পারতে—কিন্তু এরোপ্লেনেরই মতো—পাখীর মতো নয়।" দীপকের মুখের রুক্ষ চামড়া হাসিতে কুঁকড়ে ওঠে।

"বটে ?" বুদ্ধিমানের ভঙ্গীতে অসিত এক পলক চেয়ে নেয়। তারপর ফাইলগুলো ড্রয়ার জাত করে'—বেল টিপে' গলাটা কলারের বন্ধন মুক্ত করতে চায়।

উর্দ্দিপরা চাপরাশির আবির্ভাবের আগেই দীপক বলে ঃ "চা ? এখন আর কি দরকার ?"

"খেয়ে নে—বস্‌তে হবে খানিকক্ষণ।"

"ফাইল-মুক্ত হলে ত বাবা, আবার কি ?

"চারটায় বেরুতে থাক্‌লে কোম্পানীতে শকুন পড়বে।"

"তোমাদের গন্ধে অন্য শকুনের আসবার যো আছে আর ?"

"তুইও দেখ্‌ছি লেবার ইউনিয়নে নাম লিখিয়েছিস্।"

"তাহলে ত বাঁচতুম। একটা কাজ পাওয়া যেত! সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া ত জীবনে আর কোনো কাজই জুট্‌লনা। একটু আগে বেরুবারও যো নেই—তোমরা দশপাঁচজন ভদ্রলোক হা-হা করে উঠ্‌বে। পাখী হতে চাইলুম বটে—কিন্তু হতে হল পেঁচা!"

চাপরাশি এসে দাঁড়িয়েছিল। চায়ের হুকুম নিয়ে চলে গেল। একটা সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে অসিত কেস্‌টা দীপকের হাতে এগিয়ে দিলে।

কেসের উপর সিগারেটটা বার কতক ঠুকে নিয়ে দীপক বল্‌লে ঃ "কি কাজ তোর পড়ে রইল আর ?"

"সে অনেক ঝঞ্ঝাট!"

"কাজ মানেই তাই। তাইত আর এগুলুম না ও-পথে।"

"ভালো মানুষ বাবা অগাধ টাকা রেখে গেলে ওপথে এগিয়ে দরকারও বা কি ?"

"টাকা আর নেই। শুধু রপ্তানীই করছি যে!"

"আমদানী করতে কে বারণ করেছিল তোকে ?"

"অবিদ্যা। বিদ্যা-দেবীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল কলেজে মনে নেই ?" বিশ্রী দাঁতগুলো দেখিয়ে দীপক হাস্‌ল একবার।

ময়দানবের ক্ষিপ্রতাকেও হার মানিয়ে ইলেট্রিক ষ্টোভে তৈরী চা এসে হাজির হ'ল। এককাপ।

দীপক সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে অস্পষ্ট ভাবে বললে: "ও, তুই বুঝি আর টি-টাইম্ পার হতে দিসনে!"

"তুই চা খা—" অসিত হাত বাড়িয়ে ব্র্যাকেটে ঝোলান কোটটা টেনে নিলে: "আমি একটু কারখানাটা ঘুরে আসি।"

চায়ের ভিজে খয়েরী রং-এ দীপকের কালসিটে শুকনো ঠোঁটগুলো চিকিয়ে উঠ্‌ছিল। এখন বোঝা যায় বেশ খানিকটা লোলুপতা আছে ও ঠোঁটে। সিগারেটের ধোঁয়া আঁকাবাঁকা হয়ে কোথায় মিশে যাচ্ছে, তা-ই অনুসরণ করে চল্‌ছিল তার লাল্‌চে ঘোলাটে চোখ। চোখের কোল ঘেঁসে অনেকটা জায়গা কালো—অনবরত ক্ষুর চালিয়ে দাড়ির গোড়া গুলোকে ঘামাচির মতো উঁচু করে তুলেছে দীপক। সব নিয়ে তবু তাকে সুস্থই দেখায়—প্রকাণ্ড তার শরীরের কাঠামো—মোচড়ানো পেশী, ফুলো-ফুলো রগ। আশ্চর্য্য লম্বা আর মজবুত তার উরু—ট্রাউজারেই যেন তাদের সহজ বলিষ্ঠতা ফুটে উঠেছে সুন্দর ভাবে।

একা বসে থেকেও দীপক গম্ভীর হতে পারেনা। কখনো শ্বাসরোধ করে মুখের ভেতরে সিগারেটের ধোঁয়ার পিণ্ডটাকে জিহ্বা দিয়ে চেটে নিচ্ছিল—কখনো সিগারেটটাকে দু-আঙুলে চোখের উপর তুলে ধরে মনে মনে যেন ওটার সঙ্গেই কথা বলে চল্‌ছিল। একবার একটা শীষ এসেও গিয়েছিল ঠোঁটে—আবার হয়ত মনে পড়ল জায়গাটা অসিতের অপিস, তাই সামলে নিলে ঠোঁটকে।

হয়ত দীপক ভাবছিল সন্ধ্যার পরেকার মুহূর্ত্তগুলোর কথা—ভাবছিল। হয়ত অসিতের সঙ্গে তার ইদানীংকার ঘনিষ্ঠ মেলামেশার কথা। কলেজে ওরা পরিচিত ছিল, বন্ধু ছিল না। এক সন্ধ্যায় হঠাৎ সে পরিচয়

ফারপোর উজ্জ্বল আলোর নীচে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। চা খাওয়াতেই নিয়ে এসেছিল অসিত তার এক শাঁসাল কাষ্টমারকে। পাশের টেবিলে ছিল দীপক, তত নির্দোষ পানীয়ের জন্যে সে অবিশ্যি আসেনি। তবু দীপকের মনে হয়েছিল আভিজাত্যে তারা এক—সে আর অসিত। তাদের আলাপ হল—উস্কিয়ে নেওয়া হল পরিচয়—হল বন্ধুত্ব।......অ্যাস্-ট্রেতে ঘসে ঘসে সিগারেটটাকে নিভিয়ে দিলে দীপক।......অসিতের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে ভীষণ একা ছিল সে। বিয়ে করেনি। প্রেমে বিশ্বাস নেই তার, পয়সায় বিশ্বাস আছে। তাই অনেক শ্বেতাঙ্গিনীরই বিশ্বাস ছিল তার পয়সায়। এখন অসিতকে পাওয়া গেছে—হুইস্কির মুখে অসিতকে সামনে রেখে কথা বলে বলে নিজকে ইচ্ছামত হাল্কা করা যায়। ক্রীক্‌রো, এলিয়ট্‌ রোড বা গ্রাণ্ট ষ্ট্রীটে রোজ হয়ত খুঁজেও বেড়াতে হয় না কোনো পূর্ব্ব পরিচিতাকে।

অসিত নানকিনের পক্ষপাতী—দশজনের চোখের আড়াল বলেও খানিকটা আর তাছাড়া নানকিনের ফুডের খ্যাতি তার অখ্যাতিকে চাপা দিয়ে রাখতে পারবে এই ভরসায়।

“শ্যাম্পেন? তুমি বাবা শ্যাম্পেনই নাও—ওসব আঙ্গুরের রসে আমার চলবে না। সাদা ঘোড়া না হলে ঘোড়দৌড়ই করতে চাইবেনা মেজাজ!” কথায় দীপক ফুরফুরে হয়ে ওঠে।

“স্বাস্থ্যের পক্ষেও ত ভালো শ্যাম্পেন!” অসিতের চোখেও সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

“It is drinking for drinking's sake, my boy—স্বাস্থ্যের কথা বলে কেন আর মন্ত্রের সঙ্গে চোখ ঠারা? তবে হ্যাঁ—You have got a home full of honest creatures—মুখ থেকে তাদের নাকে গন্ধ ঢেলে দেওয়া রীতিমত বে-আদবী। সে দিক থেকে শ্যাম্পেন ভালো।”

"তাছাড়া গাড়ি আর লেকের হাওয়া?" দীপককে কথা বলাতে ভালোই লাগছিল যেন অসিতের।

"ওরা ত শ্যাম্পেনের জুড়ি: ও দুটো থাকলে সত্যি শ্যাম্পেন খাওয়া সার্থক।"

চাউ-এর ডিশ আস্‌তে খানিকটা দেরী। তার আগে কাচের গ্লাসে সোডার বুদ্‌বুদের সঙ্গে হুইস্কির খরের রং ঝিল্‌মিল করে উঠল। গ্লাসে চুমুক দেবার আগে বোঝা যায়নি, দীপক এত তৃষ্ণার্ত্ত ছিল। অসিত মাতাল নয়—খালি পেটে সে স্বাস্থ্যকর মদও স্পর্শ করবে না। ভালো লাগছিল তার ওম্নি দীপকের কথা শুন্‌তে। এখন আরো কতো কি যে সে বলতে শুরু করবে তারই অপেক্ষায় ছিল অসিত।

পকেট থেকে একটা কাগজের পুটলি বার করে অসিতের হাতে গুঁজে দিল দীপক: "নে রাখ—কিনেই নিয়ে এসেছি তোর জন্মে পিপারমেণ্ট। রোজ রোজ পানওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া ভালো লাগে না।"

দীপক মুডে ছিল—একটা পিণ্ট-বোতল খালি করবে আজ। রোজ এ-মুড্ আসেনা। এ-মুড্‌টা দীপকের উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে সত্তা। সে তখন অন্য মানুষ—হীরার মত দ্যুতিময়—শাণিতও হীরার মত। রুক্ষ চোখ মুখে তার তখন রক্তের আর ঘামের সুডৌল মসৃণতা এসে যায় পর্য্যন্ত। তখন অসিতের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতাও এর কাছে ম্লান হয়ে পড়ে।

"আমার একটা থিয়োরি আছে—জানিস অসিত?" দীপকের হাসিটা সুন্দর ম্লান-মত দেখায়: "ভালো লোকের ছেলে ভালো হ'তে পারেনা—চরিত্রটা নিয়ে খুঁতখুঁত করে যাবে যে লোক, মানে সমাজের কাছ থেকে সচ্চরিত্রতার বাহবা নিয়ে যাবে, তার ছেলে চরিত্রহীন হবেই।

আমার নিজের চরিত্রের সাফাই আমি গাইছিনে—বাবা সৎ লোক ছিলেন আমি খারাপ হয়েছি, এটা জেনারেল রুল-এর একটা অত্যন্ত ইন্‌সিগ্‌নিফিক্যাণ্ট উদাহরণ মাত্র।”

দীপক চোখের সামনে গ্লাসটা তুলে নাড়্‌তে লাগ্‌ল। নাড়তেই ইচ্ছা করছিল তার, খেতে যেন ইচ্ছা করছিল না: “অসিত, আজকের দিনে তোদের মর‍্যালিটির জ্ঞান যাকে ভালো বলে তেমন ভালো হওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি নয়। কনফ্লিক্টিং টেণ্ডেন্সিস্ দিয়ে মানুষ তৈরী—উচ্ছৃঙ্খলতা আর সংযম পাশাপাশি তার মনের রাজ্যে বাস করে—আমি আজ সংযমী কাল উচ্ছৃঙ্খল হতে পারি, আজ অত্যাচারী কাল সহৃদয় হ'তে পারি। কিন্তু মানুষ সমাজের চাপে বেছে নেয় একটা টেণ্ডেন্সি, বিপরীত টেণ্ডেন্সি-কে গলা টিঁপে মারতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি ত চুপ করে বসে থাক্‌বে না, প্রতিশোধ নেবেই। অসচ্চরিত্র বৃদ্ধ শেষ বয়সে সাধু না-ও হয়, যে-জীবন সে রেখে যাবে সন্তানে, তা সৎ হ'তে বাধ্য। আমার অনেক সময়ই মনে হয়, বাবা যদি তাঁর জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার দাবী মিটিয়ে যেতে পারতেন, তাহলে আর আমাকে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে হত না।”

অনেকটা ক্লান্তই যেন হয়ে পড়ল দীপক। গ্লাসে চুমুক দিল সে, যেন একটা তৃষার্ত্ত সাপ আপ্রাণ জল খেয়ে নিচ্ছে।

চাউ এল। প্রকাণ্ড গরসে দীপক মুখে তুল্‌তে লাগল সেই মাংস ডিম-তরকারীতে জড়ানো ঘি-ভাতের মণ্ড।

অসিতেরও তাতে অরুচি নেই তবে আগ্রহ ততটা ছিল না।

“আচ্ছা দীপক—” লালা-সিক্ত ভারি গলায় বল্‌লে অসিত: “তুই কি বল্‌তে চাস্—তোর জীবনে কোনো হতাশা আসেনি—কোনো মেয়ে এসে চলে যায়নি?”

চাউ-এর প্লেটে মুখ গুঁজেই দীপক বল্‌লে : "নোঃ—" একটা গরম সীসার গুলির মত শব্দটাকে দীপক মুখ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল।

"সচরাচর উচ্ছৃঙ্খল জীবন-দর্শনের পেছনে হতাশাই থাকে!" ঠোঁট চেপে হাস্‌তে লাগল অসিত।

প্লেট পরিষ্কার করে মুখ তুললে দীপক: "আমাকে আর যা-ই ভাবিস অসিত—আমি মিডিয়োক্রিটি-র উপরে। হতাশ হওয়া, অভিযোগ করা, ভয়েভয়ে থাকা—ওগুলো অত্যন্ত সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম। আমি মনে করি বিয়ে করে একটী স্ত্রী-তে আসক্ত হয়ে থাকা দুর্ব্বলতার সামিল, সাধারণ মানুষ এ দুর্ব্বলতার উপরে যেতে পারেনা। সাধারণ দুর্ব্বল মানুষরাই পলিগেমি-কে গালাগাল করে, কেননা পলিগেমি-র রাজত্বে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'র আইন অনুসারে অসাধারণ লোকরাই মেয়েদের ভোগ করে যায়, সাধারণ দুর্ব্বল মানুষ উপোসী পড়ে থাকে! পলিগেমি-তে আমি বিশ্বাসী—কিন্তু তোদের এই মনোগেমাস্ পবিত্র সমাজে পলিগেমির সে-স্কোপ নেই—স্কোপ যদি বা থাকে রাজাবাদশাদের মতো ধনদৌলত নেই কিম্বা কুলীনদের মতো অবিবেচকও নই—কাজেই আমি গণিকাসক্ত!"

শ্যাম্পেনের টক-টক স্বাদটা ঠোঁট থেকে জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে অসিত একটু জোরেই হাস্‌ল এবার: "যে উচ্ছৃঙ্খলতার পেছনে জৈবিক কারণ নেই—আছে দার্শনিকতা তা কিন্তু ক্যান্‌সারের মতোই রোগ—কিছুতেই সারে না।"

নিষ্কম্প হাতেই বাকি হুইস্কিটুকু ঢেলে নিয়ে দীপক বললে: "রোগটা সেরে যাক—তাত আমি চাইনে। জানি ও সারবে না।" দীপকের বদলে অসিতই একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিয়ে সিগারেট ধরালে। দীর্ঘ-নিশ্বাসটা দীপকের জন্য নয়—হয়ত নিজেরই জন্য। অত্যন্ত সুস্থতার

ন্যে। একটা নিস্তেজ স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অসিত আর শ্বাস নিতে পারছে না। সুস্থতা তার মনে অসুস্থ হয়ে উঠছে ক্রমে। মনে হয় রোগই তার শরীরের পক্ষে দরকার—জীবনের পক্ষে দরকার—বাঁচবার ইচ্ছাকে তীক্ষ্ণ করে তোলবার জন্যে দরকার।

চার

পিপারমেণ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেনা অসিত। লেকে কয়েক চক্কোর খাম্‌কা ঘুরতে হয়। মুকুন্দবাবুকে লেকে দেখা গেলে ব্যস্ত হাতে ষ্টীয়ারিং ঘুরিয়ে গড়িয়াহাটার পথ ধরে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় নেশাটা গোলাপী হয়ে আসে কিন্তু মুখের গন্ধ ফিকে হতে থাকে। গন্ধটা নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে না পারলে অসিত বাড়ি আসেনা। তবু সন্দেহ থেকে যায়। বাথ্-রুমে আধঘণ্টা কাটাতে হয়—অনেকক্ষণ ধরে যে স্নান করে তা নয়, মুখ ধোয় অনেকবার লিষ্টারিন দিয়ে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেও মগজে যেন জলতরঙ্গ বাজতে থাকে—বিলম্বিত টুং-টাং আওয়াজ—ভালোই লাগে অসিতের। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে পায়চারী করতেও ভালো লাগে। এ-সময়ে চা না খেলেও চলে—তবু আচরণের স্বাভাবিকতা রক্ষা করবার জন্যে চা খেতে হয়। চুপ করে বসে থাক্‌তে ইচ্ছা করে খানিকক্ষণ—নিজেকে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ। খাস-কামরায় নেমে যায় অসিত। জীবনের আঁটঘাঁটগুলো খুলে গেছে যেন খানিকটা—একটু মুক্তি, জীবনের দিকে একটু পেছন ফিরে থাকা। ভালো লাগে।

হয়ত জীবনটাকে নিয়ে ক্লান্তই হয়ে উঠেছে অসিত। কাচের চৌবাচ্চায় রাখা মাছের মত। জল আছে—আলো আছে তবু তা রোজ একই রকম—একই রকম বিচরণের পথ, নিজের ইচ্ছার চেয়ে ঢের কম জায়গা। সচ্ছল বাঙালীর চেয়ে ঢের বেশী সাচ্ছন্দ্য আছে অসিতের—তবু কি একে সাচ্ছন্দ্যের শেষ সীমা বলা যায়? লোভ! সত্যি অসিত

লোভী। হাত বাড়াতে পারলেই যখন পাওয়া যায় আর পাওয়া গেলে সুখী হওয়া যায়, লোভ তখন আপনা থেকেই আসে। তখন নির্লোভ হতে যাওয়া ভ্রূণহত্যারই মতই অপরাধ।

ক্লান্তিকে দুহাতে সরিয়ে নূতন একটা উত্তেজনার মধ্যে বাঁচবার জন্যেই নানকিনে যায় অসিত—তার জন্যেই হয়ত দীপককে তাঁর দরকার। কিন্তু তা কতক্ষণ? আবার ফিরে আসে পায়ে-বাঁধা শেকলের গোড়ায়। আশ্চর্য্য, অলকার মধ্যেও উত্তেজনা খুঁজে পায়না অসিত। মোহ সৃষ্টি করবার মতো স্বাস্থ্য আছে অলকার—ধার আছে চেহারায়, কথাবার্ত্তায় চালচল্‌তিতে—এ মেয়েকে ভালো লাগলে সংস্কৃতির দুর্নাম হয়না—তবু অসিতের কাছে যেন অলকার চুম্বক-শক্তির কোনো মানে নেই। ব্যবহৃত হয়ে গেছে বলে কি অলকা, না কি অসিতের হাতের মুঠোয় একান্ত ভাবে আছে বলেই ওকে ভালো লাগেনা তার? মনে মনে সে-প্রশ্নও করেনা অসিত। এ ব্যবধান রচনায় সামান্য গ্লানিও নেই তার মনে। অলকাকে নিয়ে তার মনের যেন আর কোনো ইচ্ছা নেই—এ যেন তার শরীরের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

নেশার বাঁধুনিও আল্‌গা হতে সুরু করে শেষটায়। প্রাণহীন জগতে ফিরে আসে অসিত। অবনীবাবুর ঘরে গিয়ে ঢোকে সে।

অবনীবাবু অসিতেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন বোঝা যায়: "ডিভিডেণ্ড বাড়িয়ে দাও—মার্কেট যখন ভালো দেখা যাচ্ছে—শেয়ার হোল্ডাররা তার সুবিধে পাবেনা কেন?"

দূরে একটা চেয়ার টেনে অসিত বসে: "রিজার্ভ-টা ষ্ট্রঙ্ করা উচিত। কতো রকম আপদ-বিপদ আছে!"

"আপদ-বিপদ যা ছিল আমি কাটিয়ে এসেছি—তার জন্যে এখন আর তোমার চিন্তা করতে হবেনা—" কোম্পানীর উপর নিজের প্রভাবটাকে

চেপে ধরতে চান অবনীবাবু। আর তাতে একটু বিরক্তও হয়ে ওঠেন মনে মনে। তাঁর মতামতগুলো আপনা থেকেই অসিতের বুঝে নেওয়া উচিত আর কোম্পানীরও সে ভাবেই চলা দরকার। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তিনি চাননা।

তবু অসিত হাল ছেড়ে দেয়না: "লোকে নানারকম বল্‌তে পারে, টিপ্পনি কাট্‌তে পারে কাগজগুলো।"

"কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়না? হাজার টাকা বিজ্ঞাপনে বাড়িয়ে দাও।"

"ভাব্‌ছি তা-ই দোব।" শেষটায় অবনীবাবুর সঙ্গে অসিতকে আপোষই করতে হয়। তাতে দুঃখিত হবার কারণ থাক্‌লেও দুঃখিত হয়না অসিত।

বাবার কাছে অনেকক্ষণ বসে থাকা উচিত নয়। নিজের সুস্থতাটাকে বেশি বিশ্বাস করা যায়না। আবার খাস কামরায় উঠে আসে অসিত।

দীপক বলে: "পিতা-স্বর্গ আইডিয়াটা খুবই খারাপ যদি বাপ জোর করে সে আইডিয়া ছেলেপিলেদের মনে বসিয়ে দিয়ে যান।" কথাশুদ্ধু দীপকের মুখটা অসিতের চোখের উপর ভেসে ওঠে। কথাটা সত্য হলেও অসিতের তা মেনে নেবার দরকার নেই। তাছাড়া অদ্ভুত অনেক কথাই বলে দীপক—ব্যর্নার্ডশ'-র সাকরেদ—পুরোদস্তুর সিনিক—তার জগতে ভালোর সম্ভাবনাটুকুও বেঁচে নেই। "ভালো?" দীপক বলে: "ভালো যে কি তা এখনো বুদ্ধি দিয়ে বোঝা গেলনা। বড় কথাই বল্‌ছি শোন্। তোরা যারা আজকের দিনের সভ্যতাকে বাহ্‌বা দিস—বাহ্‌বা দিস কা'কে জানিস, বড় বড় কয়েকটা ফ্যাক্টরীকে, ট্রেন-ষ্টীমার ব্রীজকে, এরোপ্লেন-টকি-টেলিভিশন-রেডিয়োকে! এরাই কি সভ্যতা, না সভ্যতা আজকের দিনের মানুষগুলোর মন আর জীবন? আজকে দিনের সমস্ত

মানুষের জীবনের দিকে চেয়ে বলতে পারবি জোর করে, অসিত, যে আমরা ভালোর দিকে এগুচ্ছি—অসভ্যতার পথ থেকে ক্রমেই সভ্যতার পথে যাচ্ছি ?”

অনেকদিন আগে শোনা গানের মতো দীপকের কথাগুলো হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে যায় অসিতের চিন্তায়। দীপকের মতো জীবনটা একটা রোগ নয় অসিতের কাছে। ক্লান্তি আছে জীবনে—তাকে মুছে ফেলবার শক্তিও আছে তার। তবে ইচ্ছামত তাকে মুছে ফেলা যায়না—কতগুলো স্নেহের আর সৌজন্যের বন্ধনকে স্বীকার করে নিতেই হয়। অসিতের মনে হয় অবনীবাবু যেন তার চারপাশে ঘুরছেন। পাহারা দিচ্ছেন ? না, মুখের ভঙ্গী কঠিন হলেও স্নেহাতুর তাঁর চোখ। এ বাড়িতে এখনো বোধহয় স্নেহ বেঁচে আছে—যা অনেকের বাড়িতেই নেই।

ঢালাই-এর ফাল্‌তু পায়াগুলোতে হাতুড়ি-বাটালি চালায় যে বিলাস-পুরী কুলীর দল তাদের জীবনে কি স্নেহ বেঁচে আছে একটুও ? অসুখে মরে গেছে ঘরে বৌ-ছেলেপিলে, তখনও কারখানায় বসে বসে হাতুড়ি চালিয়েছে সেই পশুর দল—এমন অনেক ঘটনাই ত চোখের উপর দেখেছে অসিত। একবার তার কাছে একটি রোগা বাচ্চা মুসলমান ছেলে এসে বলেছিল ঃ “নোকরি দাও সাহেব।”

দশ বছর বয়সের ছেলে বলেই তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল অসিত ঃ “তুই কি নোক্‌রি করবি ?”

“বাপ বলেছে নোকরি লাও, তবে ঘরে খেতে পাবে।”

এ তবু স্বাভাবিক। এ-ছাড়াও আছে। মুকুলের সঙ্গে কি ব্যবহার করলেন সেদিন মুকুন্দবাবু ? বিলেত থেকে এসেছে মুকুল মেম নিয়ে। সে-অপরাধের ক্ষমা হলনা আর—মুকুন্দবাবুর ঘরে ঠাঁই ত হলই না মুকুলের —সঞ্চিত টাকার ভাগও না কি সে পাবেনা !

এরচেয়ে ভালো—অনেক ভালো আছে অসিত।

হঠাৎ ঝুমুর এসে ঘরে ঢোকে। বাবার কাছে সে আসেনি, বাবা ঘরে নেই এ ভরসাতেই এসেছিল। ঝুমুর ভয়ে-ভয়ে তাকায়। তারপর চলেই যাবে ভাব্‌ছিল, অসিত তাকে ডাকে : "এই-এই শোন্—"

অসিতের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ায় ঝুমুর। ওর নরম তুল্‌তুলে শরীরটা অসিতের মনকে কেমন যেন অবশ, স্নিগ্ধ করে তোলে : "আজ ইস্কুলে যাওনি কেমন ?"

"বাঃ—যাইনি ? কাকুইত গাড়িতে নিয়ে গেল !"

"তাহলে কাল যাওনি—ঠাকুরমার কাছে বসে বসে দুষ্টুমি করেছ।" অনর্থক বকে যাচ্ছে অসিত।

"ঠাকুমা বলেছেন ?—আমি ডাক্‌ছি ঠাকুমাকে।"

"ডাক্‌তে হবেনা। যাওনি কেন তা-ই বল !"

"অনেকদিন আগে আমার জ্বর হয়েছিল—তখন যাইনি। সে-ত ঠাকুমা-ই যেতে দেননি !"

"ঠাকুরের কাছ থেকে টক্ চেয়ে নিয়ে খেয়েছিলে—তা-ই জ্বর হয়েছিল ?"

"বারে—মিছিমিছি বানিয়ে বানিয়ে তুমি কথা বল !"

"তাহলে ম্যাগ্নোলিয়ার গাড়িকে ডেকেছিলে !"

আইসক্রীম খেতে সত্যি ভালোবাসে ঝুমুর। আর হয়ত জ্বরের আগে ম্যাগ্নোলিয়া খেয়েওছিল। রাস্তায় ম্যাগ্নোলিয়া-ডাক শোনা গেলেই ঠাকুমার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকাতে হয় ঝুমুরকে—আর কিছু করতে হয়না। আইস্‌ক্রীম তার হাতে এসে ওঠে।

বাবার বাহুমুক্ত হবার চেষ্টা করে এবার ঝুমুর। বাবা যে সব জানেন এই ভয়ই করে সে সব সময়। বাবাকে তাই তার ভয়।

অসিত হাত আল্‌গা করে আনে। হেসে বলে: "দাঁড়াও তোমার বই-এ লিখে দিচ্ছি—'আইসক্রীম খেলে জ্বর হয়'—"

ছুটে দরজার কাছে গিয়ে ঝুমুর বলে: "আজও ত খেয়েছি আইস্‌ক্রীম—হয়েছে আমার জ্বর ?"

ঝুমুর চলে গেলেও খানিকক্ষণ মনে মনে হাস্‌তে থাকে অসিত। নিজেকে বেশ খানিকটা হাল্কা মনে হয়।

এবার জরুরী ফাইলগুলো খুলে চোখ বুলোবার পালা।

কতো গোপন কাগজপত্রে ফাইলগুলোর যে পেট ফুলে উঠ্‌ছে দিনের পর দিন—কতো জটিল ব্যাপার—তা শুধু জানে তুটোপ্রাণী—সে আর তার বাবা। তাদের রহস্য অসংখ্য কীটের মতো কিল্‌বিল্‌ করছে এ তুজনেরই চিন্তায়—আর কেউ তা জানেনা—জানবার দরকারও বোধহয় কারু নেই। রোগ যদি কিছু থেকে থাকে কোম্পানীর—দশজনকে তা দেখিয়ে বেড়াবার দরকার কি—তারাইত আছে তার চিকিৎসক। বাইরের লোক এর সুস্থ চেহারাটাই দেখুক। দীপক অবিশ্যি বলে: "শেয়ার হোল্ডারদের খুব ধাপ্পা দিচ্ছ বাবা!"

অসিত তার উত্তর দেয়: "ওঁদের তুশ্চিন্তার লাঘব করা যদি ধাপ্পা হয়, তবে তাই।"

"ওঁদের একটু চিন্তা করতে দাও—ওঁরাও ভাবতে শিখুন কোম্পানীটা ওঁদের!"

"সেই ডেমোক্র্যাসিতে গোলমালই হয়—কাজ হয় না!"

"তা-ই বুঝি একনায়কত্ব ? প্রায় পৈতৃকসম্পত্তির সামিল করে তুলেছ ত কোম্পানীটাকে!—আবার বিজ্ঞাপন ঝাড়বে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে'!"

"আলবৎ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান! দেশের র মেটিরিয়্যাল দিয়ে আমি

ফিনিশড্ গুড তৈরী করছি যাতে দেশের লোকের বিদেশের মুখাপেক্ষী না হ'তে হয়। এম্পলয়মেণ্ট দিচ্ছি আমি দেশের লোকদের—কোথায় এর জাতীয় প্রতিষ্ঠান হতে ত্রুটি থাক্‌ল বল্!"

"যেহেতু তোমার কোম্পানীকে টিঁকিয়ে রাখতে জাতির কোনো চেষ্টা থাকবেনা—তাই এটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়।"

"জাতি আত্মহত্যা করলে সে-দোষ আমাদের নয়।"

"জাতি তোমাদের ডিরেক্টর বোর্ডের স্বার্থরক্ষা ন করতে চাইলে সেটা-ও জাতির দোষ হবেনা।"

অসিত চুপ করে যায়। দীপকের কথায় ধার থাক্‌লেও তা দায়িত্বহীন। বীজ বপন করে মানুষ ফসল ভোগ করতে পারবে আশায়—ফসল বিলিয়ে দেবার ইচ্ছা কারু থাকেনা। পথিকের ছায়ার জন্যে যারা বৃক্ষরোপন করত, সেই মানুষ আজকের দিনে বেঁচে থাক্‌তে পারেনা। বাঁচবার জন্যে তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ—পরিশ্রমীরা বাঁচবে শুধু। তেমন অনেক পরিশ্রমীর মিলিত শক্তিতেই দেশ বড় হ'বে—সব দেশ এই করেই বড় হয়েছে।

"কিন্তু পরিশ্রমীর প্রতিষ্ঠান তাঁর ছেলেই সুচারু ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে এ কেমন কথা? দেশে ত তাঁর ছেলের চেয়ে যোগ্যতর মানুষ থাক্‌তে পারে!" চোখ বুঁজে দীপক ঘাড় নাড়তে থাকে।

"যেহেতু পরিশ্রমী মনে করেন যে তাঁর ছেলেই তাঁর মনের ও ধারণার একমাত্র উত্তরাধিকারী।"

"হেরিডিটির মূর্খতা সম্বন্ধে কোন বক্তব্য না করেই বল্‌ছি অসিত, কোম্পানী কি চিরদিনই পরিশ্রমীর ধারণাকে ধারণ করে থাক্‌বে? পরিশ্রমীর ধারণার বাইরে কোম্পানীর প্রোগ্রেস্ হবেনা?"

আবার চুপ করতে হয় অসিতকে। দীপকের কথাগুলোকে এবার

আর প্রলাপ মনে হয়না তার। তাই চুপ করতে হয়। অসিতের ট্র্যাজিডির তারটাকে ছুঁয়ে যেতে চায় দীপক। এখন চুপ করে থাকাই ভালো।

ফাইল রেখে উঠে পড়ে অসিত। এলোমেলো চিন্তার জন্যে যে তার কাজ বাধা পায় তা নয়। আসলে কাজই তার ফুরিয়ে যায়। কোম্পানীর গোপন তথ্যগুলো তার মুখস্ত কি না তা-ই সে পরীক্ষা করতে আসে—মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়েই উঠে পড়ে অসিত।

এবার অলকার ঘরে—মানে তার শোবার ঘরে। একটা পোষা বিড়ালের মতই অলকাকে মনে হয় তার—ওর প্রতি অন্যমনস্ক থাকাটা যেন অপরাধ নয়। অসিত এখন যেন কতকটা সজ্ঞান ভাবেই অন্যমনস্ক থাকে। প্রতিহিংসার মতই একটা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে তার মন। সব—সবই তার বাবার কীর্ত্তি—অলকার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা পর্য্যন্ত। নিজের ধারণাকেই তিনি রূপ দিয়ে গেছেন। অলকা যে তার স্ত্রী—দিনের পর দিন—বৎসরের পর বৎসর—যুগের পর যুগ অলকাকেই কেন্দ্র করে যে ঘুরতে হবে অসিতের—এ-ও যেন অবনীবাবুর একটা পুরোণো ধারণার কঠোর আদেশ। অলকাকে পাশে দেখেও তাই অনেকক্ষণ কথা বল্‌তে ইচ্ছা করেনা অসিতের। রেডিয়োর স্যুইচ-টা টিপে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

চেতনার কোন্ একটা অদৃশ্য কোণ থেকে দীপকের 'পলিগেমি থিয়োরী' অজস্র পোকার মত কিল্‌বিল্ করে ওঠে তার চিন্তায়। অলকার চেয়ে অনেক অনেক ভালো মেয়ে ত আছে যাদের সবাইকে অসিত পেতে পারে! ভালো মেয়ে বলে বা কথা কি—অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে—সাধারণের চেয়ে নিচু যারা—তাদের কারু সঙ্গেই ত অসিতের দেহের পরিচয় হলনা। একটা বিশাল দুর্দ্ধর্ষ জাহাজের নাবিক সে, আর সম্মুখে

পড়ে আছে সীমাহীন সমুদ্রের বিচিত্রতা, কি সার্থকতা আছে তার বন্দরের সামান্য একটু নিরুপদ্রব জলে নোঙর করে থাক্‌বার? পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হতে চায় মানুষ--ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠ্‌তে চায় মন সবাইকে ছুঁয়ে-ছেনে। সে উদ্দাম ইচ্ছাকে অনুভব করে অসিত তার শরীরে। "Sex is really only touch--the closest of all touch"—কিন্তু সে ছোঁওয়াকে ভয় করে চলে মানুষ, তুলে রাখে চারদিকে তার শাসন আর অনুশাসনের প্রাচীর। রেডিয়োটা বন্ধ করে দিয়ে অলকা এগিয়ে আসে: "সিউড়ি যাব, বাবা যেতে লিখ্‌ছেন বারবার!"

"ভালো।" খানিকক্ষণ গম্ভীর থেকে নিজেকেই বেমানান মনে হল অসিতের: "বারবার লিখলে একবার যেতে হয়।"

"জানো এবার গুরুদেবের কাছ থেকে নিশ্চয়ই বুমুরের জন্য একটা নাম নিয়ে আস্‌ব।"

"গুরুদেবের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

"সে বিয়ের আগে—বাবার সঙ্গে গিয়েছিলুম একবার তাঁকে প্রণাম করতে।"

"ও—সেই প্রণামের জোরে এই দাবী জানাবে?"

"বাঃ তা কেন?"

"তাছাড়া কি? তুমি ত নন্‌-অফিসিয়াল রবীন্দ্র-ভক্ত।"

"তার মানে?"

"তার মানে বোলপুরের ছাত্রী নও।"

"সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবেনা!" অলকা ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে দেয়—যার ফলে অসিতকে বুঝতে হয় এ সব ব্যাপারে অনধিকার প্রবেশ করা তাকে মানায় না।

একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে তার পৃষ্ঠা উল্টোতে থাকে অসিত। খানিকক্ষণ পরে বলে : "ঝুমুর ও যাচ্ছে নাকি ?"

"ঠাকুমা-কে ছেড়ে ও যাবে ?"

"পাত্রীটিকে না দেখলে কবির ইন্‌স্পিরেশ্যন হবে কেন ?"

"এখন ত না-না-ই করছে, যাবে হয়ত শেষটায়।"

"কবে যাচ্ছ ?"

"তা জানা কি তোমার পক্ষে খুব দরকার ?" কেমন যেন অন্ধকার হয়ে আসে অলকার মুখ।

অসিত ও কালো হয়ে যায়। একটা অপরাধ যেন সমস্ত গোপনতার বাধা দুহাতে সরিয়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্তের জন্য অসিতের সমস্ত সাহস, মনের দুর্দ্দান্ত অভিযান ধুয়ে মুছে সাদা হয়ে আসে। তারপর আবার সে খুঁজে পেতে সুরু করে নিজেকে। তাই ম্যাগাজিনে ডুবে যায়।

জানালার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে অলকা। তারপর সে ফিরে আসে। এগিয়ে আসে অসিতের দিকে। অন্ধকারের তীব্রতা যেন দুহাতে মুখে মাখিয়ে নিয়েছে সে। তাতে সমস্ত শরীরটাই তার অসুস্থ দেখায়।

"আমি জানি—"

চমকে উঠে অসিত দেখ্‌তে পায় কোন সর্পিণী যেন ফণা তুলে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আমি জানি—" বিষাক্ত ধ্বনি নিয়ে ফুটে ওঠে আবারও অলকার কথাগুলো : "আমার এখানে থাকবার মানে হয়না। আমার কাছে আস্‌তে হয় বলে নিজেকে তুমি ভুলে থাকৃতে চাও।"

অসিতের মাথায় আবার যেন নেশার তারগুলো রিণ্‌ঝিন্‌ করে বেজে ওঠে। বুঝ্‌তে চেষ্টা করে সে অলকাকে।

"আমি জানি, তোমাকে মদ খেতে হয়।" অসিতের কানে অভিশাপের মতো শোনায় এবার অলকার কণ্ঠ। তাই তাকে আত্মরক্ষা করতে হয়। চুপ করে থাক্‌লে আরো কোন্‌ আঘাত আস্‌বে কে জানে ?

"তুমি জান্‌লে ততটা ক্ষতি নেই—চেঁচিয়ে ওকথা বল্‌লে যতটা ক্ষতি।" অসিত চোখের আশেপাশে বিদ্রূপের রেখা ফুটিয়ে তোলে।

"ভয় নেই, সে-ক্ষতি তোমার করবনা।" অলকা পাথর হয়ে যায়।

"শুনে সুখী হলুম।" অসিত তাড়াতাড়ি আবার ম্যাগাজিনটা টেনে নেয়। যে পাতায় ওটাকে প্রথম খুলে ধরে তারই হরফগুলোর উপর দিয়ে চোখদুটোকে টেনে নিতে সুরু করে। টেনে নেওয়া হয় কিন্তু কি ওতে লেখা আছে কিছুই সে জান্‌তে পারে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে অলকা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। নিজের কাছে নিজেকে এত কুৎসিৎ আর কোনোদিন তার মনে হয়নি। শরীরের উপর ঘৃণায়—শরীর থেকে আলগা হয়ে আস্‌তে ইচ্ছা করে তার। কোনো এক অনিচ্ছুক পুরুষকে যে সে এতদিন তার শরীর সেধে এসেছে, সে অনুভবটাই অসিতের উদ্ধত নির্লজ্জতায় আজ যেন অবারিত হয়ে পড়ল। তাকে সহ্য করা যায় না। রেলিং-এর কোনায় একটা থামের ছায়ায় সরে এলো অলকা। হঠাৎ চোখ ছেপে জল এসে গেছে। পেটেণ্ট ষ্টোনের মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে কয়েকটা ফোঁটা।

পাঁচ

ঝুমুরকে সুপ্রিয়ার জিম্মায় রেখে মনোরমা এ-সময়টায় অবনীবাবুর ঘরে একবার ঘুরে আসেন। অবনীবাবু এককালে হয়ত স্ত্রৈণ ছিলেন, কিন্তু এখনকার জীবন আর বয়েস তাঁকে স্ত্রীর প্রতি ততটা মনোযোগী হতে দেয়না। তবু এসময়টা তাঁর মনোরমার জন্যে খালি পড়ে থাকে—সমস্ত দিনে এই এক আধ ঘণ্টা।

দূরে একটা চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস টানেন। দীর্ঘনিশ্বাসটা অবনীবাবুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে।

"বৌমা কালই যাবেন না কি সিউড়ি?" অবনীবাবুর গলায় গৃহস্বামীর গাম্ভীর্য্য নেমে আসে।

"হাঁ অজিত নিয়ে যাবে বল্‌ছিল।"

"হঠাৎ এসময়ে যাবার কি দরকার পড়্‌ল!"

"বাপ-ভাইদের দেখ্‌তে ইচ্ছা করেনা?—তোমার বাড়ীতেই বছরাবধি পড়ে থাকবে?"

"মা মারা গেলেন তখন গেলেন না—এখন যেতে চাচ্ছেন—"

মনোরমা অবনীবাবুকে কেটে দিলেন: "বৌমার যাওয়াটা এত কি চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল তোমার?"

অবনীবাবু একটু অপ্রতিভই হয়ে গেলেন যেন। সত্যি এসব ব্যাপারে মনোরমার আগে তাঁর মাথা ঘামানো উচিত নয়। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বল্‌লেন: "তোমার জন্যেই ভাব্‌ছি—ঝুমুর তার মার সঙ্গে যাবে ত?"

"ও কি যেতে চায় ? বল্‌তেই সে কী কান্না !"

"থাকনা ঝুমুর এখেনেই !"

"বৌমার বাপ-ভাইদের বুঝি ঝুমুরকে দেখতে ইচ্ছা করেনা ?"

ঝুমুর আর অলকা দুজনেই চলে যাবে ? মনে-মনে অবনীবাবু কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠেন। ওদের সঙ্গে তাঁর জীবনের খুব বেশি সম্পর্ক নেই—তবু ওদের যাওয়াটাকে নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। বাড়ির আবহাওয়ার যে সামান্য পরিবর্ত্তন হবে তা-ই যেন তাঁর কাছে অসহ্য। এত নিটোল হয়ে সংসারটা তার চারপাশে গড়ে উঠেছে যে সব সময়ই তাঁর ভয়, কখন তাতে টোল পড়ে। সুপ্রিয়ার ক্ষতটা প্রায় বুঁজে এসেছে—পাছে নূতন কোন দুর্ঘটনা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আশঙ্কাতেই তিনি সবাইকে চোখের উপর রাখ্‌তে চান। পিতৃতান্ত্রিকতা কেবল আর ঔদ্ধত্য নিয়েই বেঁচে নেই—তার মনে মমতার একটা পালিস দেখা যায়।

"মন-টন খারাপ হয়নি ত বৌমার—ঠিক জানো ?" আশঙ্কা-ই অবনীবাবুকে দিয়ে কথা বলায়।

"ও কি নূতন বৌ ?" মনে-মনে সন্দেহ থাক্‌লেও মনোরমা অবনীবাবুর কাছে তা ভাঙতে চাননা।

"যাবে বলতেই তুমি বলে দিলে যাও !"

"বার বার চিঠি লিখছেন ওর বাবা।"

"বৌমা হয়ত যাবার ইচ্ছা জানিয়েছেন।"

"ভালো করেছেন। তোমার কাছে ভালো না লাগলে তুমি গিয়ে আটকাও।" একটু বিরক্ত হয়ে ওঠেন মনোরমা।

"আটকাবার কি কথা হচ্ছে ?" অবনীবাবুর গলাও একটু ধারালো হয়ে পড়ে : "বাড়ির একটা লোক থাম্‌কা চলে যেতে পারে ?"

"বেশ ত সে খবর তুমি নাওগে—"

"দরকার মনে করলে নোব!"

যে-স্বামী ভালবাসেন তাঁর সঙ্গে রাগ করা চলেনা—অভিমান চলে। মনোরমা অভিমানী হয়ে উঠলেন: "তোমার সংসারে আমি ত কোনো-দিনই ছিলুম না, সব সাম্‌লে চল্‌তে হয়েছে তোমাকে!"

এমন একটা দৃশ্যের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না অবনীবাবু। চুম্বক-মেরুর ঝড়ে তাঁর যেন কম্পাসের কাঁটা নড়ে উঠ্‌ল—তাঁর মানসিক শান্তিতে মনোরমার অভিমানের ঝড় এসে লেগেছে। একটু নড়ে চড়ে বসলেন অবনীবাবু—গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বল্‌লেন: "রাগ করবার মতো আমি কি বল্‌লুম! একটুতেই আমি চঞ্চল হয়ে পড়ি—তাই বলছিলুম ও-কথা!"

অবনীবাবুকে দুর্ব্বল পেয়ে মনোরমা প্রতিশোধ নিলেন। উঠে ঘর থেকে চলে গেলেন ঘোমটা-টা একটু চুলের উপর এগিয়ে দিয়ে।

অবনীবাবুর মনে হল এমন একটা ঘটনা বুঝি জীবনে তাঁর আর কোনদিন ঘটেনি। ঘটে থাক্‌লেও খেয়াল করবার অবসর তাঁর ছিলনা। দরকারও হয়ত ছিলনা খেয়াল করবার। কখনোও তিনি হোঁচট খাননি। প্রবল বন্যাস্রোতের মতো ছিল তাঁর শক্তি, উদ্যত বাধাগুলো ভেঙে চুরে ছত্রখান হয়ে তাঁর স্রোতেই গা এলিয়ে দিয়েছে। সেই শক্তি আর নেই এখন অবনীবাবুর—গোটা মানুষটাই আছেন তিনি তবু কোন্ অদৃশ্য ছিদ্রপথে যেন তাঁর শক্তি গলে গলে চলে যাচ্ছে। মনোরমা আজ তাঁকে অসহায়ের মতই রেখে চলে গেলেন। মনে হল মনোরমার এক ধাপ উঁচুতে গিয়ে তিনি আর দাঁড়াতে পারেন না। দাঁড়িয়ে এই বাড়ির প্রাণীগুলোর দিকে করুণার চোখে তাকাতে পারেন না।

অবনীবাবু উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। বাইরে দূরে একটা

ছ'তলা বাড়ির বিরাট ছায়ার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কারখানা থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে চলে এসেছেন—ভেতর থেকে দুর্ব্বলতা-ই তাঁকে তা করিয়েছে কি না কে বলবে? বিশ্রাম চেয়েছিলেন অবনীবাবু—শক্তি ফুরিয়ে এলেই হয়ত মানুষ বিশ্রাম চায়। তিনি জানেন তার ইচ্ছার রঙেই কোম্পানী রঙীন হয়ে উঠ্ছে। কিন্তু ইচ্ছার রঙ কি তাঁর এখনও তেম্নি গাঢ়—তেম্নি দৃঢ়—দুর্ব্বলতায় তা কি ফিকে হয়ে যায়নি?

অবনীবাবু ইজি চেয়ারটায় বসে গা এলিয়ে দেন। সাদা, পাণ্ডুর হাতে সিগারের বাক্সটা এগিয়ে নেন কাছে। অসিত কি তার আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে? সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই তাঁর। কোম্পানী লাভ দিচ্ছে বছরের পর বছর। তাঁর জীবনটা হয়ত ঠিক বুঝতে পেরেছে অসিত—বুঝতে পেরেছে তাঁরই যে ছেলে হ'তে হবে তাকে। তাঁরই ছেলে হতে হবে শুধু বাইরের জীবনে নয় বাড়ির জীবনেও।

তাই আজ হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছেন অবনীবাবু যখন শুনলেন অলকা সিউড়ি চলে যাবে। অসিতের পক্ষ থেকে কোনো কিছু অন্যায় হয়নি ত বউমার উপর? এমন হয়ত মনে হতনা তাঁর। মুকুন্দবাবু তাঁর মনকে আশঙ্কার ভরে দিয়ে গেছেন। মুকুলের উপর তিনি অনেক আশা করেছিলেন—আশা করবার মতো ছেলেও সে—চাটার্ড একাউনটেণ্ট নাকি হয়ে এসেছে—কিন্তু বুক ফুলিয়ে হাঁটবার মতো কিছু সে রাখেনি মুকুন্দবাবুর। মেম নিয়ে এসেছে মুকুল—বলে তার বিবাহিতা স্ত্রী। মুকুন্দবাবুকে দেখ্লে সত্যি এখন কষ্ট হয়। হাঁপাতেন তিনি বরাবরই— এখন যেন কিছুতেই শ্বাস নিতে পারেন না। মুকুলের কথা বল্তে বল্তে ছলছল করে উঠেছিল ভদ্রলোকের চোখ। কতগুলো ফাঁকা কথা বলে সান্ত্বনা দিতে গেছেন তাকে অবনীবাবু। কিন্তু নিজেই তিনি

অনুভব করছিলেন একটা আশঙ্কার পাথর তাঁর হৃদপিণ্ডকে চেপে ধরেছে। হৃদপিণ্ডের কাতর শব্দ তিনি শুন্‌তে পেয়েছেন। শেষটায় তাই কথা বন্ধ করে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন বাইরের দিকে।

"ওর মা সেই যে বিছানা নিয়েছেন—আর উঠে দাঁড়ান নি আজ পর্যন্ত।" এতদিনে সত্যিকারের মৃত্যুর ছায়া যেন দেখা যাচ্ছিল মুকুন্দ-বাবুর মুখে।

"কলকাতার বাইরে কোথাও নিয়ে যান।" অবনীবাবুও আড়ষ্টভাবে বলেছিলেন।

"ভাব্‌ছি সবাই যাব এবার চেঞ্জে! ওর পেছনে টাকা ঢেলে অনেক টাকাইত জলে দিলুম—নিজেদের জন্যে কিছুই করিনি—"

"মুকুন্দবাবু, জীবনটা আমাদের দুঃখেরই বোঝা! লোকে মনে করে টাকাপয়সায় কতো সুখ—সে-সুখটা নেহাৎই বাইরের!" হঠাৎ দুঃখবাদী হয়ে উঠ্‌লেন অবনীবাবু।

"ছেলেকে বিলেতে পাঠাননি অবনীবাবু—ভালোই করেছিলেন—"

কথাটা অবনীবাবুর কানে কেমন যেন অভিশাপের মতো শোনাল। ছটফট করে উঠ্‌লেন তিনি। গলাটা একটু পরিষ্কার করে বল্‌লেন: "মুকুলের মতো ভালো ছেলে যে এমন করবে—একি ভাবা যায়! একে অদৃষ্ট ছাড়া আর কি বল্‌বেন বলুন!"

একে অদৃষ্টই বলেন মুকুন্দবাবু—কিন্তু তা বলেও চুপ করে থাক্‌তে পারেন না। এমন কি মুকুলকে ছেলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেও তিনি নীরব হয়ে যেতে পারেন নি—কারণ তা করে তিনি মুকুলের কতটুকুইবা ক্ষতি করতে পারলেন? তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতি করেছে তাঁর মুকুল। সামাজিক খ্যাতির ক্ষতি এবং সব চেয়ে বেশি, আর্থিক ক্ষতি, যা আর কোনোদিন সারবার নয়। বারেবারে সে কথাটা বলে

মুকুন্দবাবু যে অবনীবাবুর চোখে একটু খাটো হয়ে পড়ছিলেন সে খেয়াল তাঁর ছিলনা।

মুকুন্দবাবু ক্লান্ত শরীরটা টেনে চলে গেলেন পরও অনেকক্ষণ অবনীবাবু চোখ বুঁজে চুপ করে ছিলেন। ছেলে যে বাপকে দুঃখ দিতে পারে তিনি যেন তা এই প্রথম শুনতে পেলেন। অসিতের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই—কিন্তু কোনোদিনই যে অভিযোগ থাক্‌বেনা তা কে বল্‌তে পারে? নিরুদ্বেগ জীবনকে তিনি আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ভবিষ্যতের কি জানেন তিনি? হয়ত ভবিষ্যৎ তাঁর জন্যেও সাজিয়ে রেখেছে এমন কোনো ঘটনা যার উপর হোঁচট খেয়ে পড়ে অবনীবাবু ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবেন। সত্যি বল্‌তে কি, অদৃষ্টের উপর কোনো হাত নেই কারু—মিছিমিছি লোকে তাঁকে পুরুষ-সিংহ বলে। ভাগ্য প্রসন্ন না থাক্‌লে পরিশ্রমে তিনি কিছুই করতে পারতেন না। শতশত লোক ত তাঁর চেয়ে বেশি পরিশ্রম করছে—কিন্তু তাঁর মত ফলপ্রসূ হয়েছে কি তাদের জীবন? অদৃষ্টের অন্ধকার মূর্তির কাছে আত্মসমর্পন করে বসে থাকেন অবনীবাবু।

"বাবা—"ডাক শুনে অবনীবাবুর দুর্ব্বল দেহ সচকিত হয়ে উঠেছিল:

"বারবার বাবা লিখ্‌ছেন সিউড়ি যেতে—কয়েকদিনের জন্যে, যাব?" অলকা হাসি-খুসী মুখে চেয়ে থাকে।

"বেশত!" চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসেন অবনীবাবু: "অনেক দিন ত তোমার ওখানে যাওয়া হয়নি!"

"মা মারা গেলেন, তখনো যাইনি। বড্ড একা-একা থাকেন বাবা। ভাইরা বড় নয়ত কেউ—বোনও নেই আর।"

"যাবে ত নিশ্চয়! জ্ঞানবাবুর সঙ্গে আমারও দেখা নেই বহুদিন। কল্‌কাতা আসা ত তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন।"

"ভাবলুম আমিই বলে যাই আপনাকে—কালই হয়ত যাব।"

ঠোঁটটা হাসির রেখায় একটু বেঁকে গেল অবনীবাবুর। চুপ করে রইলেন তিনি। অলকা চলে গেল। অনুমতি নিতে অলকা নিজে এসে উপস্থিত হয়েছিল বলে একটু খুসীই হয়ে উঠ্‌লেন অবনীবাবু। মুহূর্ত্তের জন্যে তাঁর অবিচলিত উচ্চাসনে তিনি আসীন হয়ে রইলেন।

কিন্তু তারপরই নামতে হল তাঁকে অন্ধকারে। কেন নাচ্ছেন বৌমা সিঁড়ি? অলকার হাসিখুসী মুখে তখন এমন কোনো রেখা ছিল কি, যা থেকে এই প্রশ্নের কোনো গূঢ় উত্তর পাওয়া যায়? আবিষ্কারের উন্মাদনায় তাঁর মগজের সবগুলো স্নায়ুতন্তু যেন কলরব করে উঠ্‌ল। তাঁর বিক্ষুব্ধ মন—মুকুন্দবাবু যে-মনকে বিক্ষুব্ধ করে দিয়ে গেছেন আশঙ্কার একটা ছায়া আবিষ্কার না করে শান্ত হবেনা। একটা আঘাত পাবার তার যেন প্রয়োজন আছে—তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। তাই তাঁর এত উৎসাহ।

কিন্তু অনর্থক। হতাশ হতে হল অবনীবাবুকে। মেয়েদের মন খনির চেয়েও অন্ধকার। তাঁর মত সহজ সাধারণ মন নিয়ে মেয়েদের মনকে ধরা ছোঁওয়া যায়না। আর দরকারও বা কি আছে তার? কি হবে জেনে শিকড়ে কোন্ রসের স্রোত বইছে—তিক্ত, কটু, অম্ল কি কষায়!—অবনীবাবু ত দেখ্‌তে পাচ্ছেন গাছের মিষ্টি ফল আর ফুল! রোজকার মকরধ্বজের মতই এই সান্ত্বনাটুকু চাট্‌তে থাকেন তিনি।

তবু আশঙ্কা যায়না। অপেক্ষা করেন মনোরমা কখন আস্‌বেন।

ছয়

সুনন্দা আসে। কয়েকদিন থাকবে বলেই আসে। শরীরটা তার ভালো যাচ্ছেনা। তাতে খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠেননা মনোরমা। এ অবস্থায় শরীর ওর ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। দুবারই এম্নি হয়েছে। ভাত খেতে পারেনা, ভীষণ অরুচি এসে যায় মুখে। রোগা হতে থাকে দিনের পর দিন। শেষটায় ত হাত-পা ভারি হয়ে শোথ নাম্‌তেই সুরু করে। তবু এ কিছু তেমন ভয় পাবার মত নয়। অনেকেরই এ-রকম হয়। বরং সুনন্দাকে দেখে মনোরমা মমে-মনে খুসীই হয়ে ওঠেন। মাত্র ত দুটি ছেলে মেয়ে— টুটুল আর টুলু। সাতাশ বছর বয়েসে এ আর বেশি কি? মনে হয় সাতাশ বছরে সাতটি ছেলেপিলে হলেও মনোরমা নিরুৎসাহ হতেন না।

কিন্তু সুনন্দা সত্যি নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য ওর কোনো কালেই ভাল নয়। টুলুর সময় বাঁচবারই আশা করেনি সে। সেই যে শরীর নষ্ট হয়ে গেছে তিন বছরেও তা সার্‌ল কই? তার উপর এই। এবার সে বাঁচবেনা কিছুতেই। বাঁচলেও শয্যাশায়ীই বোধহয় হয়ে থাকতে হবে তাকে আজীবন। সেই আশঙ্কায় এখনই হিমসিম খেয়ে যায় সুনন্দা। 'মেয়েদের স্বাস্থ্য না থাক্‌লে আর কি রইল?'—কথাটা নীহারের মুখ থেকে শুনে শুনে নিজেও সুনন্দা এখন তাই ভাবতে শিখেছে। নীহার খুসী হয়ে ওঠেনা সুনন্দাকে দেখ্‌লে—মুখে তার আজকাল হাসিই নেই বল্‌তে গেলে। অথচ কয়েক বছর আগেও নীহারের আদরে আর মাথামাখিতে অস্থির হয়ে উঠত সুনন্দা। সতেরো আঠারো বছর বয়েসের ছেলেদের মত কত অদ্ভুত আব্দারই জানাত সে—কে বল্‌বে সে প্রোফেসর, ছাত্রদের

গুরু, উপদেষ্টা! সেই অস্থির দিনগুলো সুনন্দার কাছে স্বপ্নের চেয়েও সুদূর মনে হয়। সে যেন ছিল অন্য কোনো নীহার—আর সুনন্দা ছিল আরেকটি মেয়ে। সে-সুনন্দা যে শরীরে-মনে আজকের সুনন্দা ছিলনা এ-কথা খুবই সত্যি। তখন তার সাহস ছিল। স্বাস্থ্য থাক্‌লে স্বামীর কাছে মেয়েদের সাহসও থাকে প্রচুর। সে-সাহসও হারিয়ে ফেলেছে আজ সুনন্দা। নীহারকে তার ভীষণ ভয়।

বেশিদিনের কথা নয়—সুনন্দারই চোখের উপর নীহারের একটা পুরোণো কাপড় দিয়ে টুটুল আর টুলু টাগ-অব-ওয়ার খেল্‌ছিল। জোর পরীক্ষায় মোটেই তারা উৎসুক ছিলনা—যত উৎসাহ ছিল তাদের কাপড়টা ছিঁড়ে ফেল্‌তে। হঠাৎ ঘরে ঢুকে নীহার ভুরু কুঁচকিয়ে বল্‌লে: "আমি গরীব মাষ্টার—তোমার মতো বড়লোক বাবা আমার নেই। কাপড়টা ছিঁড়ে ফেল্‌ল বলে আমার লাগে।"

"বা রে ওরা খেলছিল যে—"

"ওরা খেলছিল—তুমি কি চোখ বুঁজে ছিলে?" তেতো হয়ে এসেছিল নীহারের স্বর।

সুনন্দা চুপ করে গেছে। আগে হলে অনেক কথাই সে বল্‌ত। এখন আর বল্‌তে পারেনা। ভয় হয়।

এই ভয়ের কথা সুনন্দা মাকে জানাতে পারেনা। মা কি বুঝ্‌তে পারেন না, শরীরটা যে তার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! বুঝতে কি পারেন না, তার এই ঘুণ ধরা শরীরটাকে দিয়ে যে নীহারের কোনো প্রয়োজন নেই! কেন যে মনোরমা খুসী হয়ে উঠেছেন তাকে দেখে, বুঝ্‌তে পারেনা সুনন্দা। একেক সময় কাঁদতে ইচ্ছা করে তার। কিন্তু কান্না চেপে রেখে মুখ কালো করে থাকে।

সুপ্রিয়া তবু খানিকটা লক্ষ্য করে সুনন্দার স্বাস্থ্য : “কি হয়েছে তোর শরীর, সুনি ? হাড়গিলে হয়ে যাচ্ছিস দিনকে দিন !”

সুনন্দা বলে : “তবু ত এখন খানিকটা ভালোই আছি !”

“এই তোর ভালো ? তাহলে নিজেকেই তুই ভুলে গেছিস বল্ !”

“ও—সেই ভালো ? সে-ত টুলু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই গেছে !”

“না বাবু—এ স্বাস্থ্য নিয়ে কি করে যে বেঁচে থাক্‌বে বুঝিনে !” সুপ্রিয়া শরীরটাকে একটু দুলিয়ে নেয়। সুনন্দার চোখের উপর তার অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য ঝলমল্ করে ওঠে। সুপ্রিয়ার চেয়ে খারাপ ছিলনা সুনন্দার শরীর তাই সুনন্দার ঈর্ষা করবার মতো কিছু নেই।

“ক’দিন বা আর বাঁচ্‌ব—বুড়ো হইনি ? টুটুল সাতে পা দিয়েছে !” সুনন্দার গলায় নিস্পৃহতা আসে। সুপ্রিয়া কেমন যেন একটা ধাক্কা খায়। সুনন্দাও জীবন গুটিয়ে ফেলছে ? তার চার বছরের ছোট সুনন্দা। জীবনটাকে শেষের দিকে টেনে নিচ্ছে—এমন কথা ত সুপ্রিয়ার কখনো মনে হয়নি ! সুনন্দার মুখে এ-কথা শুনেও মনে হয়না তার। ভবিষ্যৎটা অন্ধকার বটে—কিন্তু সে ত স্তূপীকৃত অন্ধকার। তাকে অনুভব করবার, অনুভব করে’ ব্যথিত হবার মত ঢের রক্ত-মাংস ত সুপ্রিয়ার আছে ! সেই রক্ত মাংসের একটা অদ্ভুত শক্তিতে সুপ্রিয়া বেঁচে যাচ্ছে—বেঁচে যাচ্ছে স্বাভাবিক ভাবেই। জলপাইগুড়ির চাবাগানের মৃত একটি উত্তরাধিকারীকেও প্রায় ভুলতে সুরু করেছে সুপ্রিয়া—বিরাট ষ্টীল ট্রাঙ্কটার কোন্ এক কোণে তাঁর একটা সযত্ন-রক্ষিত ফটো যে দিন দিন বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে সে খবরও সুপ্রিয়া রাখেনা। পড়াশুনোয় মনোযোগ এসে যায় এখন অনায়াসে। এবার নিশ্চয়ই পাশ করবে সে।

"আমি যদি পড়তে পারি, তোমার পড়াতে কি আছে বাপু?" নীহারকে বলে সুপ্রিয়া।

নীহার প্রায়ই আসে। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসা উচিত। নইলে ভালো দেখায় না। তাছাড়া যাবারও তার জায়গা নেই। অধ্যাপক মানুষ—ব্যভিচারী হওয়া তার চলেনা—তাই তাকে চরিত্রবানই বলতে হবে। অকর্ম্মণ্য হয়ে গেলেও সুনন্দাই একমাত্র মেয়ে, নীহারের জীবনের সঙ্গে যে জড়িত। হয়ত সুনন্দাকেই দেখ্‌তে আসে নীহার। কিন্তু নির্লজ্জের মত একটা অশোভন প্রসঙ্গ তুলে বক্তৃতা দিতে সুরু করে সে।

"মেয়েদের সমানদাবীর একটা তুমুল কলরব উঠেছে"—সুনন্দার সঙ্গে সুপ্রিয়াকেও শ্রোতা পেয়ে নীহার পরম উৎসাহে বল্‌তে সুরু করে: "কি জানেন, সমান হতে চাওয়া কিছু অন্যায় নয়! কিন্তু সমান হবার উপযুক্ততা ত থাকা চাই! হ্যাঁ পারে সে দাবী জানাতে সোভিয়েট রাশ্যার মেয়েরা—এরোপ্লেন চালিয়ে যাচ্ছে লেলিনগ্রাড থেকে আলাস্কা—প্যারাসুট জাম্প করছে—কাজ করছে খনিতে, কারখানায়—এমন কি সুন্দরভাবে ডিষ্ট্রিক্ট সোভিয়েট পরিচালনা করছে! পুরুষের সমান হতে চাইলে তাদের মানায়!"

"হেঁসেল ডিঙিয়ে ওসব কাজে যেতে দাও নাকি আমাদের?" সুপ্রিয়ার গলার অনুযোগটাও জল-কল্লোলের মত শোনায়।

"ও দিতে হয়না—উপযুক্ততা দেখাতে হয়। বাঙালী মেয়েদের কথা আর বলবেন না! শাড়ীর জমকালো ভাঁজে আর চুলের চটুল ঠাঁটে কি একটা অপদার্থ দেহ যে ওরা ঢেকে রাখে তা ভাব্‌তেও শিউরে উঠি! আপনাদের স্বাস্থ্য পেতেও কি আমরা বারণ করি?"

সুনন্দা এ-কথার হয়ত উত্তর দিতে পারত কিন্তু কাল হয়ে যায়।

তা লক্ষ্য করেই যেন সুপ্রিয়ার তর্কে উত্তেজনা আসে : " বাঙালী ছেলেরাও কিছু স্যাণ্ডোর মাসতুতো ভাই নয় ! "

" জানেন ও একটা ভিসাস্ সার্কেল। দুর্ব্বল রুগ্ন মেয়ে কখনও সুস্থ ছেলের মা হ'তে পারে না ! "

" তা হলে ত গোড়ার ব্যাপার জান্‌তে হয়—বাঙালী ছেলে-মেয়ের কে আগে দুর্ব্বল হতে সুরু করেছিল ! "

" সে-ইতিহাস নাই-বা উদ্ধার হল। চারদিকে আজ একবার তাকিয়ে দেখুন না, ভালো স্বাস্থ্যের মেয়ের চেয়ে ভালো স্বাস্থ্যের ছেলে অনেক বেশী। "

" তার অনেক কারণই আছে ! " মুখ টিপে হাস্‌তে সুরু করে সুপ্রিয়া।

সুনন্দার যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আছে। উঠে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নীহার এবার তর্কে আরো উত্তাল হয়ে উঠ্‌তে চায় : " যে কারণ আপনি দেখাবেন তা আমি জানি। হয়ত মেয়েদের শরীর-ধর্ম্মের কথা বল্‌বেন। শরীরের যা ধর্ম্ম তা পালন করে গেলে শরীর খারাপ হয়না কখনো ! "

বয়সে বড় একটি পুরুষের মুখে মেয়েদের শরীরের কথা শুন্‌তে ভালো লাগলেও সুপ্রিয়ার খানিকটা সঙ্কোচ আসে : "ওসব কথা নয়—কি জানো, মেয়েদের সব সময় ঠিক মত শুশ্রূষা হয়না।" পুরুষের কোনো ত্রুটি বা অপরাধের কথা নীহার কিছুতেই মেনে নেবেনা। সে মনে করে কেউ কারো পক্ষে বাধ্য নয়। তাই যদি হত—মনে মনে সে তর্ক করে যায়—তা হলে বাঙ্গালী মেয়ের স্বাস্থ্য ভালো দেখা যায় কি করে ? বাঙ্গালী সব মেয়েই সুনন্দা নয়। আসলে সুনন্দাকে নিয়েই নীহারের মনে সমাজিক সমস্যাগুলো এসে উঁকি দেয়। সমাজতাত্ত্বিক হবার দরকার নেই

তার—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে সে সমাজের দিকে এগিয়ে যেতেও চায়না। কথাবার্তায় সুনন্দাকে উল্লেখ করা নেহাৎ ভদ্রতায় বাধে বলেই কতগুলো সাধারণ প্রসঙ্গ এনে উপস্থিত করে নীহার। তবু সব সময় সুনন্দাই তার লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্য থাকে আর থাকে আক্রোশ। নিরুপায় হয়ে সুনন্দাকে ব্যাবহার করতে হয় বলে এ আক্রোশ।

সেই আক্রোশেই ঠোঁটের রেখাগুলো ধারালো করে বলে নীহার: "তার চেয়ে বলুন নিজের শরীরের যত্ন নেয় না মেয়েরা। চুল বা শাড়ীর পেছনে যতটা পরিশ্রম করে তার সিকিভাগ পরিশ্রমও শরীরের জন্যে ওরা করবে না!"

সুপ্রিয়া আবার মুখ টিপে হাসে: "চুল আর শাড়ীর উপরই তোমার যত আক্রোশ দেখা যাচ্ছে!"

"তার মানে বাবুগিরি। পরিচ্ছন্ন থাকবার বিরোধী নই আমি কিন্তু ভাব্‌তে পারেন—আপনার বোন তিন ঘণ্টা চুল আঁচড়ায়!"

"বুঝলুম ত—আমাদের দোষ দেখে বেড়ানোই হয়েছ তোমার কাজ!"

"তা কেন, আপনার বিরুদ্ধে ত আমার কোনো অভিযোগ নেই!"

"পড়ায় যে আমার মাথা নেই—ওটা কি অভিযোগ হতে পারেনা?"

সেদিক দিয়েই গেলনা নীহার: "ধরুন আপনার স্বাস্থ্য—চমৎকার। আমার খুব ভালো লাগে!"

চম্‌কে উঠলনা সুপ্রিয়া বরং বলল: "আমি নিরামিষ খাই যে, তাই শরীর ভালো!"

নীহারের মুখের স্রোতটা বন্ধ হয়ে গেল, চোখের উজ্জ্বলতাও যেন কমে এল খানিকটা।

"নিরামিষ খেলে শরীর ভালো হয়—তা জানো না বুঝি?" সুপ্রিয়া আরোও বল্‌লে।

"নিরামিষ খেতে সুরু করেছেন আজকাল?" নীহারের গলাটা ম্লান শোনায়।

কোত্থেকে টুলু এসে উপস্থিত হয়—এসে বাবার পাশ ঘেঁসে দাঁড়ায়। অনিচ্ছুক হাতটা নীহার একবার বুলিয়ে আনে ওর মাথায়।

"তোমার মেয়ে যা হয়েছে শোনো—" সুপ্রিয়া বড় বড় চোখ করে টুলুর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়: "আমার বইগুলো নিয়ে রাতদিন আঁকিবুঁকি করবে—কিছু বললে, বল্বে পড়ছে! বিদ্যাদিগগজ ত নয়, দিকহস্তিনী হবে!"

"হস্তিনী হলে ত বুঝতুম তবু একটা মেয়ের মতো মেয়ে হল!" অধ্যাপকের গাম্ভীর্য্য কিছুতেই ঘুচবার নয়: "চেহারার দিকে চেয়ে দেখুন—রিকেটে ধরেছে!"

"নাও বাপু—চুপ কর—চেহারার বাতিকে ধরেছে তোমায়!" সুপ্রিয়া শাসনের হাসি আনে ঠোঁটে।

"ন্যায়ত তা ধরতে পারে ত!"

"কিন্তু তার জন্যে অন্যায়ত কিছু করতে পারনা!"

"অন্যায় আর কই করলুন—" হতাশায় ফাঁকা শোনাল নীহারের কথাটা।

"তার জন্যে যেন দুঃখ হচ্ছে—"

"সে সভ্যতার দেওয়া দুঃখ—নিয়তি হিসেবেই তাকে মেনে নিতে হয়!"

"এর চেয়ে ঢের দুঃখ অসভ্যতার—নিয়তি হিসেবেই তাকে ঘাড়ে চাপানো হয়। মেয়েদের দুঃখের খবর তোমরা জান্তে চাওনা—বোঝনা।" অন্য রকম হয়ে গেল সুপ্রিয়ার গলা।

নীহার চুপ করে চেয়ে রইল সুপ্রিয়ার মুখের দিকে। আগ্রহ ছিল তার সেই নিটোল, সুন্দর মুখটাতে দুঃখের কোনো আঁচড় আবিষ্কার করতে পারে কি না। ঠোঁটের কোনো সূক্ষ্ম রেখা, চোখের কোনো ম্লান পলক

কি ব্যথার কোনো ইঙ্গিত এনে দিতে পারেনা? চেয়ে থেকেই হঠাৎ নীহার বলে ওঠে : "বুঝি!"

নীহারের কথার শব্দটা শুধু ঘরের ভেতরই নয় সুপ্রিয়ার কানেও কেমন একটা অদ্ভুত ঝঙ্কনা নিয়ে বাজতে থাকে। ফ্যাকাসে হয়ে যায় সুপ্রিয়ার মুখ। মনে হয়, সুপ্রিয়া কথা বলছেনা—কথা বলতে চেষ্টা করছে : "কি—কি বোঝ?" কথাটার শব্দ নেই, সবটুকুই হাওয়া।

টুলুকেও মনে থাকে না নীহারের। উঠে গিয়ে সে জানালার কাছে দাঁড়ায়। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড। ফিরে এসে দরজার পর্দার কাছ ঘেঁসে হেঁটে আসে। হাওয়ায় উড়ছে পর্দাটা। শেষে সোফাতেই বসে আবার গা এলিয়ে দেয়।

কিন্তু সুপ্রিয়া তখন ফিরে এসেছে নিজের স্বাভাবিকতায়। নীহার শুনতে পাচ্ছিল সুপ্রিয়া টুলুকে বলছে : "দৌড়ে গিয়ে দিদিমাকে বলে এসোত মা—বাবাকে চা দিতে।"

"চা? চা এখন আর খাবনা—" সমস্ত শরীরের ক্লান্তির ভার নিয়ে বলে নীহার।

"আমি খাব যে—খাও তুমিও।"

"না—আজ থাক্।" ঘড়ি দেখতে সুরু করে নীহার।

"প্রাইভেট টিউটরের মতো ঘড়ি দেখ্‌ছ কি?"

"আপনার ঘরে আমি প্রাইভেট টিউটরই ত!"

"পড়ালে ত খুব—তর্কই করলে শুধু বসে বসে!"

"তর্ক! কেমন?" নীহারকে খুবই ম্লান দেখায়।

"তাছাড়া কি? কথা বলাই হচ্ছে তোমাদের পেশা—উপদেশ বিতরণও বলতে পারো।" সুপ্রিয়া একটা উলের কাজ টেনে নেয়।

"কিন্তু উপদেশের বীজগুলো ভেজা মাটিতে পড়েনা কখনো—তা জানেন ?"

"কিন্তু তাতেও তোমাদের উৎসাহের কম্‌তি নেই। জানো নীহার, তোমরা বই-এ যা পড়েছ—তা মানুষের জীবন নয়—মেয়েদের জীবন ত নয়ই। অথচ বই ছাড়া তোমাদের জানাশুনোর পুঁজি আর কিছুই নেই !" উলের কাঁটা নাড়াচাড়া করতে সুরু করে সুপ্রিয়া।

"দেখা যাচ্ছে বই-এর উপর রাগটা আপনার ভীষণ।"

"তা নইলে কি আর এতবার ফেল করছি পরীক্ষায় ?"

"তা অবিশ্যি বই-এর উপর রাগের দরুণ নয়—ওসব কাজই ভালোবাসেন বলে।"

"উল বোনা ? ওতে আমার রুচি আরো কম। এ করছি শুধু তোমার ভাবীটিরই জন্যে।"

"ও—" একটা তেঁতো ঢোক যেন গিলে নেয় নীহার।

"মাসীর ত একটা কর্ত্তব্য আছে, কি বল !" নীহারের দিকে না তাকিয়েই বলে সুপ্রিয়া। উত্তরে নীহার কিছু বলতে পারে না—চুপ করে থাকে।

কাঁটার গায়ে উল জড়াতে জড়াতে বলে সুপ্রিয়া : "এ ব্যাপারে তোমার উৎসাহ নেই দেখা যাচ্ছে !"

"এতে আর উৎসাহ দেখিয়ে কি লাভ ?"

"নিরুৎসাহ হয়েও কোনো লাভ আছে কি ? যে আস্‌বার সে ত আস্‌বেই !" একটা বিদ্রূপকেই যেন ঠোঁটে চাপ্‌তে থাকে সুপ্রিয়া।

"বেশত ! তা নিয়ে আপনারা আনন্দ করুন।"

"কেন ?" সুপ্রিয়া মুখ তুলে বল্‌লে : "বরং আমাদেরই উঁচু দুঃখিত

হবার কথা। ক্ষতি যা হবার সেত সুনন্দারই হবে!" কিন্তু অনেকক্ষণ সুপ্রিয়া নীহারের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলনা—দেখ্‌তে পেলে নীহারের মুখ কালো হয়ে গেছে—এ-মুখ হিংস্র হয়ে উঠ্‌তে কতক্ষণ!

সাত

মুকুন্দবাবু যখন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে গিরিধির রাস্তার চড়াই-উৎরাই ভাঙছেন, তখনও অবনীবাবুর কলকাতার ঘর ফাঁকা পড়ে থাকেনা। আগে যদিও অনিয়মিত ছিল এখন ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এসে উপস্থিত হন রমেশ তালুকদার—'বেঙ্গল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডের' অন্যতম ডিরেক্টর। ভদ্রলোক রিটায়ার্ড সিভিল সার্জ্জেন—ইনভেলিড পেনশন নিয়েছেন—অত্যন্ত মদ খেতেন বলে এখন নিউরোসিসে ভুগছেন। মদ খেলেও অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন তহবিল সম্বন্ধে—তাইতেই বালীগঞ্জে একটা বাড়ি হয়েছে। এখন মদ খান না—দু বেলা সর্ষে-পরিমাণ আফিং—তাই শুধু সাবধানীই রয়ে গেছেন। ইনভেলিড পেনশনের দরুণ তহবিলে যা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, তাকে পুষিয়ে নেবার ইচ্ছা মানুষমাত্রেরই হয়, রমেশবাবুও মানুষ। জোর ডিভিডেণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে যে কোম্পানী এবং সৌভাগ্যবশত যে কোম্পানীর তিনি ডিরেক্টর—তার প্রতি এমন উৎসাহী হওয়া অস্বাভাবিক নয়—রমেশবাবুর মধ্যেও অস্বাভাবিকতা নেই। অবনীবাবুর চেয়ে বয়েসে ছোট না হলেও রমেশবাবু মনে করেন অবনীবাবুর আগে মারা যাবেন। আর তাই এখন থেকে কোম্পানীর আঁটঘাঁটগুলোর সঙ্গে ওয়াকিবহাল থাকলে আখেরে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরীর শিকেটা তাঁর ভাগ্যে ছেঁড়াই সম্ভব। সদর দরজায় পাহাড়া আছে অবিশ্যি অসিত—কিন্তু যে শক্তিতে তিনি সাব অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জেন থেকে সিভিল সার্জ্জেন হতে পেরেছিলেন, তার কাছে অসিত কী? হাত-পা তাঁর কাঁপে—সেটা তাঁর পক্ষে এখন ভালোই বলতে হবে—তিনি যে কতো

দুর্বল মানুষ তা দেখতে পায়—বিশেষ করে দেখতে পান অবনীবাবু। অবনীবাবুরই তা দেখা দরকার। অন্যান্য ডিরেক্টরের প্রাণশক্তি আছে — চিন্তটা-ই ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের পক্ষে অসহ্য। হাত-পা কাঁপার নীচে প্রাণশক্তি না হোক রমেশবাবু একটা দুরন্ত ইচ্ছা-শক্তি লুকিয়ে রেখেছেন।

"কাল থেকে অপিসে একবার করে যাব—" অবনীবাবু যেন একটা শপথ উচ্চারণ করলেন।

"অপিসে না গেলেও কি অপিসের কাজকর্ম্ম দেখা আপনার কামাই যাচ্ছে! যাকে বলে 'ওম্নিপ্রেজেন্স'—সে-গুণ আপনার আছে!"

এই নির্লজ্জ স্তুতি শুনেও একটু বিচলিত হননা অবনীবাবু। নির্বিকারে তা হজম করে নিয়ে বলেন: "তবু কি জানেন—একটা আশঙ্কা হয়। অসিত অবিশ্যি খুব দক্ষতার সঙ্গেই কাজ করে যাচ্ছে—ইয়ংব্লাড, বুদ্ধি আছে, গুড্ স্কীমার। তবু মাঝে মাঝে দেখে আসা ভাল।"

চুল কাটতে মোটর হাঁকিয়ে সেলুনে যায় অসিত। দেখে একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন রমেশবাবু—তবু বলেন: "অসিতকে পেয়ে আমরা সবাই ত নিশ্চিন্ত—খাম্‌কা আপনার আশঙ্কা!"

"কোম্পানীর দেখাশুনো আমি যে ভালো করতে পারব তা নয়! সত্যি বল্‌তে কি, কোনদিন আমি কল্পনাই করিনি কোম্পানী এত বড় হয়ে যাবে। কি হতে যে কি হয়ে গেল সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভাগ্য—বরাত—আমাদের নিজের শক্তি আর কতটুকু?"

মানুষের শক্তির অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে রমেশবাবুরও কোনো সংশয় নেই। অপারেশনের আগে বিলিতি ক্যায়দায় মদ খেয়ে নিলেও তিনি তিন বার শিব-শম্ভু-শূলপাণির নাম উচ্চারণ করে নিতেন। পরম আগ্রহে রমেশবাবু অবনীবাবুর প্রতিধ্বনি করে ওঠেন: "বরাত ছাড়া আর কি আছে বলুন। একেকটা সময় আছে আপনি মেরে কেটেও কিছু করে

উঠ্‌তে পারবেন না—সময় ভালো হলে দেখ্‌বেন ধূলোমুঠো সোনা হয়ে যাচ্ছে !”

অন্য লোকও অবনীবাবুর ধারায়ই চিন্তা করছে দেখলে তিনি খুব খুসী হন না। রমেশবাবুর উপরও তিনি একটু বিরক্ত হয়েই উঠলেন: “আপনারা মশাই শুধু বরাতেরই গুণকীর্ত্তন করে যান! পরিশ্রম করাও দরকার। আমাকে দেখে হয়ত ভাবছেন—লোকটার বরাত ভালো। আপনাদের তা ভাবতে আর কি আছে—? কয়েক গণ্ডা শেয়ার কিনে-ইত খালাস আপনারা। দেখতে ত পাননি—কি পরিশ্রম আমার শরীরের উপর দিয়ে গেছে!—আপনারা দেখবেন শুধু বরাতই!”

রমেশবাবু ছোট হয়ে গেলেও তা সাময়িক। অবনীবাবু শাঁখের করাত। কাজেই তাঁর গুডবুকে থাকা প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ব্যাপার। সে-পরিশ্রম রমেশবাবু করতে পারবেন জেনেই এখানে নিয়মিত আসা-যাওয়া স্থুরু করেছেন।

রমেশবাবুকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে অবনীবাবুর ভদ্রতাজ্ঞান উঁকি দেয়: “বুঝলেন রমেশবাবু—নিয়তি কেন বাধ্যতে ত বটেই—তবু ভেতরে একটা পুরুষকারের তাড়না আছে ত! ধরুন, আপনি যে এতবড় চাকরি করে এলেন নিয়তির সঙ্গে আপনার শক্তিও ছিল।”

“আমরা ত বিজ্ঞানসেবী—শক্তিরই পূজারী—” ধীরে ধীরে পাখা মেলতে স্থুরু করেন আবার রমেশবাবু: “শক্তিতে অনেক কিছু হয় জানি, কিন্তু সব কিছু হয়না। শক্তি যার নাগাল পায়না তাকেই বলি নিয়তি।”

“থাক এসব কথা—” অবনীবাবু ভয় পেয়েই যেন প্রসঙ্গটা থামিয়ে দেন। পরিশ্রমের দান ছাড়া জীবনে তিনি আর কিছু পাননি—তাই পরিশ্রমের চেয়ে বড় একটা শক্তিকে তাঁর ভয়। পাছে সে শক্তি—সে নিয়তি তাঁর জীবনে কাজ করতে স্থুরু করে সে আশঙ্কাতেই আছেন

তিনি। নিজের মুখে নিয়তির নাম উচ্চারণ করে করে তিনি ভয় ভাঙাতে চান—অপরের মুখে নিয়তির বর্ণনা শুন্‌লে সমস্ত শরীরে তিনি অস্থিরতা বোধ করেন।

"কোম্পানী সম্বন্ধেই আলাপ করা যাক্‌—কি বলেন?" হঠাৎ অসম্ভব হৃদ্য হয়ে ওঠেন অবনীবাবু।

রমেশবাবু আগ্রহে উদগ্রীব হলেন: "কারখানাতে ত কোনো গোলমাল নেই শুন্‌ছি।"

"গোলমাল হওয়া ত উচিৎ নয়।"

"ধরতে গেলে আমরা ভালো মজুরীইত দিচ্ছি!"

"তা দিচ্ছি। তাছাড়া ভালো কাজের জন্যে মজুরদের থেকেই একটা পার্মানেণ্ট ষ্টাফ তৈরী হয়ে গেছে—বছরে বছরে এখন এদের বেতন বাড়বে, প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের বেনিফিট পাবে।"

"তা হলে ত আমাদের কারখানা প্রায় অফিসই হয়ে গেল!"

"এ-সব স্কীম অসিতের!"

"আমিও ভাবছিলুম বল্‌ব যে এ স্কীম নিশ্চয়ই অসিতের করা।"

"এ কাজটায় খুব একটা সুবিধে হল। দিনকাল ত দেখছেন—দুষ্টব্রণের মত কারখানায় আজকাল ষ্ট্রাইক লেগেই আছে। মজুরদের একটা পার্মানেণ্ট ষ্টাফ থাক্‌লে ষ্ট্রাইকের হাতটা এড়ানো যায়!"

"বিলেত থেকে অনেক ভালো জিনিষ পেয়েছি আমরা—সঙ্গে সঙ্গে বস্তাপচা মালও কিছু এসেছে—এ ষ্ট্রাইকটা হচ্ছে সে বস্তাপচা মাল!"

অসিত এসে ঘরে ঢুক্‌ল—সঙ্গে বিলিতি একজন মানুষ নিয়ে। ঘরের ঠাণ্ডা আবহাওয়াটা জুতোর আওয়াজে আর স্যুটের খস্‌খসিতে একটু চকিত হয়ে উঠল। মুখের কথাটা শেষ করলেন বটে রমেশবাবু—কিন্তু ঠোঁট আর জোড়া লাগলনা—হাঁ করেই তাকিয়ে রইলেন।

"মুকুলকে নিয়ে এলাম, বাবা—" অসিতের গলায় সমীহ ততটা নেই যতটা আছে স্মার্টনেস্।

"চিনি। বোসো।" মহান একটা প্রশান্তি আন্‌তে চাইলেন অবনীবাবু তাঁর মুখে।

"এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই মুকুল—আমাদের কোম্পানীরই ডিরেক্টর মিঃ তালুকদার। আর মিঃ তালুকদার—এ হচ্ছে মুকুল মিত্তির, সভ্য বিলেত থেকে এসেছেন, একাউণ্টেন্সীতে পাকা ওস্তাদ!"

রমেশবাবু গদগদ হয়ে হাস্‌লেন কিন্তু কোম্পানীর পরিচয় ছাড়াও তাঁর যে নিজস্ব একটা পায়াভারি পরিচয় আছে মুকুলের কাছে তা প্রকাশিত হলনা বলে সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখিত হয়ে উঠলেন।

রমেশবাবুর সুখদুঃখের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মুকুল একটা সম্ভ্রান্ত অন্যমনস্কতায় অভিভূত হয়ে রইল।

"তোমার আসার খবর, তোমার বাবার কাছে শুনেছি—" অবনীবাবু তারপর রমেশবাবুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন: "আমাদের মুকুন্দবাবুরই ছেলে—"

সামান্য নড়ে চড়ে বস্‌ল মুকুল। অবনীবাবুর কথাটা রমেশবাবুই লুফে নিলেন: "মুকুন্দবাবুর ছেলে! তোমার বোনেরইত বুঝি হার্টে কি অসুখ ছিল? মুকুন্দবাবু গিয়ে বললেন, ওষুধ দিন। আমি হেসে বল্লুম—ছুরিকাঁচি নিয়ে কাটাছেঁড়া করে এলুম মশাই সারাজীবন—আমি ওষুধ দোব কি? সরকার বাহাদুর হাসপাতালের ভার দিলেন কিন্তু কসাইগিরি থেকে অব্যাহতি দিলেন না!" হেসে একবার সবার মুখের দিকে তাকালেন রমেশবাবু। অবনীবাবু বাইরের দিকে চেয়েছিলেন—মুকুল দেয়ালে ঝুলান' একটা ক্যালেণ্ডারের দিকে—অসিত গলার টাই-টা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। রমেশবাবুর গলার আওয়াজটা থামার অপেক্ষাই

যেন করছিল অসিত—আওয়াজটা থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠ্‌ল: "আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে মুকুল একটা কাজে—"

"আমার সঙ্গে কাজ?" চম্‌কে উঠ্‌লেন অবনীবাবু।

"আপনাকে ডিস্‌টার্ব করতে হল—তার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। But necessity pressed me to do so—" মুকুল একটা সৌজন্যের হাসি ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে অবনীবাবুর দিকে চেয়ে রইল।

"তোমরা একালের বিদ্বান ছেলে, আমরা সেকেলে লোক—" পাছে রূঢ় কিছু বলে ফেলেন তারজন্যে বাক্যটাও ক্রিয়াপদ দিয়ে শেষ করতে পারলেন না অবনীবাবু।

"আচ্ছা—"হঠাৎ একটা বেমানান শব্দ করে রমেশবাবু উঠে পড়লেন: "চলি তাহলে আজ অবনীবাবু—পাড়ায় একটা হরিসভা হচ্ছে, যেতে হবে সেখানে একবার!"

তিন জনই নীরব থেকে রমেশবাবুকে যেতে দিলেন।

তারপর প্রথম কথা বল্‌লে অসিত: "আমাদের অপিসের অডিট-টা মুকুলই করুক না, বাবা—"

"যে কোম্পানী করছে তাদের কি কোনো দোষ পেয়েছ?"

"না তা নয়। জানাশুনোর মধ্যে মুকুল—"

"জানাশুনো বলে অডিট্‌-টা ত আর অন্যরকম হবেনা।"

"Excuse me—" মুকুল ঘাড়টা একটু হেলিয়ে বল্‌তে চাইল: "অসিতের কাছে যদ্দূর শুন্‌তে পেয়েছি—আপনি হয়ত আমার উপর খুব খুসী নন। আন্‌ফরচ্যুনেটলি বাবার সঙ্গে আমার একটা আগ্‌লি ব্যাপার হয়ে গেছে—"

"ওটা তোমার নেহাৎ পার্সোন্যাল ব্যাপার—আমাদের কোম্পানীর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?" অসিত মুকুলকে চাঙ্গা করে তুল্‌তে চাইল।

অবনীবাবু যেন শ্বাসরোধ করে বললেন: "ভালো মনে কর ত—আগামী বছর ওকেই অডিটর করে দাও। আমি আর কি বলব?"

অবনীবাবু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর চটির আওয়াজ হল—তেতলায় উঠে যাচ্ছেন, যা তিনি বছরে এক-আধবারের বেশি করেন না।

মুকুল সুযোগ পেয়েই বলে উঠল: "লিস্‌ন্ অসিত—তোমাদের কোম্পানীতে আমি থাক্‌ব Only because you are there! বুড়োরা আমার ধাতে ঠিক সয়না!"

"তোমাকে নোব সে ত আমি বলেইছি—তবু একবার বাবার সঙ্গে দেখা করে গেলে!" অপ্রতিভ না হবারই চেষ্টা করতে লাগ্‌ল অসিত।

"I do'nt mind it—তুমি ত জানো I am a bit hard pressed! বাবা যে হঠাৎ বেঁকে বস্‌বেন আমার ধারণাই ছিলনা। However, I find in you a tender friend!"

"এ তোমার সাহসেরই পুরস্কার। কারু না কারু হাতে পেতেই, fortunately I took up the job!"

"নেলীকে ত দেখেছ তুমি how wonderful a girl—and so devoted—"

"And pretty too!" অসিত মুকুলের দিকেই মুগ্ধের মতো চেয়ে রইল।

"যাক্—আমি উঠ্‌লুম।" মুকুল দাঁড়িয়ে গিয়ে দুহাতে ট্রাউজারটা টেনে কোমরের উপর উঠিয়ে নিলে: "তুমি যাচ্ছ ত আমার ওখানে? আমি না থাক্‌লেও please wait for me—তাছাড়া বোধহয় লক্ষ্য করেছ Nellie is ever friendly to you!"

ঠোঁটে একটা চোস্ত হাসি বাগিয়ে অসিত বল্‌লে: "হয়ত যাব।"

"চিয়ারো বয়—" মুকুল অদৃশ্য হল।

দিনের মতো কাজ ফুরিয়েছে অসিতের। মুকুলের সঙ্গেই সে বেরুতে পারত। বাড়িতে কারুর সঙ্গে একমুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে কথা বলবারও দরকার বা কর্ত্তব্য তার নেই। কিন্তু তবু এক্ষুণি বেরোন যায় না। এই বিপর্য্যস্ত জামাকাপড়ে আর একটা ক্লান্ত চেহারায় অন্তত নেলীর কাছে উপস্থিত হওয়া যায়না। জামা-কাপড় সম্বন্ধে ওদেশের মেয়েরা ভীষণ খুঁতখুঁতে। মুকুল অবিশ্যি অভাবের দরুণ সবসময় পোষাকটা কেতাদুরস্ত রাখতে পারেনা—কিন্তু অসিতের কেতাদুরস্ত থাক্‌তে ত সামান্য একটু মনোযোগের মাত্র দরকার। তাছাড়া পোষাক ব্যাপারে অসিত আগে থেকেই অতি-মাত্রায় সচেতন। তার ধারণা পোষাকই আভিজাত্য। মুকুলের দামী, ফ্যাসনদুরস্ত স্যুট-টা দেখেই প্রথম সে মুকুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। অবনীবাবুর গোড়ামিতে বিলাত যাওয়া হয়নি তার—তাই বিলাত-ফেরতের উপর আক্রোশ আর দুর্ব্বলতা তার সমান সমান। মুকুলের অর্থকষ্টই অসিতের মনের আক্রোশটাকে নিভিয়ে দিয়েছে—মুকুলের উপর দুর্ব্বলতা ছাড়া অসিতের আর কিছু এখন নেই।

অসিতের নিখুঁত পোষাকে নেলী যে খুসী হয়ে ওঠে তা সে নেলীর ফিরোজা রঙের চোখের তারার উজ্জ্বলতা থেকেই টের পায়। পোষাক পরিবর্ত্তনে কোনদিন আলস্য নেই অসিতের—পোষাকের ভারে শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করেনা কখনো। কলকাতার দুর্দ্দান্ত গুমোটে বাড়িতে থাক্‌লেও সে কখনো গা উদোম রাখবেনা—একটা ধবধবে কিপ-কুলের গেঞ্জী সব সময়ই গায়ে চড়ান থাক্‌বে। পোষাকের প্রতি তার এই শৈল্পিক নিষ্ঠা এতদিন কারু সপ্রশংস দৃষ্টির সমর্থন পায়নি। তাতেও সে অবিচলিত ছিল। আর অবিচলিত ছিল বলেই এক বিদেশিনীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে আজ সার্থক।

অসিতের সঙ্গে বারান্দাতেই আবার দেখা হয়ে গেল অবনীবাবুর। সুনন্দার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়ে গেলেন তিনি—একা পেতে চেয়েছিলেন মনোরমাকে—নাতীনাতনীদের নিয়ে তিনি হাসিঠাট্টায় আছেন—তাঁর স্বপ্নভঙ্গ করতে চাইলেন না অবনীবাবু।

যেতে যেতেই বলে যেতে চাচ্ছিলেন অবনীবাবু: "মুকুলের সঙ্গে এতটা মেলামেশা না করলে কি হতনা?" অসিত দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়াতে হল তাই অবনীবাবুকেও।

"টাকাপয়সার টানাটানিতে আছে মুকুল—হাজার হোক আমাদের পরিচিত ত।" ভালোছেলের ভঙ্গি নিল অসিত।

"মুকুন্দবাবু শুন্‌লে দুঃখিত হবেন।"

"তা কি সম্ভব! রাগের বশে একটা কিছু করে ফেলেছেন বলেই কি ছেলে অভাবে থাকুক তিনি চাইবেন?"

"বাপের কাছে শুধু স্নেহের দাবীই চলেনা!" অবনীবাবু দাঁড়ালেন না আর। যথাশক্তিতে শরীরটাকে সোজা রেখে নীচে নেমে গেলেন।

ঘাড় নীচু করতে হল অসিতকে। ঘাড় নীচু করে ভাবতে হল খানিকক্ষণ।···

"কত বড় হাসির ব্যাপার অসিত, বাপ ছেলের চরিত্রের উপর নিজের চরিত্রটা চেপে ধরতে চায়! শুধু হাসির ব্যাপারই নয়, ব্যাপারটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক!" দীপকের কথাগুলো মনে পড়ে অসিতের।

দীপকের স্বাধীনতাকে আজকাল একটু ঈর্ষা করতেই সুরু করেছে অসিত। বল্‌তে গেলে অসিতও একরকম স্বাধীন—সামনের পথটাকে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে নিয়েছে সে—এগুবার পক্ষে হয়ত কোনো বাধাই তার নেই। কিন্তু দীপকের মতো চারদিক তার খোলামেলা নয়। দুর্ব্বল হোক একটা অভিশাপের শিখার মতই পেছনে থেকে জ্বল্‌ছেন

অবনীবাবু। তাঁকে অস্বীকার করা যায় না—ভাবা যায় না তিনি নেই। একমাত্র মৃত্যু যদি তাঁকে স্বাভাবিক ভাবে সরিয়ে দেয় তবেই অসিত মুক্ত হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারে। সত্যি বল্‌তে কি, দেবার মত যা ছিল অবনীবাবুর, তিনি ত দিয়ে ফেলেছেন—এখন তাঁর বেঁচে থাকা অনর্থক। বেঁচে থেকে এখন শুধু দুঃখ দেবেন আর দুঃখ পাবেন। সমাজের দিক থেকেও এ বেঁচে থাকা ক্ষতিকর। হঠাৎ সমাজতাত্ত্বিকের মত ভাব্‌তে স্থরু করে অসিত। এসব মুমূর্ষু জীবনের চেয়ে নতুন একটা জীবনের দাম ঢের বেশি, অথচ মুমূর্ষুর মৃত্যু না হলে প্রসারিত হবার জায়গাই পাবে না সে নতুন জীবন।

চিন্তায় ছেদ ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ে অসিত। স্নান করতে হবে এখন। তারপর এক কাপ চা। পোষাক পরিবর্ত্তন। মোটর। মুকুলের ফ্ল্যাট। চিন্তার বদলে কর্ত্তব্যগুলোকে সে মাথায় সাজিয়ে নেয়।

আট

অসিত যখন নেলীর ফ্ল্যাটে—অজিত তখন বোলপুরের প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে মন্দারকে নিয়ে হওড়ার গাড়ীর একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় উঠ্ছে। অলকাকে সিউড়িতে পৌঁছে দেবার আগ্রহই ছিল অজিতের শান্তিনিকেতন ঘুরে যাবার জন্যে। মন্দারের হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, রবীন্দ্র-সঙ্গীতটা না শেখার কোনো মানে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে এই সুবুদ্ধিও তার মাথায় এল—কল্‌কাতায় যার নাম রবীন্দ্র-সঙ্গীত, তাতে রবীন্দ্রনাথের কথা আছে আর গানের সুরও আছে কিন্তু দুটো মিলে যা গিয়ে দাঁড়ায় তা রবীন্দ্র-সঙ্গীত কদাচ নয়। অতএব শান্তিনিকেতনে গিয়ে কয়েকদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত না শুনে এলে শিল্পচর্চ্চায় মন্দারের খুঁত থেকে যাচ্ছিল।

আসলে ব্যাপারটা স্রেফ খেয়াল। মেয়েদের এক আধটু খেয়াল থাকৃতে হয়। বিশেষ করে যে মেয়ে প্রেমে পড়্‌বে বা পড়েছে। এ খেয়ালটা যে কুয়াশার সৃষ্টি করে তাতে রোমান্সের ফসল ফলে ভালো। যে-ছেলে তোমায় ভালোবাসে সে যদি তোমাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক, অত্যন্ত প্রাঞ্জল দেখ্‌তে পায়, মনটা তার চুপ্‌সে যাবে দিনকে দিন—কারণ, আবিষ্কারের নেশায় উড়তে পারেনা সে তখন দিক্‌বিদিকে। সহজ হয়ে পড়বার দুর্ঘটনা থেকে যে কোনো রকম একটা খেয়াল তোমাকে রক্ষা করতে পারে। হাস্‌তে হাস্‌তে হঠাৎ চুপ করে যাওয়া অভ্যাস করতে পার তুমি—সব জিনিষের মধ্যে কেবল চকোলেট দেখ্‌লেই কচি খুকীর মত খুসীতে ঝিল্‌কিয়ে উঠ্‌তে পারো—পারো অনবরত ক্লাশ কামাই করতে, বা ফিলজফিতে ভর্ত্তি হয়ে প্রাণপনে আধুনিক বাংলা কবিতার বই সংগ্রহ

করতে। তার চেয়ে উঁচুদরের খেয়াল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশুদ্ধতার জন্যে অপরিমিত তৃষ্ণা বা যামিনী রায়ের ছবি দেখলেই অসামান্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা।

অজিতকে জানিয়েই এসেছিল মন্দার। কিন্তু তাকে শান্তিনিকেতনে আসবার নিমন্ত্রণ জানায়নি। মন্দার ভেবেছিল অজিতের কাছে তার শিল্পীমনের দাম বেড়ে যাওয়াটাই যথেষ্ট। দাম দেবার জন্যে যে সে কলকাতা ছেড়ে এখানে ছুটে আসবে ততটা মন্দার আশা করেনি।

গাড়ী ছাড়ল।

"আমরা ফরচ্যুনেট—" অজিত বললে।

"কেন ?" সৌভাগ্যের অনেকগুলো কারণ ঝাঁক বেঁধে মন্দারের মনে এসে উপস্থিত হল—কিন্তু বুঝতে পারছিলনা সে, অজিত কোন্ বিশেষ কারণের ইঙ্গিত করছে!

"ফরচ্যুনেট নয় ? শুধু দুজন আমরা—কামরায় আর লোক নেই।"

"ও" ছোট করে হাসলে মন্দার।

"বেশ নিরিবিলি শান্তিনিকেতন—আমার কি মনে হচ্ছিল জানো ?"

"কি করে জানব ?"

"না জানলে শোনো। ভাবছিলুম থেকেই যাই এখানে।"

"থাকলেই পারতে।"

"থাকতে পারতুম—একটা কণ্ডিশনে—যদি তুমি থাকতে!"

"আমি থাকবনা বলেই কাজটা হলনা ?"

"তাই।"

"আমিত অনেক সময়ই তোমার সঙ্গে থাকিনে—তোমার বাড়িতেও ত থাকিনে—"

"তাইত আমিও বাড়ি থাকিনে।"

"বাব্বা সন্ন্যাসী হবার ফিকিরে আছ দেখ্‌ছি !"

"মোটেও নয়। পুরোপুরি গৃহী হবার মহড়া দিচ্ছি।"

হাওয়ায় একটানা চাবুক চালিয়ে গাড়ি চলেছে—চাবুকের শীস বাজছে অনবরত। মুখোমুখি বসে আছে অজিত আর মন্দার। গাড়ীর দোলাটা ঢেউ হয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে মন্দারের শরীরের উপর দিয়ে—অজিত তাই দেখ্‌ছিল নিবিড় ভাবে। অনেক কথা বল্‌তে ইচ্ছা করছিল তার, যে-সব কথা বল্‌বে বলে অনেক সময় সে ভাবে। এমন সুযোগ, এমন নিঃসঙ্কোচ সুযোগ কবে আর পাওয়া যাবে? কিন্তু মনে পড়ে না কোনো কথা। কথাগুলো ভুলে গিয়ে চেয়ে থাকতেই ইচ্ছা করে।

"কি?" মন্দারই জিজ্ঞাসা করে শেষে।

"কি ভাবছিলুম জানো? যেন আমরা পালাচ্ছি কল্‌কাতা থেকে! ভেবে বেশ থ্রিল হচ্ছিল।"

"পালাতে যদি হয় কোনোদিন!" মন্দারের চোখে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে।

"কেন পালাতে হবে কেন? তক্ষুণি আবার ভাব্‌ছিলুম, কিসের ভয়ে পালাব?" চোখমুখ চক্‌চক্ করে ওঠে অজিতের।

"ব্যাপারটা যখন অসবর্ণ একটু ভয়ত আছেই!"

"ব্যাপারটা নূতন নয়!"

"নূতন না হলেও তার ধার এখনো যায়নি, বাপমা ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে ও ধারটুকুই যথেষ্ট!"

"জানো মন্দার, আমাদের পরিবারটা ঠিক তেম্নি নয়—" কৌচের উপর মাথা হেলিয়ে দেয় অজিত: "খুবই লিবারেল এট্‌মোস্‌ফিয়ার সেখানে।"

"You can never tell—পরিবার নামক জন্তুটা যে কখন কি নিয়ে

ক্ষেপে ওঠে আগে থেকে তা বোঝা যায়না !" বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে মন্দার।

"আমাকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে কথা হয় ?"

"হত। কিন্তু ভালোছাত্র বলে কথাগুলো এখনো চাপা পড়ে আছে।"

"কথা যদি হ'তে সুরু করে তুমি কি বলবে ?"

"কি ধরণের কথা হবে তা-ত আমি জানি—পাল্টা কথাগুলোও তা-ই ভেবে রেখেছি।"

"যাক্‌গে—" অজিত উঠে পাশ ঘেঁসে বসে মন্দারের, ওর ঘাড়ের পেছনে জানালার ফ্রেমের উপর একটা হাত ছড়িয়ে দেয়: "লাষ্ট রাইড টুগেদার মনে পড়ছে ব্রাউনিঙের !"

"সত্যি বল্‌তে কি, আমরা ব্রাউনিঙের যুগেই আছি !" অজিতের সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে মন্দার।

"তাহলেও বেরেট-কে পেতে ততটা তুফান উ্ঠবেনা !"

"Let us hope so—" ফুলের পাপড়ির মত মন্দারের ঠোঁটগুলো বুঁজে এলো। চুপ করেই সে থাকতে চাইল কতক্ষণ। এমন নিভয় নিঃসঙ্কোচ সময় হয়ত জীবনে অনেক বারই আস্‌বে—কিন্তু কবে থেকে তা কে জানে ? তাছাড়া আস্‌বেই যে তা-ও বা নিশ্চয় করে বলা যায় কি ? তার চেয়ে এখন যা পাওয়া গেল তাকে শরীরের সমস্ত অনুভব দিয়ে শুষে নেওয়াই ত ভালো। একটা গানের সুরকে স্মরণ করে চল্‌ল। খানিক পরে খুব অস্পষ্ট ধ্বনিতে ফুটে উঠ্‌ল তার সুর। মন্দার মাথাটা হেলিয়ে দিল পেছনে।

এই নিবিড়তার প্রতীক্ষাতেই ছিল অজিত। এ ভাবে যেন অনেক বছর, অনেক যুগ থাকা যায়। গাড়ীর গতি দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছে—সময়ের গতির মত অনেকটা। মনে হচ্ছিল অজিতের, বাইরে মাস-বছর যুগযুগান্ত

ভেঙে চুরে গড়িয়ে যাচ্ছে, কালের রথে বসে আছে সে আর মন্দার, নিশ্চল। মন্দারের চুলের ফিকে গন্ধে অজিতের নিঃশ্বাসের হাওয়া সুরভিত। মন্দারের বুকের উপর কাপড়ের নরম ঢেউ -সেই ঢেউ-ছোঁওয়া হাওয়া এসে লাগ্‌ছে অজিতের সমস্ত শরীরে। মন দিয়ে তা অনুভব করতে গেলে সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ আসে। আসুক রোমাঞ্চ—সেই অনুভবেই ডুবে গেল অজিত।

ভালো লাগ্‌ছিল মন্দারেরও—আরেকটু নিবিড়তাও ভালো লাগবে। নিজের শরীরটা তার অনুভূতিতে স্পষ্ট হয়ে যেন দেখা দিল। এত ভালো কোনো দিন আর লাগেনি তার নিজেকে। গান থামিয়ে দিয়ে গানের গুঞ্জনের মতো করেই বল্‌লে মন্দারঃ "আলোটা নেভানো যায়না? দাওনা নিভিয়ে তাহলে!"

অন্ধকার? সেই ভালো। অজিত উঠে গিয়ে সুইচটা বন্ধ করে দিলে।

"ষ্টেশন আছে সাম্‌নে?" গানের সেই ক্লান্ত সুরটা এখন মন্দারের গলায় বাজ্‌ছে।

"না—একেবারে বর্দ্ধমান।" মন্দারের সামনে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থেকে অজিত আবার বল্‌লেঃ "পাশে বস্‌ব?"

"হুঁ—" এ-ও যেন গানের সুর।

পাশে বসে অজিত একটা হাত জড়িয়ে আন্‌ল মন্দারকে। হাতটা তার কাঁপ্‌ছিল। এত সুযোগ সে আশা করেনি—এত সুখ। জীবনের প্রথম অপরাধ—প্রথম আনন্দ তার এই।

"ভালো লাগে।" মনে-মনেই যেন বল্‌তে চায় অজিত--কিন্তু ধ্বনিতে তা ফুটে ওঠে।

"ভালো লাগে।" মন্দার প্রতিধ্বনি করে।

শরীরের সমস্ত অস্থিরতা থেমে গেছে ওদের। গাড়ীর গতিতেই ওদের পেশীতন্তুগুলো চঞ্চল। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসে মন্দারের। একটা হাত মন্দার অজিতের মুখের উপর বুলিয়ে আনে। রোদের আকাশের উপর মেঘের ঠাণ্ডা, নরম স্পর্শ যেন এ। এ স্পর্শে অস্থিরতা আসে আবার। অজিত বুকের উপর জড়িয়ে আনে মন্দারকে। একগুচ্ছ ফুলকে জড়িয়ে ধরবার মত আনন্দের একটা হিংস্রতা আছে তাতে।

"মন্দারমালা! তুমি ফুল?" অজিত নয় যেন মোহই কথা কয়ে উঠ্‌ল।

একগুচ্ছ জীবন্ত সিল্ক অজিতের চিবুকটা আলতো ভাবে ছুঁয়ে যায়। মন্দারের ঠোঁট। অজিতের বুকের উপর মাথা রেখে মন্দার হয়ত ঘুমিয়ে পড়বে এখুনি। অজিতের মনে হল—সত্যি বুঝি ঘুমিয়ে পড়বে মন্দার। ওর শিথিল, নরম শরীরের স্বাদ নেবার জন্যে এম্নি বসে থাক্‌বে সে যতক্ষণ বসে থাকা যায়। তার আগে আরেকটু অভিযান করা যায়না কি— আরেকটু রহস্য উদ্‌ঘাটন? এ অন্ধকার এনে দিয়েছে মন্দারের দেহে গভীর, গভীর রহস্য। তার কতটুকুই বা জান্‌তে পেরেছে অজিত! কতটুকুই বা জান্‌তে পারবে!

ঘাড় নীচু করে মন্দারের মুখের দিকে তাকায় অজিত। চোখ বুঁজে আছে ও। তবু ভীরুর মতো ঠোঁটটা নামিয়ে আনে অজিত ধীরে ধীরে মন্দারের ঠোঁটের উপর। চোখ মেলে তাকায় মন্দার—অন্ধকারেই দেখ্‌তে পায় যেন অজিত চোখের তারা ঘুমের স্বাদে বিহ্বল। মুখটা তুলে ধরে মন্দার, ফুলকে তুলে ধরে যেমন গাছের শাখা। অজিতের সমস্ত জীবন্ততা, সমস্ত প্রাণ জেগে ওঠে তার ঠোঁটে।

নিঃশ্বাস দ্রুত হতে দ্রুততর হয়ে আস্‌ছে ওদের—তবু এ উৎসব যেন 'লাখ-লাখ যুগ' চল্‌বে। ওরা চায়না বিচ্ছিন্ন হয়ে আস্‌তে। আসুক

মৃত্যু—মৃত্যুও সুন্দর। হাওয়া যেন অনেক হাল্কা—ওতে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচা যায়না—এই গাঢ় ঘন মুহূর্ত্তগুলোতে বেঁচে থাক্‌তে হলে ভারি, অনেক ভারি হওয়া চাই। মন্দারের ফুস্‌ফুস্‌ সমুদ্রের হাওয়া চায়, রাশি রাশি অক্সিজেনের জন্যে তার আকুলতা। সমস্ত শরীরে যে আবেগ থর্‌থর্‌ করে উঠ্‌ছে—ট্রেনের দোলাকে ছাপিয়ে চাপা ভূকম্পে ভেঙে গুঁড়িয়ে গলে যাচ্ছে তার শরীর, সে আবেগের কাছে ছোট ছোট নিঃশ্বাসের কতটুকু দাম? তার এই ছোট মৃদু শরীরের সমস্ত দুর্দ্দান্ততা জেনে নিক অজিত—মৃত্যুর মত রহস্যগুলো নচিকেতার অনুভূতিতে স্পর্শ করে যাক সে। মৃত্যুর আগে জীবন এর চেয়ে বেশি দূর আস্‌তে পারেনা, জীবন এর চেয়ে বেশি রহস্য উন্মোচন করে না।

অজিত তবু আরো অনেক গভীরে যেতে চায়। অনেক রহস্য বুঝি এখনো পড়ে আছে। বহু নীহারিকার অস্পষ্ট আকাশ স্পষ্ট হয়ে পেছনে চলে গেছে—আরো বুঝি দেখা যায় ছায়াপথের ধূসর আভাসে অন্য কোনো বিচিত্র আকাশের ছবি। চিরদিনকার ত্বকমাংস আর রক্তের আড়ালে থেকে যে প্রাণের উচ্ছ্বাস আজ ঘুম ভেঙে প্রথম অভিনন্দন জানাল অজিতকে, তার ক্ষমতা ভোরের সূর্য্যের মত নূতন—এখনও সন্ধ্যা অনেক দূর—যখন আস্‌তে পারে ক্লান্তি। কিন্তু ক্লান্তি কি আস্‌বে কখনো? এ যেন অক্লান্ত এক প্রাণ, শীতল শিথিল দেহের এক আশ্চর্য্য প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু সত্যিই মন্দার মরে যেতে পারে না। বাহু শিথিল হয়ে পড়ে তার এক সময়। ঝড় থেকে বেঁচে আসে সে। বেঁচে আসে রোগের প্রবল আক্রমণ থেকে। ধীরে ধীরে রক্ত যেন সুস্থ হয়ে আস্‌ছে। শুধু নিজের শরীরটা নিয়ে অজিত বিমূঢ় হয়ে থাকে। "বর্দ্ধমান এক্ষুনি আস্‌বে, না?" অন্ধকারের কথার মতো অশরীরী হয়ে ওঠে মন্দারের স্বর।

কথাগুলোর মানে কয়েক মুহূর্ত্ত অজিত সমস্ত স্মৃতি হাতড়েও খুঁজে পায় না।

"হয়ত বর্দ্ধমানের কাছাকাছি এসে পড়েছি—আলোটা জ্বালিয়ে দাও।"

হঠাৎ যেন মনে হল অজিতের সে অন্ধকারে আছে। তাড়াতাড়ি সুইচটা খুলে দিল অজিত। আলোতে ফেটে পড়ুক বিদ্যুৎ—উঠুক আলোর ফুল হয়ে।

মন্দারকে আশ্চর্য্য মনে হচ্ছিল তার। এত স্বাস্থ্য ওর মুখে ছিল কোনদিন? এত উজ্জ্বল আর মসৃণ?

"কি দেখ্ছ?" মন্দার জিজ্ঞাসা করে।

"তুমি? তুমি কি দেখ্ছ?"

"তোমাকে।"

"আমি আরেকটি মেয়েকে।"

"আমি তাহলে নেই!"

"বিস্ময়কর হয়ে গেছ।"

"মনে থাকবে এই বিস্ময়?"

"বিস্ময়কে ভোলা যায়না। পুরীর সমুদ্রকে, তাজমহলের উপর পূর্ণিমাকে ভুলতে পারি আমরা?"

"আমার ভয় ছিল।"

"কি ভয়?" আবার এসে মন্দারের পাশে বসে অজিত।

"হয়ত আমারই বিস্ময় হবে, তোমার নয়।"

"আজ প্রথম আকাশ দেখে এল একটি পাখী।"

মন্দার চুপ করে রইল। মনে পড়ছিল তার সেই দিনগুলোর কথা অজিতের সঙ্গে যখন তার পরিচয় হয়নি। নিজেকে কত ভাবেই সে শোভন করে বাইরের লোকের দৃষ্টিতে তুলে ধরেছে। ব্যর্থ তার সে

আয়োজন। সে ব্যর্থতার কি দরকার ছিল যখন এ মুহূর্ত্তগুলো তার জীবনে আস্‌তই!

"জানো মন্দার—" অজিত যেন একটা অতীত স্বপ্ন বর্ণনা করে চলেছে: "সে আকাশ অনেক বড়ো—দিগন্তেই শেষ নয়—কতো যে তার রহস্য তা কি এই পাখী জেনে আস্‌তে পেরেছে! আকাশ শুধু আকাশেরই তৃষ্ণা এনে দিয়েছে তাকে!"

"এ আকাশ ত তারই!" মন্দারের চোখে সমর্পণের স্নিগ্ধতা।

"সত্যি?" ছেলেমানুষের মত খুশী হয়ে উঠ্‌ল অজিত: "জানো মন্দার, একেক সময় বিশ্বাস করতে আমারও ভয় হয়।"

"আমাকে দিয়ে তোমার ভয়!" দীনতায়ও সঙ্কোচ নেই আর মন্দারের।

"কেন—তোমাকে নিয়ে ভয় হ'তে পারেনা আমার?"

"না।"

"কেন?" আব্দারের ভঙ্গীতে অজিত তার চিবুকটা উঁচু করে আনে।

"তোমার কাছে আমি ছোট—সাধারণ মেয়ে আমি—খুব সাধারণ।" মন্দার জানে এ দীনতা তাকে উজ্জ্বলতাই এনে দেবে—অজিতের চোখ থেকে বিস্ময়ের মোহ এখনো মুছে যায়নি।

"তুমি অসাধারণ! ভালো-মন্দ আমাদের মনের তৈরী। আমার মনে তুমি অসাধারণ।"

মন্দারের চোখে খুসীর ঝিলিক দেখা যায়—তবু বলে: "ছাই অসাধারণ! তুমি মিছিমিছি বল!" শ্রীনিকেতনের ভ্যানিটিব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা চিরুণী বার করে আনে মন্দার। তারপর সামনের—সিঁথীর দুপাশের ফাঁফা চুলগুলো আল্‌তো হাতে আঁচড়াতে সুরু করে।

"তুমি জানোনা আমায়—ঠিক হয়ত জানোনা, তাই ওম্নি ভাব'!"

অজিতের ঠোঁটে একটা দৃঢ়তা দেখা যায়। বেসিনের কাছে এগিয়ে গিয়ে অজিত জলের ট্যাপটা খুলে দেয়, তারপর চোখে মুখে জল ছিঁটোতে থাকে।

"বর্দ্ধমানে গাড়ি বদল, না?"

"হুঁ" রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এগিয়ে আসে অজিত: "বর্দ্ধমান এসে গেলেই কল্‌কাতার হাওয়া গায়ে লাগল।"

"শান্ত ছেলেমেয়ের মত আমরা বসে থাক্‌ব তখন গাড়ীতে—না?"

"মনে মনে ভাব্‌ব—'স্বর্গ হইতে বিদায়'—"

"ক্লাশের কারু সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়?"

"কাল য়ুনিভার্সিটির দেয়ালে ট্রেনশুদ্ধু তোমার আমার ছবি উঠে যাবে!"

"আমার তাতে ক্ষতি নেই। মেয়েরা সবাই জানে। ওদের ঈর্ষা করবার পালাও ফুরিয়েছে!"

"ক্ষতি ত আমার হবেইনা—মনে-মনে খুসী হব!"

"খুসী হ'বে? কি সাংঘাতিক!" কপালে ভুরু তুলে হাস্‌তে থাকে মন্দার। ব্যাগে চিরুণীটা রেখে দাঁড়িয়ে যায়।

"তোমাকে যে ভালোবাসি এ যদি ছেলেরা না-ই জান্‌ল তাতে কি ভালো লাগে? ভালোবাসার খবরটা জানাজানি হওয়া ভালো—ওটা ষ্টিমুলেণ্টের কাজ করে। অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা না জান্‌লে দুষ্মন্তের জন্যে শকুন্তলার প্রেম কবে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেত!"

জল-তরঙ্গের মতো হেসে ওঠে মন্দার। তারপর ওয়াশিং-বেসিনের কাছে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

ওখান থেকে জলের আওয়াজ আসে—ওখানে আছে মন্দার তবু অজিত যেন একা—নিজকে সে কুড়িয়ে পায় একা। কিন্তু নিজকে নিয়ে

কিছুই সে ভাব্‌তে পারেনা—হয়ত নিজের পৃথক সত্তাটাকেই সে হারিয়ে ফেলেছে। মন তার একা নয়—সেখানে মন্দার যাওয়া-আসা করছে নানা ভঙ্গিতে, নানা কথা মুখে নিয়ে। সে সব ভঙ্গিতে মুগ্ধ হ'তে হচ্ছে তাকে—কথার উত্তর দিতে হচ্ছে। মন্দার অফুরন্ত—কতো, কতো যে জানবার আছে এখনও তাকে! কতো রহস্য! মগজ দিয়ে একে জানা যায়না। জানতে হয় অনুভব দিয়ে। লাখ লাখ যুগ হিয়াতে হিয়া রাখ্‌লে হিয়া জুড়ায় না—কিন্তু মুখোমুখি হওয়া যায় সে-রহস্যের, অনুভব করা যায় সেই রহস্যের গাঢ় কালো রং। সেই ত সম্পূর্ণ পরিচয়! একটি ছেলে একটি মেয়ের পরিচয় এর চেয়ে আর কি বেশি পেতে পারে! জীবনের পরিপূর্ণ চেহারা ত এই! মন্দার তাকে নিয়ে যাবে পাহাড়ের চূড়ায়, জীবন সেখানে উঠে গেছে উত্তুঙ্গতায় আকাশের অপার অপরিমেয় রাজ্যে—খানিক দুর ত মাত্র তারা এল। জীবনের মাথার মুকুট মন্দারের চোখের আলোছায়া পড়ে ঝলমল করছে—মন্দারকে ছাড়া তার কোনো মানে নেই।

লেভেলক্রসিং আর পুল পার হওয়ার আওয়াজ—ফাঁকা মাঠের হাওয়ার দীর্ঘনিশ্বাস সবই কানে এসে পৌছয় অজিতের। কিন্তু তাদের ধ্বনি তার শ্রুতির স্নায়ুগুলো টেনে নেয়না। সে শুন্‌ছে তার রক্তের ঝন্‌ঝন্ শব্দ—সুরবাহারের অজস্র তার অক্লান্ত গুঞ্জন করে চলেছে অজিতের নিঃসঙ্গতা নেই—বসে আছে সে সুরের মুর্চ্ছনায়।

অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় বেরিয়ে এলো মন্দার।

"একটা অদ্ভুত প্ল্যান মাথায় এলো—জানো মন্দার?" অজিত কথা মুখে নিয়েই অপেক্ষা করছিল।

"কি?"

"লিটারেচ্যর পড়ব—ছেড়ে দোব একনমিক্স!"

"তার মানে আমাকে দুবার ডাইভোস করতে বল ?"

"জীবনে যখন সত্যিকারের ডাইভোর্সের ভয় নেই, সাবজেক্টগুলোকে নিয়ে ফ্লার্ট করতে কি দোষ ?"

"মা সরস্বতী রুষ্টা হবেন।"

"বরং খুসী হবেন। গার্গী-মৈত্রেয়ীদের নিয়েই ওঁর ভয়—পাছে আসন টলে।"

"সরস্বতীকে দোষ দিচ্ছ কেন ? পাছে গার্গী-মৈত্রেয়ী হয়ে যাই, সেই ত তোমার ভয় !" অভিমানী হয়ে উঠ্‌ল মন্দার।

"ভয় আছে—গার্গী-মৈত্রেয়ী হবার জন্তে নয়। পাছে ব্রহ্মচারিণী হয়ে দাঁড়াও !"

একসঙ্গে দুজনেই হেসে উঠ্‌ল ওরা। বর্দ্ধমানের আলো দেখা যাচ্ছে।

নয়

চৌরঙ্গীর আলোগুলোই যেন আজ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌ছিল দীপক। আর আশ্চর্য্য যে তা স্বাভাবিক ঠাণ্ডা চোখে। বেরুবার সময় টাকা ছিল পকেটে। এখন কয়েক আনা পয়সা মাত্র। একটা বুড়ো ভিখিরি, চুলগুলো যে সাদা হয়ে গেছে তা-ও বুঝবার যো নেই এত নোংরা ময়লা মাথায় জড় করা—ছেঁড়া কানিতে প্রায় উলঙ্গই তাকে বলা যায়—মরবার জন্তেই হয়ত সটান শুয়ে ছিল ফুটপাথে। নিশ্বাসের সঙ্গে পেটটা গর্ত্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। ফুটপাথে হাঁটবার সখ হয়েছিল বলে ওর সঙ্গে দীপকের দেখা। নিজেকেই দীপক দোষ দিচ্ছিল মনে-মনে—কেন হঠাৎ আজ এই অদ্ভুত সখ হতে গেল তার! তবু থাম্‌তে হল ওর কাছে। হাত বাড়িয়ে কিছু চাইবার শক্তি বুড়োর নেই—চোখের দৃষ্টিতেও চাইবার ভঙ্গি ফুটে ওঠেনা—কালো কুঁচকানো ঠোঁটগুলো কোনো কথারই চেষ্টায় হয়ত কাঁপছিল। ষাট বা সত্তুর বছরের একটা দীর্ঘ জীবনের নির্ম্মম সমাপ্তির ছবি! এও শিশু ছিল কোনোদিন, কারু চুমু ছুঁয়ে গেছে ওর গাল—খেয়েছে ও কারু বুকের দুধ—ওরও কোনো একদিন এসেছিল যৌবন কোনো এক মানুষীর যৌবনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে! দীপক পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে আন্‌ল। খুচরো কয়েকটা পয়সা বার করে পকেটে রাখল। তারপর ওর হাতে ব্যাগটা গুঁজে দিয়ে চলে এলো ওখান থেকে।

ঘেমে উঠেছিল দীপক—একটা অহেতুক উত্তেজনায়। মনুমেণ্টের পাশ দিয়ে মাঠে নেমে হাঁটতে সুরু করলে সে। ঠাণ্ডা হাওয়া আছে

মাঠে। যে কোনো অনুভূতির প্রথম আস্বাদে বুঝি এতটা উত্তাপেরই সৃষ্টি হয়। মনে করতে চায় সে মিস্ এমা-র সঙ্গে প্রথম উত্তপ্ত রাত্রির কথা—অনেক পুরোণো সে রাত্রি, তবু মনে পড়ে স্নায়ুগুলো তার এম্নি হিংস্রতায়ই বুঝি সেদিনও তাকে আক্রমণ করেছিল। অনেক ভিখিরিকেইত জীবনে দেখেছে সে—একটা ভাঙা হারমোনিয়ামের সুরে বেসুরো চেঁচিয়ে যে বুড়ো লোকটা ভাত যোগাড় করতে চায় দেখেছে তাকে, দেখেছে তেলেঙ্গী একটা বুড়ীকে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচ্‌তে—শুনেছে অনেক অন্ধ-আতুরের চীৎকার। কিন্তু ভুলে গেছে তখুনি আবার তাদের মুখ আর গলার স্বর। আজ তা'রা দল বেঁধে যেন পেছু নিল তার। বুড়ো ভিখিরিটার মতই তারা কথা কয়না—শুধু চেয়ে আছে তার চোখে-চোখে। ওদের চেয়ে থাকা—ওদের বেঁচে থাকা শুধু খানিকটা ভাতের জন্যে! কতই বা তার দাম! তবু তা তারা পায়না।

একটা সিগারেট খুলে তাড়াতাড়ি ধরিয়ে নেয় দীপক। ইজিপ্সিয়ান টুবাকো। যারা সিগারেট খেতে ভালোবাসে—কেন যে তাদের ইজিপ্সিয়ান ছেড়ে ভার্জ্জিনিয়া ভালো লাগে বুঝ্‌তে পারেনা দীপক। বেশ ঝাঁঝাল নেশার গন্ধ এর—শিক্ষানবিশীদের মুগ্ধ করবার মতো মোলায়েম গন্ধ নয়।

একসময় গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ায় দীপক। প্রচুর হাওয়া। টাওয়েল সার্টটা ভিজে গিয়ে এখন শীত-শীতই করছে তার। পাড়ে পাড়ে বাঁধা নৌকোর মাঝিরা রান্নার আয়োজন করছে—কেরোসিনের ডিবি থেকে মিটমিটে লাল আলো আর কালো ধোঁয়ার পুঞ্জ দেখা যায়। সেদিকে তাকায় না দীপক—চেয়ে থাকে মাঝ-গঙ্গার ঝক্‌ঝকে দুটো ষ্টীমারের দিকে।

ভালো লাগেনা। কি করতে বেড়ায় যে মানুষ! ফিরে হাঁটতে সুরু করে দীপক চৌরঙ্গীর দিকে।

একটা মোটর চলে গেল। পরিচিত মোটর। পরিচিত চালক। তবু ভুরু কুঁচকে নম্বরটা দেখে নিল দীপক। একই নম্বর। কিন্তু অসিতের সঙ্গে বিদেশী মেয়েটি কে? মিস্ এমার মতো কেউ কি? ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে ওঠে দীপকের। অসিতের এই নূতন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কোনো খবরই ত সে পায়নি। পাঁচটায়—এমন কি চারটায়ও অফিসে গিয়ে দেখেছে, অসিত নেই। যাক্, অসিত মানুষ হয়ে উঠুক তবু।

নিউ মার্কেটের একটা বইএর দোকানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কয়েকটা ম্যাগাজিন উল্টোলো দীপক। পয়সা নেই—না হয় কেনা যেত একটা। দোকানী বিরক্ত হয়ে উঠেছে—কিনবেনা বলে যে তা নয়, বই ঘাঁটছে যে লোকটা তার উপর নজর রাখতে হয় বলে'। দোকানীকে অব্যাহতি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল মার্কেট থেকে দীপক। সত্যি, বাইরেও তার কিছু করবার নেই। ঘরে বসে বসে বই পড়া—ক্লান্ত হয়ে সিগারেট খাওয়া, মাঝে মাঝে চা। তবু ঘরেই ক্লান্তির ফাঁকে ফাঁকে যা একটু ব্যস্ত থাক্‌তে হয় তাকে। বাইরে শুধু একটানা ক্লান্তি। রাস্তাঘাট দোকানগুলোর চেহারা একটু অন্যরকম নয় যে চোখে তার কৌতূহল আস্‌বে।

চৌরঙ্গী প্লেস দিয়ে চৌরঙ্গীতে গিয়ে উঠ্‌ল দীপক। তারই মত পোষাক যাদের তাদের জন্যেই চৌরঙ্গী—কিন্তু চৌরঙ্গীকে ভালো লাগাতে তার চেয়ে চামড়া বুঝি ঢের ঢের সাদা হ'তে হয়। ওদের পায়ে ক্লান্তি নেই—বিদ্যুতের মতো তীব্র ওদের চলার শক্তি। গুণেগুণে পা ফেলে

চলে দীপক। এমাকে ঘুরতে দেখা যাবে না কি এখানে! ফুটপাথে ছায়া খুঁজে নিয়ে চলতে সুরু করে সে।

মনিকোর সামনে এসে আবার দাঁড়িয়ে যায়। কয়েক আনা পয়সা আছে পকেটে। নির্দ্দোষ পানীয়—ভারতীয় চা—খাবে না কি এক কাপ?

পাশের গলি থেকে ব্যাক্ করে একটা মোটর বেরিয়ে এল। সেই চেনা মোটর। একা অসিত।

"হ্যাল্লো—" এগিয়ে গেল দীপক।

"দীপক! তুই এখানে?" বাইরে গলা বাড়িয়ে দিলে অসিত।

"নির্দ্দোষ স্থানে কি আমার আস্‌তে নেই?"

"তা কেন? দোষের জায়গাতেই চল্‌না—"

"খুব সাহস দেখা যাচ্ছে আজ!" দীপক একটা সিগারেট খুলে ঠোঁটে লাগিয়ে নিলে।

"দাঁড়া—ভেতরেই রেখে আস্‌ছি গাড়িটা!" সামনের দিকে ষ্টার্ট নিয়ে নিলে অসিত।

দীপক জুতো দিয়ে তাল ঠুক্‌তে লাগল কংক্রীটের উপর। অসিতকে আজ অন্যরকম মনে হচ্ছে। অফিসের নিরেট গাম্ভীর্য্যের ফাঁকে হঠাৎ খুসীতে একটু একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠা নয়—নানকিনের নিরাসক্ত কৌতূহলও নেই চোখে—এ যেন দীপক যা ছিল অনেকদিন আগে খানিকটা তাই। অনেক স্মার্টনেস্ এসেছে ওর চোখ-মুখের ভঙ্গীতে। মনে মনে কতগুলো তীক্ষ্ণ কথার মহড়া দিতে থাকে দীপক।

"চল্—" অসিত এসে সামনে দাঁড়ায়।

"কোথায়?" সিগারেটের ধোঁয়ায় বোজা-বোজা চোখে দীপক জিজ্ঞাসা করে।

"ব্রিষ্টলেই—"

"আমাকে দেখেই ক্ষেপে গেলি না কি ?"

"ক্ষ্যাপাই ছিলুম—তোকে দেখে ডিগ্রী চড়ে গেল।"

হাঁটতে স্থরু করলে দীপকের সঙ্গে অসিত।

"মেয়েটি কে ?—মানে ওই বিদেশিনী—" দীপক জিজ্ঞাসার স্থরে সামনের দিকে চেয়েই বল্‌লে।

"তুই কোথায় দেখলি তাকে ? এখানে বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলি না কি ?" অসিত একটুও কাবু হয়ে পড়েনা।

"তোর পাশে মেয়েটিকে দেখে ভাবছিলুম এতদিনে কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে তোর—আমরা যে ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছি তার প্রমাণই ত ওই !"

"আমাদের মুকুলকে চিনিস না—ওরই স্ত্রী, নেলী !"

"বিবাহিতা স্ত্রী ?"

"বিয়ে যদি হয়ে থাকে তবে তা বিলেতে—উপস্থিত ছিলুম না, কাজেই বল্‌তে পারব না।"

"Then how could you be so thick with her ?"

"পরিচয় হয়ে গেল ! বন্ধু-পত্নী, পরিচয় হতে ত দোষ নেই !"

"দোষ আবার কি ? দোষ বলে কোনো বস্তু আমার জগতে আছে নাকি ?" ব্রিষ্টলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল দীপক।

"থাম্‌লি কেন ?"

"ভাবছিলুম বেঁটে সায়েবটার কাছে হুটো বিল বাকি পড়ে আছে আমার—"

"That's nothing—কত টাকা ?"

"না-না সে তোকে দিতে হবে না—পাঠিয়ে দিলেই হবে একদিন।"

অসিত এগিয়ে গেল—পেছনে পা বাড়ালে দীপক।

হুচারজন সায়েব মদ খাচ্ছে—আর হুচারজন বিলিয়ার্ড টেবিলে।

বেঁটে সায়েব নেই। একটা টেবিলের সামনে বয় আর ওয়াইন চার্ট নিয়ে বসে গেল অসিত—বিলিয়ার্ড টেবিলটার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল দীপক। বলগুলোর ঠোকাঠুকি দেখতে ভালোই লাগে। অন্তত এখন গিয়ে অসিতের সামনে বসার চেয়ে ভালো। তবু কয়েক মিনিট পর অসিতের পাশেই একটা চেয়ার টেনে বসতে হয় দীপককে। মদের পয়সা দিচ্ছে অসিত।

গ্লাস আর হোয়াইট হর্সের বোতলটা রেখে দুটো সোডার বোতল খুলে দিয়ে চলে গেল বয়।

"এ কি, শেরী বা স্যাম্পেন নয়—হুইস্কী?" একটু একটু হাস্‌তে থাকে দীপক।

একটা বুড়ো সায়েব মাছের মত গিলে যাচ্ছিল মদ। বয়টা একটা উদ্ধত মাছির মত বারবারই এসে ঝুঁকে পড়ছিল তার টেবিলের উপর। অসিত সেদিকেই তাকিয়েছিল—দীপকের কথায় নিজের টেবিলে মনোযোগ দিলে।

"হুইস্কীই খাবো আজ।"

"সত্যি অসিত—প্রোগ্রেস্ জিনিষটা অনেকে মান্‌তে চায়না, কিন্তু আমি ত দেখলুম আমাদের শরীরের প্রয়োজনগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে!"

"না—আজই শুধু—খুব খেতে ইচ্ছা করছে হুইস্কী!"

"বিদেশিনীর তাপটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে—না ভুল্‌বার জন্যে?"

"দুটোর একটা ভেবে নিতে পারিস!"

"দুটোর একটা তাহলে সত্যি?"

দু'পেগের প্রায় আদ্ধেকটা একচুমুকে শেষ করে দেয় অসিত। দীপক সীপ নিতে নিতে বলে: "আজকের সন্ধ্যার জন্যে তা হলে

সেই বিদেশিনীকেই ধন্যবাদ! কিন্তু তাঁর ত নিশ্চয়ই এখানে উপস্থিত থাক্‌তে আপত্তি হতনা—তাঁকে রেখে এলে কোথায়?"

"ক্লাবে স্বামীর জিম্মায়!" জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে সুরু করে অসিত। আবারো হাতে গ্লাসটা তুলে নেয়।

নিজের গ্লাস থেকে ঠোঁট তুলে এনে দীপক বলে: "আস্তে! ষ্ট্যাণ্ড করতে পারবে না!"

"কেন?" বাধা পাওয়ার একটা কুটিল হাসি নিয়ে তাকায় অসিত।

"বিলিতি মানুষ আর বিলিতি মদ এক জিনিষ নয়!" নীচের ঠোঁটটা একটু উল্টে দিয়ে দীপক হাস্‌তে থাকে।

আধঘণ্টা পরে দেখা যায় বোতলটাতে একটু তলানিও আর পড়ে নেই। টেবিলের পাশে মেঝেতে চার পাঁচটা সোডার বোতল জড় হয়েছে। কনুই-এ ভর দিয়ে কপালে অনবরত হাত চালিয়ে চল্‌ছিল দীপক। মেঝেতে পা ঠুক্‌ছিল অসিত—মাথাটাকে নিয়ে ঘাড়টা কিছুতেই স্থির থাক্‌ছিল না। ঠোঁটে অনেকক্ষণ থেকে একটা আধপোড়া নিবন্ত সিগারেট ঝুলে ছিল তার—ওটাকে হাত দিয়ে কেচে ফেলে দিয়ে প্রায় হুঙ্কার দিয়েই উঠল অসিত:

"You don't know Dipok—She is the flower of England—"

"ড্যাফোডিল্, লিলাক্, অ্যানিমোন—কোন্‌টা?" ঘাড় গুঁজেই বল্‌লে দীপক।

"হানিকুম্ব—মধু, সবটুকু মধু—"

"অত চেঁচাস্‌নি—" বিড়বিড় করতে থাকে দীপক: "ফেরিওয়ালা ভেবে লোক এসে জড় হবে!"

"But she loves me—loves me furiously—"

"ওদের নখ কিন্তু বড় বড় থাকে—সাবধান।" মাথা তুলে দীপক বলে।

"You don't know Dipok—she loves me !"

"আমার জেনে কি সুবিধেটা হবে বল্—" ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে দীপক ডাকে: "বোয়্—বিল ল্যাও।"

পকেট থেকে পার্সটা বের করে এনে অসিত তুরুপের তাসের মত টেবিলের উপর ওটাকে পাঞ্জা দিয়ে চেপে ধরে। তারপর হাত তুলে নিয়ে খুঁজতে সুরু করে সিগারেট। দীপক একটা সিগারেট ওর ঠোঁটে গুঁজে দেয়।

সিগারেটটা হাতে তুলে নিয়ে অসিত বলে: "তুই বিশ্বাস করিস নে দীপক—নেলী যে আমায় ভালবাসে?"

"খুব করি। But mind—Don't you let her go."

"যাবে? কোথায় যাবে? Mukul never grudges me—he is a bit hard pressed—আমার আছে, কেন আমি দোবনা—সব, সব দিয়ে দোব নেলীকে—you can't cry halt !"

"পাগল—আমি বাধা দোব তোকে?"

বয় এলো। পার্স থেকে বক্শিষ সমেত বিলের টাকাটা খুলে ট্রের উপর রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল দীপক।

"চলে যাবি?" অসহায়ের বিহ্বলতা নিয়ে তাকাল অসিত।

"চল্ এবার।"

কোনোরকমে রাস্তায় এসে শরীরটাকে সোজা করে দাঁড়াতে চাইল অসিত। কিন্তু দাঁড়ানো যায় না। ওর হাত ধরে আছে দীপক—তবু দাঁড়ানো যায় না। কিন্তু শুধু দাঁড়ানো নয়—হাঁটতেও হবে খানিকটা। ব্রিষ্টলের কাঁচের জানালার গায়ে অসিতকে ঠেস

দিইয়ে দীপক তার কোটের পকেট থেকে মোটরের চাবীটা বার করে নিলে।

"দাঁড়িয়ে থাক—বুঝলি—মোটরটা নিয়ে আস্‌ছি আমি।" মানিকোর দিকে পা চালিয়ে দিলে দীপক—

"গুডবাই ডিয়ারি—"রুমাল বার করবার জন্য অসিত পকেট খুঁজতে লাগল। অসিতের মনে হচ্ছিল সে ভীষণ হাল্কা হয়ে গেছে—এত হাল্কা যে উপরের দিকে পা তুল্‌লে আর ওটাকে মাটিতে টেনে নাবানো যায় না। হাল্কা হয়ে ছড়িয়েও গেছে সে ত্বপাশে—দাঁড়াতে গেলে সমস্ত ফুটপাথ জুড়ে বস্‌বে তার শরীর। কিন্তু মাথাটা রয়ে গেছে তেম্নি ভারি—হয়তবা আগেকার চেয়েও ভারি। ওটাকে সোজা করে ধরে রাখা যায়না তাই। "I am fierce ever since I saw you—" বিড়বিড় করে অসিত কাচের উপর আঙ্গুল বুলোতে সুরু করলে: "Are you not glad? You look so glorious—ther's heaven in your blue eyes!" কাচের উপর ঠোঁট ঘষতে লাগল অসিত।

ব্যাক্‌সীটে অসিতকে টেনে তুলে নিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিল দীপক। ত্ব'বছর আগেই কিস্তি খেলাপে গাড়ী হাত ছাড়া হয়েছে দীপকের। ত্ববছর পরে হাতে এলো ষ্টীয়ারিং—তার উপর চৌরঙ্গী—তারও উপর অ্যালকোহলে স্নায়ু চঞ্চল। ভয় হচ্ছিল দীপকের অ্যাক্সিডেণ্টের ফ্যাসাদ না বেধে যায়। এগিয়ে চল্‌ল গাড়ী। অ্যাক্সিডেণ্টের ভয়ের চেয়ে ভয়ের চিন্তা আরো মারাত্মক। দীপক অন্যদিকে ভাবতে সুরু করলে।

সত্যি তাহলে অসিত ওর জীবনের কয়েদখানা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল! কিন্তু এত শুধু বেরিয়ে যাওয়া! তারপর? তারপর কোথায়

যাবে ? সে নিজেও ত বেরিয়েছিল। বেরিয়ে কোনো পথ দেখতে পেয়েছে কি ? ....একটা লরীর গা থেকে খুব বেঁচে এল দীপক !.........কিছু করবার নেই—কোনো দিকে যাবার নেই !......... এরই মধ্যে নাক ডাকাচ্ছে অসিত.........অসিতেরও বা করবার কি আছে ? পুরোনো স্ত্রীর কাছ থেকে মুক্তি ? কিন্তু এ কি মুক্তি ? নেলীও বা কতটুকু দিতে পারে—কতটুকু দেবার বা ক্ষমতা আছে ওর ? পোষাক আর গায়ের চামড়া, কথাবার্ত্তা আর অচরণ হোক না আলাদা বাঙালীর মেয়ে থেকে—হয়ত শরীরের জীবন্ততা একটু বেশি—কিন্তু সেই একই রকম মন আর চিন্তা, জীবনের রাস্তায় একই জায়গায় গিয়ে থেমে পড়া—একই অসুস্থতা ! সমস্ত পৃথিবীটাই রোগা হয়ে গেছে !.........কিন্তু এখুনি চাপা পড়ত এই রোগা ভিখিরি মেয়েটা— অনভ্যস্ত হাতে এত বড় বাঁক নিতে পারবে ভাবেনি দীপক !........... কলকাতার এই ভিখিরিগুলো ! ভিক্ষার রোজগার নিয়ে বেশ আছে ! ভিক্ষাই হোক, চুরিই হোক, পরিশ্রমই হোক—কোনো রকমে বেঁচে যাওয়া। বেঁচে যাওয়া—মোটর চাপায় যদি মরে না যায় ! বাঁচবার জন্যে একটা তুমুল উচ্ছ্বাস থাক্‌লেও কোনো রকমেই বেঁচে যাবে অসিত—বেঁচে যাচ্ছে যেমন সে নিজে। এসব উচ্ছ্বাসের মানে কি ? মানে কিছু সত্যি কি আছে ? কোথায় মানে ? কোথায়—কোথায় ?

সার্কুলার রোডে মোড় ফিরে ল্যান্সডাউন রোডে ঢুক্‌ল দীপক। খানিকটা নিরিবিলি—সোজা রাস্তা এখন। বাড়ির কাউকে ডেকে গাড়ি শুদ্ধ অসিতকে তার হাতে তুলে দিয়েই চলে আস্‌বে দীপক। বাড়ীতে আজ জানাজানি হয়ে যাবে—হয়ত এর আগেই জানাজানি হয়ে গেছে ! নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে সে অসিতকে—সামান্য হুঁশব্দ করতেও মা নীচে নেমে আস্‌বেন না। কিন্তু তা সে নেবে না।

দীপক বুঝতে পারে, তার মনে অসিত সম্বন্ধে কেমন যেন একটা হিংস্রতা আছে। দেখুক আজ অসিতকে তার বাপ-মা, ভাই-বোন সবাই।

ল্যান্সডাউন এক্সটেনশনের বাদামী রঙের বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থামল।

দশ

দৈনিক কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীপক দাঁড়িয়ে গেল : "অসিত, এ সময়ে হঠাৎ ?"

"কথা আছে—অনেক কথা। মা কোথায় ?"

"মা উপরে। পুজোআচ্চায় আকণ্ঠ নিমগ্ন—নীচে নামেন না। ছেলের দুর্ম্মতি টের পেয়ে নিজেই নিজের সদ্গতির ব্যবস্থা করছেন।"

একটা চেয়ার টেনে নিল অসিত। মুখে একটা সিগারেট নিয়ে অসিতের দিকে তাকাল দীপক। কথায় যতটা উত্তেজনা ছিল অসিতের, চেহারায় তার কোনো চিহ্নই নেই। সযত্ন-সজ্জিত চেহারা।

"কাল আমায় বাড়ি পৌঁছিয়ে না দিলে কি হতনা তোর ?" ঘাড় গুঁজে চেয়ারের হাতলে একটা সিগারেট ঠুকে চল্‌ছিল অসিত।

"রাতটা বাড়ি থেকে বাইরে কাটানো বিবাহিতদের পক্ষে কি ভালো ?" দীপক ছোট ছোট হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তোলে।

"আমার স্ত্রী এখানে নেই।" গাম্ভীর্য্য কাটলনা অসিতের।

"তিনিই চলে গেছেন, না তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ ?" দীপকের ভয় ছিল পাছে অসিত আগাগোড়া গম্ভীরই থেকে যায়।

"দুটোই এক।" মুখ তুল্‌ল অসিত : "কেউ কাউকে হয়ত পছন্দ করিনে আমরা।"

"She wants to have you all to herself and you don't want her at all—কেমন ?"

"যাক্‌গে। কাল যা হয়ে গেছে ও থাক্‌লেও তার চেয়ে বেশি কিছু হতনা।"

"হুঁ তাই বল্ -" ঠোঁটে একটু হাসি লাগিয়ে দীপক চেয়ে থাকে: "আমি ত চলে এলুম—তারপর?"

"ঘুম ভেঙ্গে আমায় তাকাতে হল বাড়িশুদ্ধ লোকের মুখের দিকে। নাক সিঁটকে বাবা চলে গেলেন—একে একে সবাই চলে গেল আমায় একটা চাকরের জিম্মায় ফেলে দিয়ে!"

"Then you had a bad time yesternight!"

"বাবার চুপ করে থাকা-টাই সাংঘাতিক। ভেবেছিলুম আজ ডাক পড়বে ওঁর ঘরে—কিন্তু বাড়িতে আজ আমার অস্তিত্বই যেন নেই!"

"কি আর করা যায় বল্। আমায় দেখে প্রথমটায় মাও কান্নাকাটি করেছেন—এখন আর মাথা ঘামান না। দিব্যি আছেন ধর্ম্মাচার নিয়ে, আমিও ব্যভিচার নিয়ে দিব্যি আছি। দুটোই সমান—মাথায় যে ইচ্ছাগুলো কিলবিল করে ওঠে তাদের কোনো রকমে কর্ম্মরত রাখাই সব। এর আর ভালোমন্দ কিছু নেই!"

"কিন্তু বাবাকে তুই জানিস্ নে।"

"বাবাদের আমি জানি। আমার মনে হয় কি জানিস অসিত—বাবাগিরি ব্যাপারটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ছেলেকে দিয়ে তোমার ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরাতে চাও কেন? ছেলেদের উপর যদি দাবী জানাতে হয়—সমাজ কতকটা সে দাবী জানাতে পারে! আর সমাজ বলে আমাদের যখন আজ আর কোনো বস্তুই নেই ছেলেরা পারোয়া করবে কাকে?"

"বাবা না থাক্‌লে ওসব কথা বলা যায়!" একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কাৎ হয়ে বস্‌ল অসিত।

"তাহলে কি আর করবে! দুর্ভাগ্যের বশে বাবা যখন নেহাৎ রয়েই গেছে, সুপুত্র হবার দিকে মন দাও।"

"বটে!" ম্লান ভাবে হেসে উঠল অসিত।

"তাছাড়া কি? ছেড়ে দাও মদ—কাল রাতের নায়িকা নেলীর ছায়া মাড়িও না। সতীসাধ্বী স্ত্রীকে নিয়ে প্রচুর সন্তান উৎপাদন কর। তোমার বাবার বংশ এবং মুখ উজ্জ্বল হোক।"

"কথাগুলো শুনতে ভালো!" দৃষ্টিটা তির্য্যক করে বলে অসিত।

"ভালো কথাও বলতে জানি। আরো শোন তাহলে। নারায়ণ-শিলাকে সাক্ষী রেখে যদি তুমি একটা বিয়ে করে ফেলতে পারো—এবং সে বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে অসংযমী হয়ে সুস্থ দেহটাকে টিকটিকিবৎ করে ফ্যাল—তাতে তোমার অপরাধ হবে না। অসুস্থ ছেলের পঙ্গপাল থেকে হয়ত আঁতুড়ঘরেরই সাতটাকে যমে নিয়ে গেল—তবু তোমার সাত খুন মাপ। সমাজ তোমায় খুনী বল্‌ছে না—সমাজ বলে কোনো অপদার্থ আছে বলে যদি মেনেই নাও! আর সে সমাজটা কি জানো—তোমার বাবা, আমার বাবা, রাম শ্যাম যদু মধুর—টম্‌ডিক্‌হ্যারির বাবা!"

"শেষ হল?" হাস্‌তে থাকে অসিত।

"আরেকটু বাকি আছে। সমাজের মন্‌সবদার—আমাদের বাবারা মেয়েদের জন্যে একটি স্বামী নির্দ্দেশ করে দেন। কেন তা জানো? প্রচুর সন্তান-উৎপাদনের তাগিদে। বহুস্বামিণী একস্বামিণীর চেয়ে সন্তানের জন্ম কম দেয় বলে'। নাও, শেষ হ'ল আমার কথা। এখন চা খাও।"

"আন্‌তে বল্‌—চা খাইনি বাড়িতে—দেবার হয়ত আগ্রহ ছিল না কারু!"

ঠাকুরকে ডেকে চায়ের ব্যবস্থা করে এলো দীপক। এসেই আবার সুরু করলেঃ "কি জানিস্, অসিত? আমরা জীবন-যাপন করিনে. কতগুলো নীতি বা দুর্নীতি জপে যাই। সব সমাজের সব মানুষের এই দশা—এটা শুধু ভারতীয় ব্যাধি নয়। অসাধ্য সাধন করবার ইচ্ছে যে-মানুষের মনে, দুরন্ত প্রাণপূর্ণ যে-মানুষ, কোথাও তেমন মানুষ বাঁচতে পারছে না। আমাদের চেনা-শুনা নীতি বা দুর্নীতির বাইরে যদি কেউ চলে যায়—ওম্নি সে বরবাদ হয়ে গেল—তার আর কোনো দামই রইল না আমাদের কাছে!" দীপকের ঘোলাটে চোখগুলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখা যায়।

"এই আলমারী-ঠাসা বইয়ের অক্ষরগুলো পোকা হয়ে তোর মাথায় কিল্ বিল্ করছে, দীপক!" একেবারে নীচুতে পড়ে যাচ্ছিল অসিত. তাই নিজেকে টেনে একটু উপরে তুল্‌তে চায়।

"বই-এর কথাই বল্‌ছিনে। প্রকাণ্ড অবসর—আর মানুষের মগজ যখন মাথার খুলির নীচে আছে—ওটা নানা কথা ভাবিয়ে চল্‌বেই বাইরে ত অন্ধকার—তোর আমার সবার সামনেই অন্ধকার। তাই চেষ্টা করছি কোনোদিন বলা যায় কিনা—"there's a torch inside my head"—ততটুকু মগজ হয়ত নেই—তবু দেখা যাক্।"

"শেষটায় না দেখা যায় লোটাকম্বল নিয়ে লছমন ঝোলায় চলেছিস্!

"তার চেয়ে ফাঁসীতে ঝোলা ভাল! বৃদ্ধা বেশ্যাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাবার ব্যবসাটা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা করে গেছেন। আমার আর যা না থাক্—পূর্ব্বপুরুষদের উপর ঘৃণাটা আছেত?"

"পূর্ব্বপুরুষেরা কেউ চোখের সামনে বেঁচে নেই কিনা তাই খু বাহাদুরী করা চলে!"

"আর সকলের সঙ্গে একটু তফাৎ আমার আছে। পূর্ব্বপুরুষের

বেঁচে না থাক্‌লেও ভূত হয়ে অনেকেরই ঘাড়ে তাঁরা চেপে থাকেন—ভূতের বালাই আমার নেই।”

দু'কাপ চা এলো। ডিম সেদ্ধ, রুটি-মাখনও ছিল অসিতের জন্যে।

“আমার ব্রেকফাষ্ট ?” সৌজন্যের প্রশ্ন করল অসিত।

“ব্রেকফাষ্টের আয়োজন আমি জানিই বা কতটুকু! কাজেই ওতেই চালিয়ে নিতে হবে।” চায়ের একটা পেয়ালা হাতে তুলে নিলে দীপক।

“বাড়িতে আমার পূর্ব্বপুরুষ আছেন—ওটা আমার জানাও সম্ভব নয়!” আস্ত একটা ডিম মুখে পুরে দিল অসিত।

“কিন্তু বাড়ি ছাড়াও ত বাড়ি আছে।”

হাত বাড়িয়ে দীপককে থামতে বল্‌লে অসিত। দীপক হাস্‌তে হাস্‌তে চায়ের তেতোয় সিগারেটের স্বাদটা মুখ থেকে ধুয়ে ফেল্‌তে সুরু করল।

ডিমটাকে মুখ থেকে অদৃশ্য করে অসিত বল্‌লে: “মুকুলের বাড়ি? ওরাই ব্রেকফাষ্ট খায় কিনা সন্দেহ!”

“বিলেত থেকে মুকুলবাবু মেমই নিয়ে এলেন—ডিপ্লোমা-ডিগ্রী কিছুই জুটল না?—যার জোরে এদেশে কেউ কেটা হবার দাবী ফলানো যায়!”

“বলে অবিশ্যি একটা ডিপ্লোমা আছে! তাছাড়া একটু আন্‌কম্প্রো-মাইজিং ও। কাজেই চাকরিও করতে পারবে না।”

“বিদেশিনীর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ হল—আর দেশী মানুষের সঙ্গে তা হবে না?”

“কম্প্রোমাইজ যে হ'ল তা-ই বা কে বল্‌বে!”

“তার মানে কি ডাইভোর্সের কথাটা পাকাপাকি করেই বিয়ে হয়েছে ওঁদের?”

“নেলী ঠিক এড্‌জাষ্ট করতে পারছে না!”

"হয়ত সেটা মুকুলবাবুর অর্থাভাবের দরুণ। এখানে এসে মেম দেখলেন যে মুকুলবাবু প্রিন্স নন!"

"হয়ত।"

"বেচারী!"

"যাক্‌গে। একটা কাজ করতে পারবি দীপক? হয়ত কাজ হবে না কিছুই তবু একটা আই-ওয়াশ—"

"বল্‌!"

"বাবাকে একটা টেলিফোন করে দিবি—বল্‌বি রবার্ট নিকোলাস কথা বল্‌ছি—নিকোলাস আমাদের একজন বড় কাষ্টমার—একটা মোটা টাকার অর্ডার এখনো ঝুল্‌ছে তার—বল্‌বি, তোমার ছেলের সঙ্গে কাল সন্ধ্যাটা কাট্‌ল ভালো, তোমার ছেলে খুব ভদ্র, অমায়িক—এইসব!"

চায়ের কাপটা টিপয়ের উপর রেখে দীপক বললে: "তুই কি আজকাল ডিটেক্‌টিভ গল্প পড়তে সুরু করেছিস্‌ অসিত? এসব প্ল্যান নইলে মাথায় আসে!"

অসিত একটু জুড়িয়ে গিয়েই বললে: "ভাবছিলুম বাড়ির চোখে যদি অপরাধটা হাল্কা হয়ে ওঠে!"

"অপরাধ বলে যাকে মনে করিস তা করবার কি দরকার?"

"অপরাধ করা দরকার বলেই দরকার।"

"তাহলে আর ওই সাফাই কেন?"

"অপরাধ বলেই তার সাফাই দরকার!"

"ও" বাঁকা ঠোঁটে দীপক একটু হাস্‌লে।

"চুরি করা দোষ বলে' আমরা কেউ চুরি করব না এত' হতে পারে না। চুরি আমরা করব কিন্তু জাহির করব না চুরি করেছি বলে'। জাহির করাটা বোকামির বীরত্ব!"

"দশ বছর আগে ওরকমই ভাবতুম।"

"দশ বছর পরে না হয় তোর মতোই ভাবব আমি!"

"আমার উদাহরণের পরও এত সময় লাগবে? মনে হয় না অসিত। তোর কদমটা একটু জোর চল্ছে।"

"এসব কিন্তু লছমনঝোলার বাণী হয়ে যাচ্ছে!"

"না—এসব Sorrows of Satan—"

কি বুঝল অসিত বোঝা গেল না—একটা সিগারেট মুখে নিয়ে উঠে পড়ল: "বাড়ি ফিরব না, বরাবর অপিস চলে যাচ্ছি। কদিন সুপুত্র হয়ে থাক্তে হবে।"

"সুপুত্র হবার জন্যেই মাঝে মাঝে তোরা কুপুত্র হয়ে উঠিস্ কি না!"

"সে যা-ই হোক—মোটের উপর পুত্রত্বের উপর ঘেন্না ধরে যায়নি তেমন এখনো!" অসিত একটু ধারাল হতে চাইল।

"বিজ্ঞানের আইন অনুসারে তা-ও যাবে।" দীপক তার বিশ্রী দাঁতগুলো দেখিয়েই হাস্‌ল এবার।

"আচ্ছা—চলি—" অসিত অমনোযোগীর মত বললে কিন্তু আর দাঁড়ালে না।

মাণিকতলা পৌঁছিয়েও অফিসের সময় হল না। অনেক আগেই অসিত এসে পড়ল অফিসে। দীপকের ওখানে আরো খানিকক্ষণ বসা যেত। কিন্তু ইচ্ছা হলনা। দীপকের খানিকটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম আর জটিল সে পরিবর্ত্তন। ঠিক বোঝা যায় না। একটা হেঁয়ালির মতই মনে হয়। হেঁয়ালি বস্তুটাকে অসিত সহ্য করতে পারে না। নিজেও সে অনেকটা হেঁয়ালি বলেই হয়ত সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া তার নিজের হেঁয়ালিপণা সবটাই বাধ্যতামূলক। পরিবারের সঙ্গে মনে মনে যুদ্ধ করতে হয় তাকে সব সময়—জয়পরাজয় বা শান্তি-

স্থাপন এখনও হয়নি। মনের বিশৃঙ্খলতা থাকা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দীপকের এমন কি মনের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে? আর তা থাকলেও অসিত তা সহ্য করবে কেন?

কারখানায় কাজ হচ্ছে—ড্রিলিং আর লেদ্-মেসিনে ভোরের সিফ্ট্ চলছে। শাবল চালিয়ে ঢালাই-এর পায়াগুলোকে উড়িয়ে দিচ্ছে বিলাসপুরী কুলিরা—অক্সিহাইড্রোজেন ফ্লেমে পায়া পুড়িয়ে দিচ্ছে বাঙ্গালী কারিকর—টিনের মস্ত শেড্টা তারই ঢং ঢং আর হিস্হিস্ শব্দে সরগরম। ফার্নেস্ জ্বলেনি। নতুন কাজ নেই। বালি দিয়ে এককোণে বসে কয়েকটা মজুরের ছেলে তবু ইন্গটের ছাঁচ তৈরী করছে। টিন শেডের সিলিং বেয়ে চলা ফেরা করছে ক্রেনের এঞ্জিন।

পুরানো একঘেয়ে শব্দ। মনোযোগ দিলে অসিত বিরক্ত হয়ে ওঠে। সমস্তটা জীবন এই শব্দের ভেতর বসে কাটাতে হবে—কি সাংঘাতিক! তার কামরা, বিরাট টেবিল, টেবিল জোড়া কাচ, টেলিফোন, দোয়াতদান, চিঠির বাক্স, দেওয়ালের ম্যাপ—সব কিছুর উপর বিরক্ত হয়ে ওঠে তার মন। ছুটি সে চায় না—চায় অনেকখানি অবসর, সে-অবসর নূতন বিচিত্র স্বাদে ভরা—যার মধ্যে কাজের কালো রেখা আঁকা সময়গুলো অদৃশ্য হয়ে হারিয়ে যাবে। কাজের টেবিলে বসে দেখা যাবে না একটু ঘাম, একটু ক্লান্তি। কিন্তু কাজ তার সমস্ত মনের গলা টিপে ধরেছে। গলা টিপে ধরেছে তার শক্ত সাদা হাড়ের একটা হাত। তা বাবার হাত।

ডাক এলো—সুইচ টেপা হল অফিসের কাজে।

রবার্ট নিকোলাসের চিঠি। কোটেশন মঞ্জুর হয়ে এসেছে হয়ত যন্ত্রদানবের একটা বিরাট বপুর বদলে একটুকরো কাগজে লেখা একটা বিরাট অঙ্ক এসে জমা হবে কোম্পানীর তহবিলে। ক্ষিপ্রহাতে চিঠিটা

খুলে পড়তে সুরু করে দিলে অসিত। ছোট চিঠি। সায়েব দুঃখিত হয়ে কোটেশন নামঞ্জুর করেছেন। অর্ডার প্লেস করা হয়েছে ক্যালকাটা ষ্টীল কোম্পানীকে। অনেক সস্তায় ওঁরা কাজটা করে দিচ্ছেন।

তদ্বিরতলাশিরও অবকাশ নেই। অলস হাতে চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দিলে অসিত। কোটেশন তার নিজের হাতে তৈরী। ফাক্টরী ম্যানেজার তিন হাজার টাকা কমিয়ে দিতে বলেছিল! গলা কাটাকাটির বাজার চলছে। তাছাড়া ক্যালকাটা ষ্টীল কোম্পানী নিজেদের বাজার তৈরী করবার জন্যে ফাইভ পার্সেণ্ট মার্জ্জিনে কোটেশন ছেড়ে দেন। ম্যানেজারের কথা শোনেনি অসিত। কাজ করাই লাভের জন্যে। কাজ করে যাওয়া, লাভ তা যা-ই হোক—এ পদ্ধতি অসিত অনুসরণ করে না। লাভের অংশ খদ্দরকে ছেড়ে দোব কেন? তার মানে কোম্পানীর ক্ষতি। ক্ষতি যদি নিতেই হয়—ফ্যাক্টরী বসে থাকুক—ও-ই ভালো। তাতে আভিজাত্য আছে।

রবার্ট নিকোলাসের চিঠির আগে এই আভিজাত্য তার কখনো ক্ষতিকর হয়ে ওঠেনি। জলের গ্লাসটা হাতে তুলে নিলে অসিত।

ঠিক তৃষ্ণা নয়—একটু অস্থিরতাই চলেছে স্নায়ুতে। জল নয়—তাছাড়া আরেকটা কিছু হলেই হয়ত ভালো হত। অনেক আনন্দ, অনেক দুঃখ আছে— মানুষের স্বাভাবিক স্নায়ুর ক্ষমতা যাদের তুলনায় খুবই ক্ষীণ।

টেলিফোন বেজে উঠল। এ সময়ে সাধারণত টেলিফোন বাজে না।

"হ্যাল্লো" অসিত নিস্পৃহ গলায় বল্লে: "ইয়েস, স্পিকিং।"

বাড়ি থেকে অজিত টেলিফোন করছে—খোঁজ করছে অসিত অফিসে এসেছে কিনা। খোঁজ করাচ্ছেন কি অবনীবাবু, না মনোরমা? দুজনের

একজন কেউ নিশ্চয়। শুধু খোঁজটাই ওদের দরকার—বাড়িতে যাবার জন্যে অনুরোধ নেই।

বাড়ি যাবে কি আজ অসিত? সন্ধ্যার আগেই অবিশ্যি বাড়ি ফিরে যাবে সে। সৎ হয়ে চলতে হবে ক'দিন—বাবার সপ্রশংস দৃষ্টি থেকে খসে পড়েছে সে। উপরে উঠে আসবার চেষ্টা করতে হবে আবার। যতদিন আবার আগেকার যায়গায় না আসা যায় নিঃকোলাসের ঘটনাটা চেপে রাখতে হবে।

কাজে আজ গভীর মনোযোগ আনতে চেষ্টা করল অসিত। চ্যাটার্জি কোম্পানির তিনশ টিউব-ওয়েলের ফ্রেম ডেলিভারী দিতে এত দেরী হচ্ছে কেন? দুমাসের উপর স্যাম্পল মঞ্জুর হয়ে এসেছে।

ম্যানেজার বলল: "লেদে কাজ করছে তিন জন—দু শীফটে। ফুরনে লোক পাওয়া যাচ্ছে না।"

"লেদের আর লোকরা গেল কোথায়—আরো ত তিনজন ছিল!" অসিত ম্যানেজারের একটা গাফিলতি আবিষ্কার করতে চায়।

"পার্মানেণ্ট স্কীমের পরই ত ওরা কাজ ছেড়ে চলে গেল!"

"এতদিন এটা আমাকে জানানো উচিত ছিল ত!"

"কাজ নেই—লোকের আমাদের দরকারও ছিল না এতদিন!"

"দুদিন কাজ নেই বলে কি কাজ আসবে না! কাজ নেই—এক কথা পেয়েছেন আপনারা!" অসিত তেতে ওঠে।

"এ সপ্তাহেই ডেলিভারী চলে যাবে টিউব-ওয়েল।"

"ট্রলির চাকার স্যাম্পল্ তৈরী হয়েছে?"

"কালই অপিসে এসে গেছে ওটা।"

আর কোনো অর্ডার আছে বলে খুঁজে পায় না অসিত। সত্যি কাজ কম। সময় পার হয়ে গেছে বলে—টিউব-ওয়েলগুলোর জন্যে মর্নি-শীফ্ট

চল্ছে দু'দিন ধরে। চিঠির তাড়ায় মন দিয়ে অসিত বলে: "যান।"

ম্যানেজার চলে গেল। অসিত লক্ষ্য করল না—মুখটা তার করুণের চেয়ে কঠোর ছিল বেশি।

চিঠির তাড়ায় অর্ডারের খবর নেই কিছু। একটা নতুন কোম্পানী সস্তায় ফায়ার ব্রিক দিচ্ছে, মেসিন-অয়েল লাগ্‌বে কিনা জান্‌তে চেয়েছে কেউ, চাকরির জন্যে আছে দুটো রবাহূত দরখাস্ত, ক্যাটালগ্ চার পাঁচটা।

পুরোনো চিঠির ফাইল থেকে অসিত তিন চারটা চিঠি উদ্ধার করে আন্‌ল। 'বেঙ্গল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী' কি কি মেসিন পার্টস্ তৈরী করতে পারে তা ওরা জান্‌তে চেয়েছিল—কাজের ভীড়ে চিঠিগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে তখন। সবিনয় নিবেদনের ভাষায় চিঠিগুলোর উত্তর তৈরী করতে লেগে গেল অসিত।

পাঁচটায় দীপক এসে হাজির। বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল অসিত—খুব ক্লান্ত লাগছিল শরীরটা।

"এলুম—" দীপক নির্দ্দিষ্ট চেয়ারটায় বসে বল্‌লে: "তখন মনে হল, তুই রাগ করেছিস্।"

"রাগ?" দুর্ব্বলভাবে বল্‌লে অসিত: "তোর উপর রাগ করতে যাব কেন?"

"সায়েব সাজ্‌তে চাইলুম না বলে!"

"ও। ওটা তখন ওম্নি বলেছিলুম। তখনকার দুর্ব্বলতা!"

"দৌর্ব্বল্য দূর হয়েছে তাহলে?"

"অপিসের আরেকটা নাম যাঁতাকল তা জানিস্ ত?"

"মন থেকে বদরস সব নিংড়ে ফেলে। জানি। তাইত আল্‌সেমিকে পেয়ে বসে শয়তান। দুষ্ট কেমিষ্টের মতো বদ রস তৈরী করতে লেগে যায়। আবার ওদিকে ছাখ—এই যাঁতার পাকে মজুরগুলো মন বলে পদার্থটাকেই ছাতু করে ফ্যালে!"

"তোর ফিলজফিগুলো শুন্‌তে মন্দ নয়। কিন্তু ভরা পেটে!"

"ভরা-পেটদেরই ত শোনাব—খালি পেট পাচ্ছি কোথায়, পেলেও ওরা আমাকে শুন্‌বে কেন?"

"কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার।" দীপকের কথায় সত্যি অসিত আর কান দেয় না।

"বেশত! নির্দ্দোষ পানীয়ের দোকানে আমার আপত্তি নেই।"

একটা ফিকে হাসি মুখে নিয়ে তাকায় অসিত—একটা চোখ ছোট করে নিয়ে বলে: "দু-এক পেগ সদোষ পানীয়েও বা আপত্তি কি?" তাড়াতাড়ি কথাটা বলে' উঠে পড়ে অসিত: "চল্‌—বেরোই ত আগে!"

অন্যমনস্কের মতই দীপক উঠে দাঁড়ায়।

এগোরো

অসিতকে নিয়ে সুনন্দারই কৌতূহল ছিল বেশি। সবাই কেমন একটা বিশ্রী রকম চুপ করে যাওয়াতে কৌতূহলটা খুব বেশি উদগ্রীব হয়ে উঠ্‌ল না। কিন্তু একেবারে যে নিস্তেজ হয়ে গেল, তা নয়।

"হ্যাঁ মা, তাহলে অনেকদিন থেকেই চল্‌ছে দাদার ও-রকম!" শরীরের গ্লানিতেই মুখটা বিস্বাদ করে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করে।

"কি জানি, এই ত দেখ্‌লুম!" বেশি রকম মুষড়ে পড়েছেন বলে মনোরমাকে মনে হয় না।

"বৌদির চলে যাবার কারণই তাই—" সুনন্দা এই পরম আবিষ্কার-টাকে ঠোঁটের চাপে সুদৃঢ় করে নেয়।

"অতশত আমি জানিনে বাপু—" একটু বিরক্তই হয়ে ওঠেন মনোরমা: "বৌমার কি বাপের ওখানে যেতে নেই?"

"রাগ করছ কেন তুমি? এটা কি রাগের কথা হ'ল?"

"আমাকে জ্বালাস্ নি বাপু—তোরা।" মনোরমা কাজের ছুতোয় অন্যদিকে চলে যান।

সুনন্দার আগ্রহ তাতে একটুও কমে আসে না। বাড়িশুদ্ধ, সবাই কেবল তাকেই করুণা দেখিয়ে চল্‌বে—তা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আরেকটি করুণার পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে—প্রমাণ দিয়ে তার অস্তিত্বটা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সুনন্দার মন যেন খানিকটা হাল্কা হয়। স্বাস্থ্য খারাপের জন্যে বিশেষ দুঃখ ছিল না সুনন্দার।—নীহার যে বর্ব্বরের মত সুনন্দার প্রতি তার অনাসক্তি

ঘোষণা করে যায় তারজন্যে নীহারের উপর তার আক্রোশ হয় না। আক্রোশ হয় বাড়ির মানুষগুলোর উপর যারা বিষয়টা জেনে নিলে। সুনন্দার দিকে তাকিয়ে ব্যথায় যাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে, তাদের সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না।

অজিতের ঘরে গিয়েই হাজির হয় এক সময় সুনন্দা।

মন্দারের খাতায় নোট লিখে দিচ্ছিল অজিত—খাতাটা বন্ধ করে বলে: "কি রে?"

"বৌদি চিঠি দিলে না কেন রে, অজিত?" অজিতের কাছে এসেই দাঁড়ায় সুনন্দা।

"এই ত সেদিন এলুম—চিঠি দেবে আবার কি?"

"বাঃ চিঠি দেবে না? কেমন আছে—কবে আস্‌বে জানাবে না?"

"বৌদির জন্যে দাদার না হয়ে তোর এত মাথা-ব্যথা কেন?"

"দাদা তেমনই আছে কি না!"

"কি বড় বড় কথা বল্‌ছিস্—কি হয়েছে দাদার?"

"যেদিন এলে সিউড়ি থেকে দেখ্‌তে পাওনি দাদাকে?"

"ওঃ। ভারি ত!"

"বেশ—কিছু হয়নি দাদার। বৌদি কি বল্‌লে তা-ই বল!"

"কি বল্‌বে আবার? বল্‌লে, বেশি দূর ত নয় সিউড়ি—এসো মাঝে মাঝে। আমি বল্‌লুম—নিশ্চয় আস্‌ব।"

"তুই যাবি মানে? বৌদি আসবে না?"

"কি বুদ্ধি তোমার! ওখানে পৌঁছেই বল্‌বে—আমায় কলকাতা নিয়ে চল!"

"যাঃ ফাজিল—" সুনন্দা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। একটু ক্ষুণ্ণই হয় হয়ত মনে মনে। পরিষ্কার কিছু জেনে নেওয়া গেল না।

মন্দারের খাতাটা তুলে রাখে অজিত। ইংরিজিতে যাবার জন্যে দুজনেই ওরা আবেদন করেছে। মন্দার বলেছিল বাংলা পড়বে। অজিত ওকে গ্যারান্টি দিয়েছে নোট লিখে পাশ করিয়ে দেবে। গ্যারান্টির দরকার ছিল না। অজিত তা জানে। জানে, তার ইচ্ছাকে অমান্য করবার শক্তি আর মন্দারের নেই।

"খোকা—"

চম্‌কে ওঠে অজিত। বাবা ডাক্‌ছেন। প্রায়ই তিনি ডাকেন না—ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই অজিত দাঁড়িয়ে গেল। "যাই—" বল্‌তেও কেমন অস্বাভাবিক শোনাল তার গলার স্বর।

ঘরের মধ্যেই পায়চারী করছিলেন অবনীবাবু। খাঁচার একটা সিংহের মতো অস্থিরতা ছিল তাঁর পায়ে। কোনো কঠোর সঙ্কল্পে যেন দৃঢ় হয়ে গেছেন—অগ্নিগিরির মত উগ্‌রে দেবার জন্যে এখন তাঁর এই অস্থিরতা।

"বোসো —" অবনীবাবু আদেশের ভঙ্গীতে বল্‌লেন।

অজিত বস্‌ল, খানিকটা নির্ভীক ঔদাসীন্যই ছিল তার ভঙ্গীতে। বাবার সঙ্গে তার মেলামেশা নেই—তা শুধু অবনীবাবু নিরিবিলি থাক্‌তে চান বলে'— তাঁর ভীষণতার জন্যে নয়।

"কাল থেকে অপিসে যেতে পারবে ?" ইজিচেয়ারটায় বসে বাইরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন অবনীবাবু—কথাটা শুনে অজিতের মুখের ভাব কেমন দাঁড়ায় তা দেখ্‌তে তিনি রাজী ছিলেন না।

"অপিসে ? কেন ?"

"কেন-র উত্তর পরে পাবে—পারবে কি না তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"পারব না কেন ?"

"কাল থেকে অপিসের কাজকর্ম্ম করবে তুমি -রমেশবাবু তোমাকে সাহায্য করবেন!"

দাদাকে যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এ নিয়ে অজিতের ভাবনার বেশি কিছু ছিলনা—ভাবনা হল তার নিজেকে নিয়ে: "আমার পড়াশুনো?"

স্রোতের মুখে একটু বাধা পেলেন অবনীবাবু: "এখন কি পড়ছ?"

"একনমিক্স ফিফ্‌থ ইয়ার।"

চুপ করে অবনীবাবু পায়ের পাতাটা নাড়তে লাগ্‌লেন। তারপর অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন: "তাহলে তোমাকে দুবছর পড়তে হবে?"

"তিন বছরও হতে পারে।"

"কেন?"

"একনমিক্স ভালো লাগছে না—ইংরিজিতেই পড়ব। পার্মিশ্যন না দিলে হয়ত এ বছরটা নষ্ট হবে।"

"তোমাদের কখন কি ভালো লাগে বল্‌তে পারো?" অবনীবাবুর ভুরুগুলো অস্বাভাবিক হয়ে এলো।

"ইংরিজিও ভালো সাব্‌জেক্ট!" এর চেয়ে ভালো উত্তর অজিত আর খুঁজে পেলেনা।

"দুবছর পরে তোমাকে অপিসের কাজ দেখ্‌তে হবে।" অবনীবাবু টাটার অ্যানুয়েল রিপোর্টটা টেনে নিয়ে পড়তে সুরু করলেন।

কয়েক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক চেয়ে অজিত উঠে চলে এল। জীবনের একটা স্পষ্ট পরিণতির কথা ভেবে কেমন যেন অবশ হয়ে আসছিল তার শরীর। জীবনের সমারোহের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যুর কথাটা উঁকি দিয়ে গেলে যেমন হয়। এম্নি একটা জীবনের অস্পষ্ট ধারণা যে অজিতের ছিলনা এমন নয়—কিন্তু অবধারিত মৃত্যুর মতোই ত খুব সহজে তা একদিন আস্‌তে পারত। এখনি আঙ্গুল উঁচু করে তা দেখিয়ে দেওয়া কেন? নিজ সম্বন্ধে,

এই বাড়ি সম্বন্ধে অজিতের ধারণায় কতগুলো রোগের বীজাণু ঝাঁক বেঁধে এসে ঢুকে পড়ে।

সামনেই পাওয়া যায় মনোরমাকে। অজিত অবিলম্বে বল্‌তে সুরু করে: "তোমরা সব কি হয়ে উঠেছ বল্‌তে পারো মা?"

"কি?" উদ্বেগের ক্লান্তি নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন মনোরমা।

"এতদিন গুমোট করে ছিল—এখন দাদার উপর বর্ষণ আর গর্জ্জন চল্‌ছে।"

"কি হয়েছে দাদার?"

"আমায় বলছিলেন বাবা অপিসের কাজকর্ম্ম গিয়ে দেখ্‌তে!"

"বড় হয়েছিস—অপিস দেখ্‌তে হবে না?"

"পড়াশুনো খতম করে কামারশালা চালাব?"

স্বামীর কীর্ত্তির উপর এতটা বিদ্রূপ মনোরমা সইতে পারেন না: "কামারের ছেলে না হয় কামারশালাতেই গেলি!"

মার মেজাজে একটু পেছিয়ে গেল অজিত: "দাদা এমন কিছু করেননি যাতে ওঁকে দিয়ে আর কোম্পানী চলবে না!"

"আমাকে বাপু তোরা রেহাই দে। কোম্পানীর মালিক আমি নই!" পালিয়ে বাঁচতে চাইলেন মনোরমা। কিন্তু বাঁচা মুস্কিল। সুনন্দার আবির্ভাব হল। অদৃশ্যভাবে আবির্ভূত অবিশ্যি সে বরাবরই ছিল।

"সব সময়ই তুমি চুপ করে থাক্‌বে এ কি রকম তোমার স্বভাব মা?" সুনন্দা অজিতের পক্ষ নিয়েই ভূমিকাটা তৈরী করল।

"তোরা কম বকাচ্ছিস্ আমায়?" মনোরমা আপোষের হাসি হাসেন।

"মা-দের তেমন একটু ভুগতেই হয়।" অজিত চলে যায়।

"বৌদিকে তুমি আনাবার ব্যবস্থা কর মা—দাদার নইলে এধারা বেড়েই চলবে।"

"আমি আনাতে চাইলেই কি বৌমা আসবেন—ওঁর বাবাও বা ছেড়ে দেবেন কেন ?"

"তাহলে দাদাকে নিয়ে কি করবে তোমরা—আরো কি কেলেঙ্কারি করে বস্‌বেন শেষটায় !"

"বাপকেই যার মান্যিগণ্যি নেই, বৌ-এর পাহারায় তার শোধরাবে কিছু ?"

"কি রকম হয়ে গেছে দাদা দেখতে পাচ্ছ ত—আমার ত ওর চোখের দিকে চাইলেই ভয় করে মাগো !" ভয়টা মনে মনে সংগ্রহ করে সুনন্দা শিউরে ওঠে।

মনোরমা অন্য কথায় প্রবেশ করেন: "চিত্তরঞ্জন থেকে কেবিনের খবর দিয়ে যাবার কথা ছিল—চাকরবাকরগুলোও ত হয়েছে তেম্নি—যে যার খুসী মত চলবে—আমিই সাম্‌লে মরি সবাইকে সারাদিন।"

সুনন্দা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দীর্ঘনিশ্বাসের মতই একটা শ্বাস নিয়ে ভারি শরীরটা টেনে সরে যায়।

কিন্তু মনোরমা এক পা এগুবে সাধ্য কি ? সুপ্রিয়ার ঘর থেকে ছুটে এসে টুলু তাঁকে জড়িয়ে ধরে। মনোরমা ব্যস্ত না হয়েই বলে: "কি, কি হলো—?"

"ছবি।" হাতে-ধরা ফটো-স্ট্যাণ্ডটা তুলে ধরে টুলু।

"একি ? ছি ছি—নেয়না এ—মেসোমশাই—যাও যাও রেখে এসো।" মনোরমা উদ্বিগ্ন হন।

"না। আমি নোব ছবি।" রোগা চেহারাটাতেও সুন্দর হাসি দেখা দেয় টুলুর।

"ছি দিদিমণি—ও নেয়না। মাসি মারবে।"

"মারবে না। মাসি চুমু দেবে।"

"রেখে এসো—মাসি চুমু দেবে।" টুলুকে কোলে তুলে মনোরমা সুপ্রিয়ার ঘরে আসেন।

সুপ্রিয়া ঘরে নেই। হয়ত স্নান করতে গেছে। খানিকটা পরিবর্ত্তন হয়েছে সুপ্রিয়ার ঘরে। টেবিলের উপর পড়ার বইখাতাগুলো নেই। ছোট্ট একটা ফুলের মালা পড়ে আছে। হয়ত ফটোটার গায়ে ছিল। একটা খোলা বই। পদ্যের বই। খোলাপাতায় মনোরমা চোখ বুলিয়ে আনেন। "তুমি মোর জীবন মরণ জড়ায়েছ দুটি বাহু দিয়া--"পড়েন মনোরমা--কিন্তু আর পড়তে কৌতূহল থাকে না। চারপাশে তাকান তিনি। আলনার উপর দুটো থান কাপড় ঝুলছে। মনে করতে চান মনোরমা, সুপ্রিয়াকে কোন সময় থান পরতে দেখেছেন কি না। দেখেন নি।

"দিদিমণি দাও—আজ এত বড় আইসক্রীম তোমাকে দোব।" ফটো ষ্ট্যাণ্ডটা মনোরমা হাতে নিয়ে নেন।

"মাসী দিয়েছিল কাল। তুমি দেবে?"

"দোব না?" কাপড়ের আঁচলে কাচটা মুছে নিয়ে মনোরমা ফটোটা সযত্নে টেবিলের উপর রেখে দেন। তারপর মালাটা জড়িয়ে দেন ফটোর গায়ে।

বাস্নো

রমেশবাবু এতই ব্যস্ত আজকাল যা তাঁর বয়েস আর শরীরের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। স্বভাবত অলস বলে সব সময়ই তাঁকে ব্যস্ত দেখাত—কিন্তু ইদানীংকার ব্যস্ততার কাছে সেটা কিছু নয়। অনবরত ঘাড় আর হাত কাঁপছে—যেন ইলেক্ট্রিক-চার্জ্জড্ হয়ে আছেন—কথা বল্‌তে গেলে একটি বাক্যও শেষ করতে পারেন না—মাঝখানে আরেকটি বাক্য সুরু হয়ে যায়—তার মাঝখানে আবার আরেকটি। বাক্যের মুণ্ডমালা থেকে কোনো সদর্থ বা সদ্ভাব আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য।

মাঝে মাঝে রেগে ওঠেন অবনীবাবু: "যা বল্‌তে সুরু করেছেন—ওটা শেষ করে নিন মশাই—"

"হ্যাঁ তাই শেষ করছি। অর্ডার পেতে কোনো গোল নেই—চিঠিপত্র দেওয়া হতনা রীতিমত—কারখানা যখন আছে—চালু কারখানা—ক্যালকাটা ষ্টীল বড়াই করলে ত চল্‌বেনা—" দম নিতে পারছিলেন না রমেশবাবু।

"সবই বুঝলুম। কারখানায় যা-যা করা দরকার তাই করতে হবে—অসিতের সব দিক দেখা হয়ে ওঠেনা।"

"না-না অসিত সবই ঠিক দেখছে—"

"সে কথা নয়। আপনাকেও অনেকখানি দেখতে হবে।" ধমকের মতই কথাটা শোনায়।

"আমি ত দেখছিই—তবে কি না অসিত—অসিতের মতো পারব কেন?"

"অসিত পারছিল না—তাই আপনাকে বলা।"

"তা আমি সব ঠিক করে আন্‌ব।" অবনীবাবুর মেজাজে রমেশবাবু কতকটা ধাতস্থ হয়ে আসেন।

"কোম্পানীর ডিভিডেণ্ড নামিয়ে আন্‌তে হলে কি কেলেঙ্কারী ভেবেছেন কিছু?"

"মাঝে, শুন্‌ছিলুম, ষ্ট্রাইক-ফ্রাইকেরও কি জটলা না কি হচ্ছিল—" চোখ তুলে অবনীবাবুর দিকে একবার চেয়েই চোখ নামিয়ে ফেল্‌লেন রমেশবাবু: "এখন আর ওসব হাঙ্গাম নেই।"

"বাঙ্গালীর মতো অ্যান্টি-ন্যাশন্যাল জাত আর হয় না, তা জানেন? কোথায় ন্যাশন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুল্‌বে—না যেগুলো আমাদের রক্ত জলকরা পরিশ্রমে গড়ে উঠল তাদের গলা টিপে ধরেছে!"

"ষ্ট্রাইকের একটা হিড়িক উঠেছে আজকাল!"

"অন্যদেশে ষ্ট্রাইক হয় তার মানে বুঝি। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল জীবনে ওদের বহুদিনের গ্লানি জমেছে। আমাদের এসব শিশুপ্রতিষ্ঠান—এদের ভেঙ্গে দেবার কোনো মানে হয়?"

"কারখানায় একদিন আপনার যাওয়া দরকার। মজুর কর্ম্মচারীদের সব কথা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। বলা ত যায়না—কোনদিন কে আবার ক্ষেপে ওঠে!"

"সে একসময় ছিল—কোনো বিপদ কোনো বাধাই মানিনি মশাই! এখন মনে হয় জয় করা যায়না এমন বাধাও আছে। আপনারা বলবেন আমার শক্তি নেই। হয়ত তাই। শক্তি মানুষের চিরদিন থাকেনা!"

"এ কি একটা কথা, আপনার শক্তি নেই! আপনার শক্তিতেই ত কারখানায় গিয়ে নড়াচড়া করছি আমরা!"

অবনীবাবু চুপ করে সিগার টেনে যান। সত্যি, মানুষটাতে যেন কোনো ক্ষয়ের বীজাণু কাজ করে যাচ্ছে। লক্ষ্য করে রমেশবাবু মনে মনে খুসী হয়ে ওঠেন। তাঁর ইচ্ছাশক্তির কি দাম নেই? হতে পারে যে তাঁর ইচ্ছাশক্তিই অবনীবাবুর মনে সক্রিয় হয়ে কারখানা পরিচালনায় তাঁর সাহায্য নিতে অবনীবাবুকে বাধ্য করাচ্ছে। ইচ্ছার অপার্থিব শক্তিতে অগাধ বিশ্বাস রমেশবাবুর। ডাক্তার বলে তিনি কিছু বৈজ্ঞানিক বনে যাননি। ডাক্তারি ছিল তাঁর পেশা—টাকা উপার্জ্জনের একটা উপায়। পুরুত হলেই ঈশ্বরজানিত হ'তে হবে তার কোনো মানে নেই। অবনীবাবুকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকৃতে দেন রমেশবাবু। তাঁর দুর্ব্বল অসহায় ভঙ্গীটা দেখতে রমেশবাবুর ভালোই লাগে। তিনি জানেন—ভালো করেই জানেন কারখানার লোকগুলোর কাছে অবনীবাবুর আর দাম নেই। সুযোগ ষোল আনাই পেয়েছেন রমেশবাবু। অন্যান্য ডিরেক্টরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি ঘণ্টা-দেড়ঘণ্টা গল্প করে যান—কারখানার আসন্ন বিপদের আভাস দেন—অসিতের অক্ষমতার কথা আর সেই সঙ্গে নিজের কুশলতার খবর জানিয়ে দিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করে আসেন। তাঁর হাতের মুঠোয় কোম্পানী এসে গেল বলে। ইচ্ছা শক্তির খেলা শেষ হয়েছে—এখন বুদ্ধির খেলা।

"আপনি মূলার কোম্পানীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছেন?" অবনীবাবু চোখে একটু আলোর স্পর্শ পেতে চান।

"করিনি?—সাহেবের সঙ্গে ঢের দিনের পরিচয় আমার। মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে একবার হাত ভেঙ্গে যায়—কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার—"

"কি হল, তাই বলুন!" রমেশবাবুর কথাগুলোকে আর ফাঁপাতে দেন না অবনীবাবু।

"অর্ডার একরকম হাতেই এসে গেছে। মস্ত অর্ডার। আসামে

চারটা ব্রীজ তৈরী করবেন ওঁরা। তার টি-এঙ্গেলস্-বিয়ারিং নাট-বোল্ট সব অর্ডার।"

"নাট-বোল্ট আমাদের এখানে তৈরী হয়না।"

"হয়না ? তাতে কি আছে—বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে ত!"

"কবে পর্য্যন্ত অর্ডার পেতে পারেন ?"

"হপ্তা দুয়েক। কি তারও আগে। সায়েবকে নিয়ে আস্‌ব ভাবছি কারখানা দেখাতে।"

"খুব ভালো কথা। আমিও বলব ভাবছিলুম।"

"সেদিন কিন্তু আপনাকে উপস্থিত থাক্‌তে হবে।"

"দেখি।" আবার চুপ করলেন অবনীবাবু। এখান থেকে নিজেকে যেন তিনি তুলে নিয়ে গেলেন অন্য কোথাও। মনেই রইল না রমেশবাবুর অস্তিত্ব। একটি মৌমাছি পরিশ্রমে আর সঞ্চয়ে গড়ে তুলেছে যে বিরাট মৌচাক তার কাছে নিজে সে আজ খুবই ছোট। কারখানার বাড়িটা—যন্ত্রগুলো—বিরাট কিমাকার একটা প্রাণীর মত মনে হয় আজ কাল। অবনীবাবুর কাছে এদের যেন তিনি চেনেন না, কোনো দিনই যেন চিনতেন না। এদের কাছে এগিয়ে যেতে শরীরে ভয়ের মত একটা যন্ত্রণা অনুভব করেন তিনি। সমস্ত শক্তি চুপসে গিয়ে সামান্য একটু শক্তিতে হৃদপিণ্ডটা ধুক্‌ধুক করতে থাকে। তাই আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে অবনীবাবুকে আজকাল। তিনি একটা পর্দ্দা তুলতে চাচ্ছেন তাঁর সচেতনতার চারপাশে। পুরু এস্‌বেস্‌টসের পর্দ্দা যা ভেদ করে তাপ আস্‌বেনা, শব্দ আস্‌বেনা। বাইরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক্‌বে তাঁর মন। তা যদি করতে পারেন তাহলেই হয়ত বেঁচে যেতে পারবেন যে ক'টা দিন বাঁচা যায়।

রমেশবাবু উস্‌খুস্ করতে করতে একসময় উঠে দাঁড়িয়ে যান:

"যাই। কাল ভোরে একবার সায়েবের সঙ্গে দেখা করে দেখি—অর্ডারটা বার করে আনা যায় কি না।"

"তার আগে সায়েবকে নিয়ে আসুন কারখানায়।" অন্যমনস্ক থেকেই বলেন অবনীবাবু।

"তা-ত নিশ্চয়।" রমেশবাবু ব্যস্ততা দেখিয়ে চলে যান।

ইজিচেয়ারে চোখ বুঁজে আসে অবনীবাবুর। কারখানা বড় হয়ে উঠবে তিনি কোনদিন ভাবেন নি—ভেবেছিলেন ততটুকুই বড় হবে যাতে তাঁর অভাব অভিযোগ মিটে যায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় হয়ে উঠল কারখানা—বড় হয়ে চলল। তাতে তাঁর কোনো হাত ছিলনা। মনে করেছেন তিনি, যা বড় হবার, বড় তা হবেই। টাটার কারখানার স্বপ্নও শেষে এসেছে তাঁর চোখে। কে বলতে পারে একদিন বেঙ্গল আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীও যে টাটার মতই হয়ে যাবে না। কিন্তু তা হয় নি। একটা জায়গায় এসে থেমে গেছে তার বড় হওয়া। অসিতের দোষ? এই ভাটার টানকে তিনি থাকলেও কি বন্ধ করতে পারতেন? অসিত নিজেকে অপদার্থ প্রমাণ করেছে—তিনি কি পারতেন তাঁর আগেকার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে কারখানার ক্ষয় আর ক্ষতি রুখতে? কে বলবে! হয়ত পারতেন না। তাই তিনি যেতে সাহস করেন নি। নিজের মাহাত্ম্যকে বাঁচাতে রমেশবাবুকে ঠেলে দিয়েছেন সাম্‌নে।

একটা পরিচিত খুট-খুট আওয়াজ হয়। চোখ মেলে তাকান অবনীবাবু।

"মুকুন্দবাবু! আসুন, আসুন মশাই..." তলিয়ে যাচ্ছিলেন অবনীবাবু হঠাৎ ভেসে ওঠেন জলের উপর।

"আজই এলুম—" মুমূর্ষুর কণ্ঠে কথাটা বলে কপালের ঘাম মুছলেন মুকুন্দবাবু।

অবনীবাবু লক্ষ্য করলেন যতটুকু স্বাস্থ্য ছিল মুকুন্দবাবু গিরিধিতেই তা রেখে এসেছেন। তবু বললেন: "ভালো ছিলেন ওখানে? চেহারা কিন্তু—"

'আর ভালো! কাউকে জানাইনি—চিঠি লিখতে কলমই তুলতে পারিনি হাতে। ভেবেছিলুম একবার আপনাকে জানাই খবরটা। তারপর ভাবলুম গিয়েই জানাব—সুখের খবর ত নয়।"

"কোনো দুর্ঘটনা—"

"স্ত্রী মারা গেলেন—"

"বলেন কি মশাই—" এতটা অস্থির দেখালেন অবনীবাবু—যা তাকে স্বভাবত দেখা যায় না।

"ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। ধরতেই পারলেন না ডাক্তাররা। যখন ধরলেন, সময় পার হয়ে গেছে।" একটা দীর্ঘ নিশ্বাস টানলেন মুকুন্দবাবু। বুকের পাঁজরগুলো যে তাঁর ফুলে উঠল পাঞ্জাবীর ভিতর দিয়েই যেন তা দেখতে পেলেন অবনীবাবু। "সাংঘাতিক!" কি ভেবে যে তিনি তা বললেন বোঝা গেলনা।

"আমি আর বেঁচে নেই অবনীবাবু—যা দেখছেন শুধু হাড় কখানা।"

"কি দুঃসময়ই না যাচ্ছে আপনার উপর দিয়ে!" দুঃসময়ের কঠোরতাটা উপলব্ধি করে অবনীবাবু নিজেই কঠোর হয়ে থাকেন।

"এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারলুমনা বাড়িতে। ওঁরই সাজানোগুছোনো জিনিষ সব পড়ে আছে। ছটফট করে চলে এলুম।" চোখ দুটো বড় বড় করে একটা চোখ থেকে মুকুন্দবাবু সূতোর মতো পর্দা টেনে আনেন।

তারপর চুপ করে থাকেন তুইজনেই। তুজনে যেন মন থেকে মনে ব্যথার বিনিময় করছেন। তুজনেই যেন অনিচ্ছুক হৃদয় নিয়ে জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। পেছনে পড়ে আছে প্রিয়জন, ডাকলেও যাদের সাড়া পাওয়া যাবে না। নিঃসঙ্গ বিচরণে নিজেদের ধীরে ধীরে মুছে ফেলতে হবে এবার। তার আগে মুছে ফেলতে হবে হৃদয়কে —যাতে অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক তুর্ব্বলতা, অনেক স্নেহমমতা ভালবাসা এসে নীড় বেঁধেছিল। হৃদয়কে মুছে ফেলবার নিষ্ঠুর সাহস তুজনার কারোর বুকেই নেই—হাত তাঁদের কেঁপে যায়—টলতে থাকে পা।

আগে পরে তুজনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। হাঁপানি-ধরা নিশ্বাসে সেই দীর্ঘনিশ্বাসের জের চলতে থাকে মুকুন্দবাবুর অনেকক্ষণ ধরে।

"বাড়ি ত আপনার শূন্যই মনে হবে!" একটু শব্দ কেঁপে ওঠে বিষণ্ণ আবহাওয়াটাকে আরো বিষণ্ণ করে তোলে। এখানে বসে থেকেই মুকুন্দবাবু যেন সেই শূন্যতায় নিশ্বাস নিচ্ছেন। দম পাচ্ছেন না কিছুতেই। অবনীবাবুও যেন নিজের চারদিকে হাত বাড়িয়ে সেই শূন্যতাকেই অনুভব করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল। গাঢ় অবসন্নতায় নির্ব্বোধের মত সামনের দিকে চেয়ে থাকেন মুকুন্দবাবু। অবনীবাবু থাকেন চোখ বুঁজে।

"চলে যেতে ইচ্ছে হয় গুরুজির আশ্রমে। মেয়েটার জন্যে শুধু পারিনে।"

"মেয়েটার শরীর ভালো আছেত?" হঠাৎ অবনীবাবু মাটির স্পর্শ পেয়ে স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন।

"ওর জন্যে আমার তুঃখের সীমা নেই অবনীবাবু।" এক এক করে সমস্ত তুর্ব্বলতাই যেন আজ মুকুন্দবাবু নিবেদন করে যাবেন।

"শরীর সারেনি?"

"শরীর ভালো। কিন্তু ক'দিন আর ভালো থাকবে! সংসারের সমস্ত চাপ ওর উপর। মুখ বুঁজে কাজ করে যাচ্ছে। আমার কোনো অসুবিধে হতে দেবেনা!"

"বাঃ—" মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন অবনীবাবু।

"ওর পড়াশুনোটাও হলনা!"

"পড়াশুনোটাই সব নয়—মুকুন্দবাবু। মেয়েদের ওতে হৃদয় বরং নষ্ট হয়ে যায়।"

"বিয়ে দিইনি—পড়াশুনোই করছিল। খারাপ ছিলনা পড়াশুনোয়। সবই ওর যেতে বসেছে!"

"মেয়ের বিয়ে দেবেন, মুকুন্দবাবু?" অনেক দিনের একটা চাপা প্রশ্ন সুযোগ পেয়ে যেন অবনীবাবু জিজ্ঞেস করে বসলেন।

"বিয়ে হয়ত দিতেই হবে। ওর জীবনটা এম্নি নষ্ট হবে কেন?"

"দেবেন ত?"

"এ-ই জীবনের শেষ কাজ। ছেলে দুটো পড়াশুনো করছে—একটা কিছু করে নিতে পারবে।"

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন অবনীবাবু, মুকুন্দবাবু আবার দুঃখে ডুবে গেলেন।

অনেকদিন ধরে মুকুন্দবাবুকে দেখে আসছেন অবনীবাবু। দৈবাৎ এর অনুপস্থিতিতে মনে মনে অস্বস্তিও হয়েছে তাঁর। তবু তাঁর মনে ইনি কোনোদিনই খুব গভীর দাগ ফেলতে পারেন নি। বন্ধুর সাহচর্যের মত একটা সুখকর অনুভব বোধ করতেন তিনি কিন্তু তা ঠাণ্ডা—তাতে উত্তাপ বা উন্মাদনা ছিল না। আজ তিনি অনেক কাছে পেলেন মুকুন্দবাবুকে, মনের উপরেই যেন এঁর ছায়া পড়ল। অভ্যাস বা আচরণের ছোট ছোট পার্থক্য ঘুচে গেছে দুজন মানুষের—মানুষ

হিসেবেই তাঁরা এত কাছাকাছি। সুড়সুড়ি পেলে তুমি যেমন করবে মুকুন্দবাবু হয়ত তেমন করবেন না—কিন্তু একটা তপ্ত লোহা শরীর ছুঁয়ে গেলে তোমার স্নায়ুতে যে বোধ সৃষ্টি করবে মুকুন্দবাবুর বেলায়ও হুবহু তাই। দেখবে তখন তোমার মুখের রেখায় আর মুকুন্দবাবুর মুখের রেখায় কোনো পার্থক্যই নেই। আজ আর কোনো পার্থক্যই অবনীবাবুকে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রাচীরে আড়াল করে রাখতে পারল না। মুকুন্দবাবু সে-প্রাচীর ভেঙে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন—অবনীবাবুকেও সেখানে এসে চুপিচুপি দাঁড়াতে হল।

"বাইরে থেকে মানুষ হয়ত বুঝতে পারেনা—আমাদের জীবনটাই দুঃখের। কটা দিন জীবনে সত্যিকারের শান্তি পেয়েছেন? আমি ত দেখতে পাইনে—দশটা দিনও জীবন আমার শান্তিতে কাটেনি!" অবনীবাবু তার দীর্ঘ জীবনের আশান্তিকে ধ্যান করতে লাগলেন।

মুকুন্দবাবু হয়ত কতকটা আশ্বস্ত হয়ে এসেছিলেন। হতে পারে যে অবনীবাবুর সহৃদয়তাই তাকে মুগ্ধ করেছে—কিম্বা হয়ত অবনীবাবুর অশান্তিময় জীবনের উল্লেখে নিজেকে হাল্কা মনে হচ্ছিল তাঁর।

চা এলো। মুকুন্দবাবুর আসার খবর রান্নাঘর অবধি পৌঁচেছে।

"চা খাওয়া হয়নি বাড়িতে। গীতার খাটুনি দেখে বল্‌তে পারিনি আর ওকে চা করতে।" চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিলেন মুকুন্দবাবু। আপেলের টুক্‌রোগুলো পরে চিবুতে থাক্‌বেন।

"আপনি ছিলেননা—তাই চা-টাও আমার সময়মত খাওয়া হতনা—জানেন মুকুন্দবাবু!" অবনীবাবু হঠাৎ হেসে উঠ্‌লেন। মুকুন্দবাবুর মনে হল হাসি তিনি অনেকদিন দেখেননি—অন্তত অবনীবাবুর মুখে ত নয়।

তেরো

কাগজের উপর ফাউণ্টেন-পেনটা একটু থেমে রইল দীপকের। চোখে হাসি নিয়ে তাকাল সে অসিতের দিকে।

"কংগ্রাচ্যুলেশন। আর কিছুর জন্যে নয়—সুবুদ্ধির জন্যে।" অসিত দরজায় দাঁড়িয়েই বল্‌তে লাগল।

"শুধু বুদ্ধির জন্যে নয়?" কলমটা ক্যাপে এঁটে টেবিলের উপর রেখে দিলে দীপক।

"লোটাকম্বলের ভবিষ্যৎ বাণীটা ফাঁসিয়ে দিলি—ওটাকে সুবুদ্ধি বলব না?"

"আমার চিঠি পেয়েছিস্?"

"তা নয় ত কি ধ্যানে জান্‌তে পারলুম বিয়ে করছিস?" অসিত একটা চেয়ারে এসে বসে পড়ে।

"বিয়ে করাটা আমার এতই কৌতূহল জাগাল তোর যে অপিস কামাই করে দুপুর বেলাই হাজির!"

"তোর নূতন অ্যাড্‌ভেঞ্চার—পেছনে তার কত তথ্য থাক্‌তে পারে—কৌতূহল হবে না?"

"তথ্য ত দূরের কথা—পেছনে এমা-ও নেই!"

তবে সে হতভাগিনী কে?"

"বাংলাদেশের ভাগ্যবতী মেয়েরা বেঁচে থাক্।"

"গুজরাট, সিন্ধু, পঞ্জাব, মারাঠার কোন্‌টা?"

"কোনটাই নয়।"

"তার মানে ?"

"মেয়েটি হাওয়ায় তৈরী।"

"তারও মানে ?"

"বিয়ে না করলে তোকে কি পাওয়া যেত ?"

"তার মানে কি আমি বিবাহিত বন্ধুদের কাছেই সুলভ ?"

"বলা বাহুল্য। কিন্তু আমার কথার মানে তা নয়।"

"তাহলে কোনো মেয়েকে দুর্ভাগিণী না বলে আমাকেই দুর্ভাগ্য বল্‌তে হয়—তোর কথার মানে আমি আজ কিছুতেই বুঝতে পারছিনে।"

"দিন চার তোমার অফিস ঘুরে এসেছি—তুমি নেই। বিলিতি-ভূতে-পাওয়া, বুঝেছ ? সাধারণ অনুরোধে কি আর আসতে দেখা করতে ! তাই ও চিঠিতে আমায় বিয়ে করতে হয়েছে।"

"স্পষ্ট মানেটা হল তবে সবই ফক্কিকার ?"

"স্রেফ শঙ্করাচার্য্যের জগতের মত।"

"It ends in smoke—Let us then end them to smoke—" সিগারেটের কেস্‌টা খুলে অসিত টেবিলের উপর রাখলে।

"সবই ভার্জ্জিনিয়া !"

"ভয় নেই—ভার্জ্জিন ত নয়।"

"বরং ভার্জ্জিনদেরই আমাকে ভয় !"

হাত-পা ছড়িয়ে অসিত হাস্‌তে লাগল—হয়ত নিজের কথাতেই, দীপকের কথায় নয়।

সিগারেটটা মুখে নিয়ে দীপক বল্‌লে: "তোকে কদিন না দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম—কণ্ডিশনড রিফ্লেক্সের কারিকুরি !"

"তাই বসে বসে In Memorium তৈরী হচ্ছিল ?"

"ওটা নূতন বাতিক।"

"পত্ত লেখা ?"

"পত্ত নয়—গত্ত। অবিশ্যি তা ইংরিজিতে—বঙ্গের ভাণ্ডারে বিবিধ রতন থাকা সত্ত্বেও।"

"কি লিখ্‌ছিস এ বয়েসে ?" দীপকের ছেলেমানষিতে একটু কৌতূহলী হয়ে ওঠে অসিত।

"প্রবন্ধ। কতগুলো হরফ সাজিয়ে গেলে টাকাপয়সা পাওয়া যায়।"

"ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজ্‌ল্‌-এর মত ?" অনায়াসে হেসে ওঠে অসিত।

"বাঁধাধরা হরফ নয়—খুসীমাফিক। তা-ই যা সুখ।"

"পত্রিকাওয়ালাদের টাকা পয়সা আছে তাহলে—কি বলিস্‌ ?"

"পত্রিকায় যখন কোম্পানীর জয়গান করাতে হয় তোদের, টাকা পয়সার ওদের অভাব কি ?"

"কোম্পানীর খোঁচাটা এখন আর আমার গায়ে লাগে না—ওখানে ঘুঘু চরছে !"

"ঘুঘু ? ব্ল্যাষ্ট ফার্ণেসে দেখে এলুম স্ক্র্যাপ আয়রণ চড়েছে—"

"ওসব ঘুঘুরই কারসাজি। কোম্পানীর এক বুড়ো ডিরেক্টরকে এনে বসিয়েছেন বাবা খবরদারিতে।"

"Your service no longer required ?"

"তা নয় ঠিক—Your service not so keenly required ! আমি আছি ওই তোর হরফ সাজানোর মতই—খুসী-মাফিক !"

"তাহলে এখন ভুকাপ কফিই খাওয়া যাক্‌ কি বলিস্‌—তারপর টাকিস্‌ টুবাকো।" চটির হাল্কা আওয়াজ করে দীপক বেরিয়ে গেল।

সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে অসিত ভাবতে লাগল দীপকের আর তার নিজের কথা। ওরা যেন রেস দিচ্ছে। পৃথিবীর মত একটা অক্ষপথ তৈরী করে চল্‌তে সুরু করেছে। কিন্তু দীপকের পেছনেই

সে পড়ে রইল। দীপক যখন পুরোদমে গ্রীষ্ম ঋতুর ভেতর দিয়ে ছুটে চল্‌ছিল, অসিতের সাম্‌নে তখন রোদের ঝিলিমিলি শুধু। এখন অসিতের পথ উত্তপ্ত দিন আর রাত্রির উদয়াস্তে নির্ম্মিত কিন্তু দীপক এগিয়ে গেছে হেমন্তের নিরুত্তাপ মন্থর দিনগুলোতে। ওর ঠোঁটের হাসির অর্থ নয় আর এখন প্রখরতায় নির্ম্মম—স্নিগ্ধতায় তা যেন অনেক নম্র। হয়ত এ সময়—হেমন্তের এই উদাস প্রসন্নত, তার জন্যেও অপেক্ষা করছে—পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অগ্ন্যুৎপাতের শেষে নেলীর সঙ্গে যৌবনোত্তর দিনগুলোও হয়ত তার এম্নি সুশ্রী নীরবতায় ভরে উঠবে। ভরে উঠবে কি? সেই অগ্ন্যুৎপাতে কি তার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না? তা-ও হতে পারে। দীর্ঘ নিশ্বাসের বদলে এক মুখ ধোঁয়া সিলিং-এর দিকে সজোরে ছেড়ে দেয় অসিত।

"আমি সুদূরের পিয়াসী বলে ত বেরিয়ে পড়লি—তারপর কি?" চটি বাজিয়ে দীপক এসে ঘরে ঢুকল।

"সুদূরের কাছাকাছি এবার।" অ্যাস্‌-ট্রের ভেতর সিগারেটটা চাপতে থাকে অসিত।

"মুকুলবাবু পেছন থেকে অভিশাপ করছেন না ত?

"মুকুল? ও একটা পুরোদস্তুর স্কাউণ্ড্রেল!"

"এবার ত তোর কথার মানে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে আমাকে।"

"মানে স্কাউণ্ড্রেল হলে যা হয়। জানিস্ ওর পড়াশুনো ডিগ্রী ডিপ্লোমা সব ফক্কিকারি।"

"জানিনে। অনুমান করেছিলুম। ফরাসী ভ্রমণ করে ব্লু-সিনেমাই দেখেছে শুধু—আমি হলে যা করতুম।"

"But Nellie was so devoted and good—কিন্তু নেলীর উপরও ও যাচ্ছেতাই ব্যবহার সুরু করেছিল—ওকে তাড়াতে পারলে যেন বাঁচে!"

"কি করবে বেচারি—হাতী পুষতেই ফতুর হতে হয় তার উপর শ্বেত হাতী!"

"সত্যি ভাব একবার—একজন বিদেশী মহিলা তোমাকে অবলম্বন করে এখানে এসেছে—মাবাপ, বন্ধুবান্ধব দেশপরিজন ছেড়ে—তাকে তুমি কি করে অবহেলা করতে পার?"

"যাক্ তুই ত অবহেলা করছিস্ নে! ইংল্যাণ্ডের কাছে তাহলেই ভারতবর্ষের মান বাঁচল!"

"ভ্যাখ একবার—ওরাই আবার বিলেত ফেরত, কাল্চার্ড্—আমাদের শিক্ষিত সমাজ!" গম্ভীর হয়ে গেল অসিত।

"বিলেত ফেরত বটে কিন্তু এটা ১৯৩৭ সাল—১৮৩৭ নয়। বাংলা দেশের কাল্চারের ভোজে ওরা হরিজন—ওদের ডাকা ত দূরের কথা, আজকাল ছায়া মাড়ায় না কেউ।"

তুপ্লেট কাজু বাদাম—আর তুগ্লাস ঠাণ্ডা কফি এলো। অসিত একটা বাদাম তুআঙুলে তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে খুঁটতে সুরু করলে। মুকুলের উপর উত্তাপটা তার শান্ত হয়ে আসেনি।

"আমরা অ্যাণ্টনীসায়েবের যুগে বসে নেই—বিলেত থেকে শুধু সায়েব আমদানী হয়নি, সায়েবের সমাজও আমদানী হয়েছে—বিলিতি ডাকে কাঁড়ি কাঁড়ি বই আস্ছে—রেডিয়োতে দিনরাত গালগল্প চলছে বিলেতের সঙ্গে। বিলেতকে জান্বার, চেন্বার বা বুঝবার কিছু বাকি নেই আমাদের। কাজেই বিলেত-ফেরতদের কাছে আমরা কি পেতে পারি বল! কি করে ওয়াইন-গ্লাস ধরতে হয়—তা জান্তেও বিলেত ফেরতের দরকার নেই, তুটো পয়সা খরচ করলে ফারপোই তা শিখিয়ে দেবে!" দীপক কফিতে চুমুক দিলে।

অসিত কথা বলছিল না। একটা বাদামই অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে চলছিল।

"অশ্লীলতা বা ইতরামো শিখতেও ত বিলেত যেতে হয় না—এখানে থেকেই ওগুলোর চর্চ্চা খুব ভালো ভাবে করা যায়।" দীপক বাদামের দিকে মন দিলে। কফির পোড়া গন্ধটা একটানা অনেকক্ষণ সহ্য করা যায় না—যেমন ভালো লাগে না পর পর দুটো টার্কিশ সিগারেট টানতে। উগ্রতার জন্যে একটা প্রবল আসক্তি আছে দীপকের—কিন্তু সে আসক্তি ক্ষীণায়ু। বিজ্ঞাপনের বাতির মতো বারে বারে নিভে যায় আর জ্বলে ওঠে।

"দীপক—"কঠিন একটা প্রতিজ্ঞায় অসিতের গলা ভারি হয়ে এলো: "মুকুলের এই ইতরামোর জন্যেই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত নেলীকে আমি বিয়ে করব!"

"That's like a man—" নিরুৎসাহ অথচ গাঢ় দীপকের স্বর।

"নেলীকে বরাবরই বলছে মুকুল, আমাকে ডাইভোর্স করে তুমি চলে যাও। নেলী উত্তর দিয়েছে—'তুমি আমায় ডাইভোর্স কর, আমি কনটেষ্ট করব না, দাবী জানাব না—'। নেলীর এই উদারতায় পর্য্যন্ত মুকুলের বিশ্বাস নেই!"

"নিজেদের উপর যখন আমাদের বিশ্বাস থাকে না পরকে আমরা বিশ্বাস করব কোন্ ভর্সায়? আমরা পুরুষরা সঙ্কীর্ণতায় হাবুডুবু খাই বলেইত মেয়েদের উদার ভাবতে পারিনে।—মেয়েদের বিশ্বাস করিনে। মেয়েরাও আবার ঠিক তেম্নি। তোর মন, আমার মন, মেয়েদের মন সবই সমাজের দীর্ঘ জুলুমের ফল। ওটাকে চিরন্তন ভেবে ফ্রয়েড বাহাদুরী করে গেছে—কিন্তু মানুষের মন যে কত রূপ নিতে পারে সমাজের জুলুম চলে গেলেই বোঝা যায়! ভারতবর্ষের মেডিক্যাল

রিপোর্টে হয়ত পাবে পঁচিশ লক্ষ শিশু রিকেটে ভুগছে—আমি দেখছি ৪০ কোটি লোকেরই রিকেট। আর শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীতে রিকেটি লোক ছাড়া লোকই নেই ছফুট কাবলীওয়ালাকে দেখে ভুল করে বসোনা!" দীপক ম্লানভাবে হাসতে লাগল।

মনোযোগ দিয়ে শুধু কফিই খেয়ে যাচ্ছিলনা অসিত, দীপকের কথাগুলোও শুনে যাচ্ছিল। মদ না খেয়েও যে দীপক এত কথা বলতে পারে তা অসিতের জানা ছিল না। একটু অবাক সে হয়েছে। কিন্তু তাছাড়াও কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছিল।

"কিন্তু তুই কি সত্যি বিয়ে করবি নেলীকে?" বক্তৃতা ছেড়ে প্রশ্ন করে বসে দীপক।

"তাছাড়া উপায় কি?"

"নিরুপায় হয়ে বিয়ে? কর্ত্তব্যজ্ঞান, প্রেম, প্রয়োজন—এর কোনটা তোকে নিরুপায় করে তুলল?"

"যদি বলি অকারণ ভালো লাগা?"

"তবে বলব তোর কাব্য-বোধ আছে, বিবাহ-বোধ নেই।"

"সত্যি কাব্যই হোক আর যা-ই হোক নেলীকে আমার ভালো লাগে।"

"তার মানে এখনকার স্ত্রীকে তোর ভালো লাগছে না!"

"হয়ত তা-ই।"

"তাহলে কি সত্যি এ অকারণ ভালো লাগা? নতুন একটা শরীরকেই ভালো লাগা এর নাম।"

"সে সুযোগ হয়নি।"

"সুযোগটার জন্যেই ত লোভ—ওই সুযোগলাভের জন্যেই প্রেম নামক পরিশ্রমটা করতে হয়।"

"হতে পারে।"

"কিন্তু তা'হলেই বিপদ। এ-শরীরও পুরোনো হবে। খুঁজতে হবে আবার এক নূতন শরীর।

অসিত নিঝুম হয়ে রইল। নিজেকে খুঁজে বার করতে চাইল হয়ত। কিন্তু বেশি গভীরে ত যাওয়া যায় না। যতটুকু সে সচেতন—ততটুকুকেই বোঝা যায়। তার নীচে কি আছে কে বল্‌বে? যতটুকু বোঝা যায় সেখানে নেলী পুরোণো নয় কোনো সময়। নেলীকে পুরোণো ভাবা যায় না। সৌখীন জিনিষ পুরোণো হয় না—গছিয়ে দেওয়া জিনিষই বাসি হয়ে যায় এক রাত্রির শেষে। অলকা বাসি।

"নতুন শরীরটা রেকারিং ডেসিমেলের সংখ্যার মত—একটা সংখ্যা ব্যবহৃত হয়ে গেলে আরেকটা সংখ্যা এসে দাঁড়ায়।" দীপক বক্তৃতার উদ্যোগ করলে: "তাই যদি হয়—বিয়ের কি দরকার, অসিত? ওই প্যারাফার্ণেলিয়াটা অনর্থক নয় কি? একদিন যখন অকারণ ভালো লাগে, কারণবশতই ত একদিন আবার খারাপ লাগতে পারে। তখন আবার ডাইভোর্সের হাঙ্গামা। এই ভালো লাগার ব্যাপারে বিয়ে আর ডাইভোর্স দুই দিকপালের মতো দাঁড়িয়ে থাক্‌বে কেন?"

"ফুলকে ভালোবেসে যেমন ফুলদানীতে রাখতে হয় বিয়েটাও তাই।" অসিত কথা বল্‌লে। তাকে দেখে মনে হল কথার মতো একটা কথা সে বল্‌তে পেরেছে।

"ফুলটা গাছে থাক্‌লেও ভালোবাসার ক্ষতি হয় না। আর ভালোই যদি বাস্‌তে পারো ফুল গাছে থাক্‌লেও বা ভয় কি? যাক্ ফুলের উপমা আর বেশিদূর চল্‌বে না। ভালোবাসাটা যদি তোমাদের সত্য হ'তে পারে, বিয়ের জোরজবরদস্তিটার কোনো দরকারই হয় না তাহলে। কিন্তু কথা কি জানো অসিত—ভালোবাসা আজ সত্য হ'তে পারে না, তাই বিয়ের

প্রয়োজন হয়। জবরদস্তি করে সতীকে দাহ করবার মতই একটা প্রাণহীন ব্যাপার হচ্ছে বিয়ে। ভালোবাসাকে সত্য হতে হলে যে হৃদয়েরই দরকার এ তথ্য ভুলে যাও। বরং হৃদয়হীনতাই ভালোবাসাকে সত্য করে তুল্‌তে পারে। মেয়েদের তোমরা যতটুকু ঘৃণা করতে পারো, মেয়েদেরও ঠিক ততটুকু ঘৃণা করবার অধিকার আসুক—দেখবে দুই ঘৃণার ইম্‌প্যাক্টে এদুই শম্ভু-নিশম্ভুই ধরাশায়ী হয়েছে। বেঁচে আছে ভালোবাসা।” একটু চুপ থেকেই দীপক বল্‌লে: “কিন্তু ভালোবাসার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে যাকে ভালোবাসি তাকে ভুলে থাকা যায় না। অতএব নাও।”

দীপক চ্যাপ্টা সিগারেটের বাক্সটা খুলে ধরল।

একটা সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে অসিত বললে: “মোটের উপর বিয়ে জিনিষটাকেই তুই পছন্দ করিস্‌নে!”

“মোটের উপর কি যে পছন্দ করি তা আমি নিজেও জানিনে।”

“কথা বলা?”

“হয়ত ওটা অ্যালকোহলিক হ্যাবিট্‌। পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়।”

“প্রবন্ধ লেখা?”

“অফুরন্ত সময়কে জব্দ করবার ফিকির।”

অনর্থক জোরে জোরে হেসে ওঠে অসিত। হয়ত এতক্ষণের জড়তা থেকে নিজকে মুক্ত করে আন্‌তে চায়।

“কি লিখিস্‌ এত?” জিজ্ঞাসা করে অসিত।

“সত্যি এত কিছু লিখবার নেই। আমরা যা, তা নিয়ে গর্ব্ব করা চলে না—বা আদর্শ হিসেবে ভবিষ্যতের কাছে দলিলও রেখে যাওয়া যায় না। লিখছি তাই ভবিষ্যৎ নিয়ে—”

“অ্যাস্‌ট্রোলজি পড়ছিস্‌ নাকি?”

“ভবিষ্যৎ জগৎ। কুপিত গ্রহের প্রভাবে জগৎ নষ্ট হয়ে সত্যযুগ

আসবে কিনা তা নিয়ে ভাবছিনে। একটা মুক্তিযুগ আস্‌বে কল্পনা করছি।"

"প্রোফেট্‌ হবার ইচ্ছা ?"

"দুয়ে দুয়ে যে চার হয় এ যারা বল্‌তে পারে তাদের যদি প্রোফেট বলিস্‌ তবে তা-ই।"

"আর যা-ই বলি বিবাহিত যে বলতে হবে না তাই ভরসার কথা—" হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে পড়ল অসিত।

"আমার বিয়ে ফক্কিকার হলেও বিয়ে নামটায় একেবারে অখ্যাতি রটল না—আমি কাপুরুষ বলে মহাপুরুষের অভাব নেই। থাক্‌—খবর দিচ্ছিস্‌ত বিয়েতে ?"

"খবরত একটা রয়েই গেল—তার বেশি খবর দিতে ভর্সা হয় না—কারণ দেয়ালেরও কান আছে শোনা যায়।"

"মহাপুরুষ হলেও দেখছি তুই বীরপুরুষ নোস্‌—দেয়ালের কানকেও যদি পরোয়া করতে হ'ল—"

"ওটা ভারতীয় মহাপুরুষত্ব—"অসিত দীপককে কেটে দিলে: "তাদের কাপুরুষ হলেও ক্ষতি নেই।"

"বেশ আছি আমরা" দীপক ফাঁকা হাসিতে ফেটে পড়ল: "সুযোগ বুঝে ভারতীয় সাজি, দুর্যোগ দেখলে বিলিতি বনে যাই। কিপলিং মিছিমিছি বলেছিলেন, এদেশ-ওদেশ মিলবে না! আমাদের দেখলে ভদ্রলোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ত। পরের চোখ খুলে দেওয়াই ত ভারতীয়দের ব্যবসা—কি বলিস্‌ ?"

কিন্তু অসিত যা বলল তা সম্পূর্ণ অন্য কথা: "একদম লেখক বনে গেলি তুই দীপক ?" একটু থেমে নিয়ে অসিত জিভে আফশোষের আওয়াজ

করলে : "পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেমন কথা বলতে শিখেছিস্! কলম ছেড়ে লোকে অসি ধরে জান্তুম—গ্লাস ছেড়ে কলম ধরতে শুনিনি!"

"তোমাদের দশজনের কৃপায় মার্শ্যাল প্রুস্ত-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করলুম।"

"জানিনে সে ফিল্ড মার্শ্যাল কে? দেয়ালে ত দেখছি রবিঠাকুরের তস্‌বির!"

"ওটা একটা ফার্নিচার। অমন চেহারা-ওয়ালা মানুষের ছবি দেয়ালের শোভা বাড়ায়।"

দুজনেই হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে অসিত বললে : "দাঁড়াইনে আর। চলি এবার—।"

দীপক কলমটা হাতে তুলে নিয়ে বললে : "বিয়ের দিনে মনে রাখিস হাতে গ্লাস ধরটা স্রেফ ভুলে যাইনি।"

চোদ্দ

অজিত কমনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কতক্ষণ নিজেরই সে খেয়াল ছিলনা। দু'একটি মেয়ে হাসি চাপতেই বোধ হয় দাঁতে আঁচল খুঁটে তার পাশ কেটে চলে গেল—তারা তার পরিচিত কি অপরিচিত এখন মনে হলে তা-ও সে বল্‌তে পারবেনা। তারা অবিশ্যি অজিতকে চেনে—একটি ভালো ছেলেকে চেনবার গোপন ইচ্ছা যারা প্রকাশ্য ফ্যাসন করে নিয়েছে তারা সে দলেরই। অন্যসময় হলে অজিত তাদের চোখের কৌতূহলটা খুব তৃপ্তি নিয়েই উপভোগ কর্‌ত। অনভ্যর্থিত ও থাকতনা তাদের সুন্দর সুন্দর হাসি। কিন্তু এখন এম্নি অন্যমনস্ক সে যে যার জন্যে এসে এখানে দাঁড়িয়েছে সে-মন্দারও যদি তার গা ঘেঁসে চলে যায় তবু তার হুঁশ হবেনা।

"আপনি?" লতিকা রায় বেরিয়ে এসে বল্‌লে—ক্লাশেরই মেয়ে লতিকা।

"হেঁ—" চমকে একটু নড়ে চড়ে দাঁড়াল অজিত।

"কিন্তু মন্দার ত আজ আসেনি—এখনো আসেনি!"

"আসেনি?" নিষ্প্রাণ একটা প্রতিধ্বনি করে অজিত আবার খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

লতিকা তাকে সেই অবস্থাতেই ফেলে রেখে নিরর্থক গাম্ভীর্য্য নিয়ে ক্লাশের দিকে চলে গেল।

মন্দার আসেনি। আজই হঠাৎ কেন এলোনা মন্দার? সে জানে নাকি কিছু? কিন্তু জানবার ত কথা নয়। তাকে নিয়ে তার

বাড়িতেও হয়ত একটা কিছু গোলমাল। হয়ত তাই। এমন একটা ঘটনা যে ঘটেছে তা নিয়ে অজিতের মনে একটুও সন্দেহ রইলনা। মন্দারের যে অসুখও হতে পারে তা যেন গুণবার মধ্যে নয়। অসুখ? অসুখ কেন করবে? হয়ত অজিতের সঙ্গে মন্দারের ভাবী সম্বন্ধটা আঁচ করে নিয়েছেন তার দাদারা। তা নিয়ে মন্দারের সঙ্গে বোঝাপড়া চলছে। যেমি আজ তার বাবার সঙ্গে হয়ে গেল। অবনীবাবু ঠিক বোঝাপড়া করতে চাননি—কারখানা দেখাশোনা করার কথা বলবার দিন মনে তাঁর যেমন দ্বিধা ছিল, আজ আর তা নেই। আজ সোজাসুজি তাঁর কথা। আদেশ।

আদেশের কথাটা মনে পড়তেই অজিতের স্নায়ু আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। যে ভাবেই হোক এক্ষুনি মন্দারের সঙ্গে তার দেখা করা চাই। কিন্তু মনের মতো শরীরে তার উত্তেজনা দেখা গেলনা কিছু। পিংপং-এর বলের মত লাফিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলোনা—একটা ভারি লোহার বলের মত গড়িয়ে গড়িয়ে একসময় এসে সিঁড়ির নীচে দাঁড়াল।

মোটরটা সোজা নিয়ে থামাবে নাকি মন্দারদের বাড়ির গেটের সামনে? নিশ্চয়। নিশ্চয় যেতে হবে। মন্দারের সঙ্গে আজই, এক্ষুনি তার দেখা করা চাই। শুধু দেখা করা নয়—সমস্ত বিরোধিতাকে দুপাশে ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে তাদের।

য়ুনিভার্সিটির গেট দিয়ে মোটর নিয়ে বেরিয়ে এলো অজিত। ষ্টিয়ারিং বা ক্লাচে হাত তার ঠিক আছে—ট্র্যাফিক পুলিশের পোষ্টগুলোও স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি—নতুন গাড়ি বেশি স্পীড দিলে চল্‌বে না। মন্দারের বাড়ির গেটের সাম্‌নে গিয়েই থামবে অজিত।

পরিচিত হর্নের আওয়াজ। দোতলার জানালা থেকে অজিতকে

দেখতে পেল মন্দার। মন্দার আস্‌ছে। তবু অজিতের সাহস হলনা মোটরের গহ্বর থেকে বেরিয়ে ওদের ছোট চৌকোনা বারান্দাটাতে গিয়ে দাঁড়াতে। মন্দারের দাদারা নিশ্চয় অফিসে গেছেন, তবু সাহস হলনা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল মন্দার—উত্তরে অজিত তার অনুকরণ করলে। অগত্যা মন্দারকেই আসতে হল মোটরের সামনে।

"চলো—" হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল অজিত।

"বারে—কোথায় যাব?" মন্দারের অনিচ্ছাটাও আব্দারে ইচ্ছার মতই শোনাল।

"কথা আছে।"

"কথা থাকে ত ঘরে চলো—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কথা বলা যায় না কি? তাছাড়া বস্‌তে বল্‌ছ ত পেছনের সীটে!"

"ঘরে তোমায় একা পাওয়া যাবে?"

"একদম একা। বৌদিরা খেয়ে দেয়ে চোখ বুঁজবার জন্যে উপন্যাসের পাতায় চোখ বুলোচ্ছেন—জটিলা-কুটিলার ভয় নেই।"

মোটর থেকে নেমে পড়ল অজিত: "য়ুনিভার্সিটি থেকে এলুম।" অদ্ভুত গম্ভীর শোনাল অজিতের কণ্ঠ।

"ভালো ছেলেরা য়ুনিভার্সিটি থেকেই আসে।"

অন্যসময় হলে উত্তর হত: "খারাপ মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে—যারা বাড়ি বসে থাকে।" কিন্তু অজিত বলল: "কমনরুমে তোমায় খুঁজে এলুম।"

গেট পার হয়ে একটা হতাশাজনক বাগানের ভেতর দিয়ে দুচার পা সুরকির রাস্তা হেঁটে ওরা বারান্দায় এসে উঠল।

"ট্রেন জার্নির মতো যদি না হয়—পাশের ঘরটাতেই বসা যায়, না?" চোখে হাসি নিয়ে অজিতের মুখের দিকে তাকাল মন্দার।

"চলো—"পরিচিত ঘরদোরগুলোকে অজিত যেন কিছুতেই চিনতে পারছে না।

ঘরে বসে অজিত খানিকক্ষণ চুপ করেই রইল—চোখেও যেন ওর দৃষ্টি নেই, মন্দারের মুখ থেকে কোনো অনুভূতিই খুঁজে পাচ্ছিলনা সে চোখ।

মন্দার ঠোঁট থেকে হাসি মুছে ফেলে বললে: "সত্যি বেরুবে? তাহলে শাড়িটা পাল্টে আসি।"

"না:—কি দরকার?" অজিত বুঝতে পারছিলনা কেন সে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। মন্দার সম্বন্ধে কোনো দুর্ঘটনা ভেবে কি? কিন্তু দুর্ঘটনার ছাপ কোথায় মন্দারের মুখে? তবু সে জিজ্ঞাসা করল: "য়ুনিভার্সিটিতে গেলে না যে আজ!"

"চারবছর পর করাচি থেকে আমার এক দাদা এসেছেন—পিসতুতো ভাই—রয়েল হোটেলে আছেন—বৌদি-দের নিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম।"

"ও" একটু উজ্জ্বল দেখাল অজিতের মুখ।

"তুমি বুঝি ভেবেছিলে অসুখ হয়েছে আমার?"

অজিত কি তা-ই ভেবেছিল? কি জানি। ঠিক যেন মনে করতে পারলনা।

"জানো—" দূরে বসে থেকেও কথার ভঙ্গীতে যেন অজিতের কাছে পাশ ঘেঁসে এসে দাঁড়াল মন্দার: "অদ্ভুত মানুষ আমার সে দাদা—বলছিলেন, সবাই মিলে চলো করাচি, সেখান থেকে এয়ারে বিলেত।"

"বিলেত যাওয়ার সুযোগটা ছেড়ে দিয়ে এলে?" হঠাৎ একটু কঠোরই হয়ে উঠল অজিত। মন্দার ততটা লক্ষ্য করলে না—বললে: "আরবসাগরের ধারে সহরগুলোতে যারা থাকে—কথায় কথায় তাদের

মুখে বিলেতের নাম শুনবে। বিলেতের হাওয়াটা সোজা এসে তাদের গায়ে লাগে কি না!"

কি কি প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল—তা মনে করতে চায় অজিত। প্রতিজ্ঞাগুলোর ধার এখন অনেক কমে গেছে। তার কারণ হয়ত প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক। মন্দারকে যেমন সে পাবে কল্পনা করে রেখেছিল তেমন পাওয়া যায়নি। মন্দারের বিমর্ষ হবার কারণ নেই—তবু অজিতের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় রাখবার জন্যে যেন তার বিমর্ষ থাকাই ছিল উচিত।

"পালিয়ে যাবে মন্দার?" অদ্ভুত উচ্চারণ আর তার চেয়েও অদ্ভুত অজিতের স্বর।

"কোথায়, বোলপুরে?" মন্দার এখনো যেন অজিতকে ধরতে পারেনি, পরিহাসে তরল তার কণ্ঠ।

"না-না সত্যি বলছি আমি—চলো আমরা পালিয়ে যাই।"

"পালাতে ত হবেই একদিন, মন্ত্র পড়িয়ে কেউ আমার হাত তোমার হাতে তুলে দেবে না!"

"কেউ দেবে না—তাই বলছি।"

"কিন্তু হঠাৎ—এখুনি তোমার পালাবার কি হয়েছে?"

"যা করবার এখুনি করতে হবে।"

"পড়াশুনো ছেড়ে দেবে?"

"তারপর যদি হয় তবে হবে পড়াশুনো।"

"কিন্তু কেন তোমার এত তাড়াতাড়ি?"

"কারণ আছে।"

"তাত আছেই।" মন্দার চোখদুটো বিষণ্ণ করে আনল: "আমি কি জানিনে যে এভাবে আর থাকা যায় না!"

"এভাবে থাক্‌তে গেলে আমার মত তোমারও বিপদ আছে।"

"কি বিপদ ?"

"বাবা আমায় বিয়ে করতে বলছেন—তাঁরই এক বন্ধুর মেয়েকে !"

"ও তা-ই ?" মন্দার জোরে জোরে হেসে বললে : "বেশ ত বিয়ে করে ফ্যালো !"

"ওতে হাসবার কি পেয়েছ ? বাবার বন্ধুর মেয়েকে আমি বিয়ে করব না কি ?"

"তোমার বাবা ত আর আমাকে বিয়ে করতে বলবেন না—বলবেন তাঁর বন্ধুর মেয়েকেই বিয়ে করতে। মেয়েটি কেমন ? দেখতে বেশ ভালো, না ?"

"অনেক দেখেছি তাকে—বিয়ে করতে হলে নিজেই আমি ঠিক করতে পারতুম।"

"তুমি পছন্দ না করলেও মেয়েটি নিশ্চয়ই তোমার উপযুক্ত।"

"এসব কথা বলবার লোক আমার আছে—সে তুমি নও।"

অজিতের কথায় নয়, এম্নিতেই চুপ করে গেল মন্দার। অজিতও চুপ করে টেবিলের একটা কোণ আঙ্গুল দিয়ে টিপতে লাগল—মন্দারকে যেমন সে দেখবে ভেবেছিল এ যেন তা নয়। ভেবেছিল সেতারের গায়ে ছোট একটু টুস্‌কি দেওয়া মাত্রই ঝন্‌ঝন্ করে উঠবে সমস্ত যন্ত্রটা। কোথায়—কোন্‌দিকে যে কথাগুলো চলে যাচ্ছে মন্দারের—উত্তেজনার লগ্ন চলে গেল, অস্থির হয়ে উঠলনা মন্দার। মনে মনে আশা করেছিল অজিত, মনে যতটুকু কাপুরুষতা লুকিয়ে আছে তার মন্দারের উত্তেজনার মুখে সব ভেসে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

"কি ?" অজিত আবারও প্রশ্ন করলে।

"পালাবার কি দরকার বলো !" মন্দার খানিকটা উজ্জ্বল চোখ নিয়ে তাকায়।

"দরকার নেই ?" অজিত হয়ত ভুলই বুঝ্তে সুরু করেছে মন্দারকে।

"না পালিয়েও ত আমরা বিয়ে করতে পারি।"

"তা হয় না—অনেক গোলমাল হতে পারে। গোলমালের সুযোগ করে দিয়ে লাভ কি ?"

"গোলমাল যে হ'বে তা ত আমরা জানি—আর তা জেনে নিয়েও যে আমরা বিয়ে করতে পারি তেমন সাহস নিশ্চয়ই আমাদের আছে।"

"সাহসের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না সব সময়।"

"কেন ?"

"অন্তত আমি করি না। এখানে থাক্তেই আমার ভর্সা হচ্ছে না। তুমি জানো না বাবাকে। একটা ব্যাপার নিয়ে তিনি ক্ষেপে উঠেছেন। আর ক্ষ্যাপামির সব বিষ ঢাল্ছেন আমার উপর। হয়ত শুনেও থাক্বেন তিনি তোমার কথা।"

মন্দারের পা সেণ্ডেলটাকে নিয়ে খেলা করে চল্ছিল।

"কাল সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমুইনি। বিকেলে ডেকে নিয়ে তিনি তাঁর আদেশ জানিয়ে দিয়েছেন আমাকে। পালানো জীবনে কষ্ট আছে জানি। কিন্তু সে কষ্টকে আমরা নিশ্চয় জয় করতে পারব।"

মুখ তুলে ম্লান ভাবে একটু হাস্‌ল মন্দার।

"জানো মন্দার, বাড়ীর আবহাওয়াটাকে আমি ঘৃণা করি। তুমি হয়ত বলবে, ওটা ভয়। হয়ত তাই—কিন্তু সে যা-ই হোক, বাড়িতে আমি নিশ্বাস নিতে পারিনে। দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে—যেন একটা ভুতুড়ে বাড়ি। হাসি আর গান হয়ত শোনা যায়—তা যন্ত্রের মুখে—রেডিয়োতে। কারু মুখে তুমি হাসি দেখতে পাবে না। সেখানে আমায় দেখলেও তুমি চিন্‌তে পারবে কি না সন্দেহ।"

এত কথারও কোনো উত্তর এলো না মন্দারের মুখ থেকে—এল খুব ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস।

"বলো—" অজিতেরও দম ফুরিয়ে এসেছে।

"কি বল্‌ব ?"

"এ সপ্তাহেই একটা দিন ঠিক কর।"

"এ সপ্তাহে !"

"বলা যায় না—আজ থেকেই হয়ত বাবা বিয়ের বাজার করতে হুকুম দেবেন।"

"আমাকে ভাবতে দেবে না ?"

"ভাববে ?" অজিত বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

"তোমার বাবাকে কি উত্তর দিয়েছ তুমি ?"

"আমার উত্তরের অপেক্ষা তিনি করেন না।"

"তবু ?"

"চুপ করে ছিলুম।"

মন্দার চুপ করে রইল। অজিতও আর কথা বল্‌ছে না। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে মন্দার বল্‌লে : "বেরুবে ?"

"কোথায় ?"

"যেখানে খুসী—একটু বেড়িয়ে আস্‌ব তোমার সঙ্গে।"

"চলো।"

"গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে লাহোরের দিকে রওনা হয়ো না যেন—"

"এত পেট্রল নেই।"

"পথে পথে পেট্রলের দোকান ত আছে—পকেট থাক্‌লেই হল।"

"পকেটেও যা আছে তাতে কোনোরকমে মনিকোর একটা বিল দেওয়া যায়।"

"তাহলে মনিকোতেই চলো "

"একটা সিনেমাও চলতে পারে।"

"তাও না হয় হবে।" মন্দার অদ্ভুতভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ।

"আমি গাড়িতে বস্‌ছি—তুমি চট করে এসো—" অজিতও যেন ঝরঝরে হতে চাইল আবার।

মন্দার চলে গেল। গাড়িতে গিয়ে উঠ্‌তেও কেমন যেন দুর্ব্বল লাগছিল অজিতের পাগুলো। মন্দারের সঙ্গে থাক্‌লে যতটা সুস্থ সবল মনে হয় নিজেকে—একা থাক্‌লেই আবার যেন শুকিয়ে চুপসে দুর্ব্বল হয়ে যেতে থাকে। ওরা পালাবে। কিন্তু তারপর? তারপরের কথা অজিত কিছু জানে না। হয়ত মন্দার জানে। না জান্‌লেও ওরা দুজনে কি তা আবিষ্কার করে নিতে পারবে না? মন্দার কাছে থাক্‌লে আর কোনো ভয় নেই তার।

বারান্দা থেকে বাগানে নেমে এলো মন্দার—ট্রেনে যে শাড়িটা পরা ছিল, ওটাই পরেছে আবার।

পনেরো

মনোরমা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, চিঠিটা কি করে অবনীবাবুকে দেখাবেন। অলকার বাবা চিঠি দিয়েছেন—অলকা তাঁর কাছে থেকেই পড়াশুনো করতে চায়—তিনি একজন সজ্জন এবং বয়স্ক প্রাইভেট টিউটরও নিযুক্ত করে ফেলেছেন—বৈবাহিক মশায় যেন এতে আপত্তি না করেন, বৈবাহিকা যেন দয়া করে অনুমতি দেন। সোজা কথা, অলকা এখানে আর আস্‌তে চায় না। কিন্তু কেন? কেন-র উত্তর পেতে মনোরমার দেরী হবার কথা নয়। অনেকগুলো ছেলেপিলে তাঁর হয়নি বলেই হয়ত বুঝতে পারেন কি তার কারণ থাক্‌তে পারে। ছেলেপিলেদের কচিকচি হাতপাগুলো ছুঁয়ে-ছেনে এখনও তাঁর ভাল লাগে। সুনন্দার আসন্ন সন্তানের জন্যে আগ্রহ তাঁর ভীষণ। অসিত কিছু বলেনি অলকাকে—অলকার তরফ থেকেই হয়ত একটা বিতৃষ্ণা জমে উঠেছে। মনোরমার জীবনে এ বিতৃষ্ণার দংশন এসেছে অনেকবার। সে-দংশন হয়ত তাঁকে সহ্য করে চল্‌তে হয়েছে—তিনি ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী।

মনোরমা লক্ষ্য করেছেন অলকার উপর কেমন যেন উদাস হয়ে গিয়েছিল অসিত। অবনীবাবু লক্ষ্য না করলেও অলকা চলে যাবার পর সন্দেহ করেছিলেন। সন্দেহটা সত্যি বলেই মনোরমা ওটাকে প্রাণপণে চাপা দিতে চেষ্টা করেছেন। চাপা হয়ত দিয়েও সেরেছিলেন। কিন্তু এই চিঠি! ক্ষেপে উঠ্‌বেন অবনীবাবু—আর ক্ষেপে উঠবেন তাঁরই উপর। স্বাভাবিকভাবে মেয়েদের নির্বোধ ভেবে তিনি আর খুসী থাক্‌বেন না—তাঁর মেজাজে অস্থির হয়ে উঠবে সমস্ত বাড়ি।

তাছাড়া সাতদিন ধরে অসিতও নিরুদ্দেশ। কি রকম তেতে আছেন যে অবনীবাবু, তাঁর সামনে যেতে টুটুল-টুলুও ভরসা পায় না! অসিত বাড়ি নেই বলে মনোরমা নিজে কিন্তু অনেকটা হাল্কাই বোধ করছেন। বাড়ি থাক্‌লেও বা কি—কথা কইত না সে কারু সঙ্গে—যেন অচেনা লোক দুএকদিন মাত্র এ বাড়িতে থাক্‌তে এসেছে।

চিঠিটাকে নিয়ে মনোরমা একা একা বেশিক্ষণ দুভোগ ভুগতে চাইলেন না। সুনন্দাকে দেখাতে হ'ল চিঠি। শরীরের ভারে সুনন্দা এম্নিতেই হাঁপায়—চিঠি পড়ে নিশ্বাস তার প্রায় বন্ধ হয়ে এলো; "বৌদিদি আসবেনা আর—ওটার মানে তা-ই মা!"

"অসিতের কাছে হয়ত বৌমা চিঠি দিয়েছিল—অসিত হয়ত সিউড়িতেই গেছে!" অনায়াসেই এত বড় একটা মিথ্যা কল্পনা করে বস্‌লেন মনোরমা। তিনি জানেন সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারাই ভদ্রতা। মিথ্যাকেও সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে মনে তিনি শান্তি পান।

"কস্মিনকালেও না—দাদা সিউড়ি যাননি কিছুতেই।" সুনন্দা ঘাড় নাড়তে থাকে।

"তুই কি করে সে-কথা জানিস?"

"তোমার মনে হয় দাদা সিউড়ি যাবে?"

"মনে না হলে কি বল্‌ছি?"

"উঁহু। দাদার রকম-সকমই কেমন হয়ে গেছে দেখতে পাওনি?"

"ও তা-ই! বিড়বিড় করে ত সব সময় অপিসের ভাবনাই ভাবছে অসিত—সাত কথা বললে একবার হুঁ করে!"

"অপিসে দাদা যান ভেবেছ? রমেশবাবু না কে আসেন বুড়ো ভদ্রলোক—তিনি কাল বাবাকে বলছিলেন।"

"বুড়োকে আবার এক অবতার এনে জুটিয়েছেন উনি!"

"দাদার কথা ছেড়ে দাও মা—উনি গেছেন। বৌদির কি দোষ? কার ভরসায় এখেনে পড়ে থাক্‌বেন?"

"না, স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবেন!" এবার অলকার উপরই রুষ্ট হয়ে ওঠেন মনোরমা।

সুনন্দা আর কথার উত্তর দেয় না। তাকে বড় বেশি ক্লান্ত দেখায়।

কালই হাসপাতালে চলে যাচ্ছে যে মেয়ে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে ভালো লাগে না মনোরমার।

চিঠিটা হাতে তিনি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন।

সুনন্দা গড়িয়ে গড়িয়ে সুপ্রিয়ার ঘরে গিয়ে উঁকি দেয়। মেঝেতে একটা আসন বিছিয়ে সুপ্রিয়া পরলোকতত্ত্বের একটা বই পড়ছিল। আর হুঁ-হুঁ করে টুলুর অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল।

"শুনেছিস্ দিদি—বৌদির কথা?" সুনন্দা ঘরের ভেতর এগোতে সুরু করে।

"নাঃ—" বইটা বন্ধ করে সুপ্রিয়া সুনন্দার দিকে তাকায়।

খাটের উপর পা ছড়িয়ে বসে সুনন্দা বলে: "বৌদি আর আস্‌বেন না।"

"আসবেন না? কেন, আমরা কি অপরাধ করলুম?"

"দাদার সঙ্গে কি হয়েছে হয়ত!"

"দাদাও খুব বাড়াবাড়ি করছেন আজকাল!"

"তাত করছেনই। কদিন থেকে ত বাড়িই আস্‌ছেন না। কোথায় যান যে দাদা—তুই জানিস কিছু?"

"আমি কি করে জান্‌ব?"

সত্যি, সুপ্রিয়া কি করে জান্‌বে? সুনন্দা লক্ষ্য করে দেখল সুপ্রিয়ার চোখের কোলে কালি জম্‌ছে দিন দিন—ঠোঁটগুলো শুকিয়ে উঠছে—একটু রোগাও যেন দেখাচ্ছে শরীর। চোখের দৃষ্টি যেন সুপ্রিয়ার কেমন

অর্থহীন। এ বাড়ির সঙ্গে যেন তার সম্বন্ধ নেই—বাড়ির ভালোমন্দের খবর সে রাখতে চায় না।

বারান্দায় নীহারের গলা শোনা যায়। অজিতের সঙ্গে কথা বলছে।

"কি হে একনিষ্ঠ, বিয়ে না কি করছ ?"

"বিয়ে কি আমরা করি, আমাদের বিয়ে দেওয়া হয়।"

"যা বলেছ ! নিজেদের জান্‌তে নেই আমাদের কখন এডাল্ট হলুম—তাও জান্‌বেন আগে বাপ-মা !"

"এ-শরীরটা ওঁরা দিয়েছেন কি না !"

"সে জোরে দাবী জন্মায়—কিন্তু দাবী বেঁচে থাকে, একনিষ্ঠ, অন্নজোরে।"

"তা-ত নিশ্চয়। টাকা পয়সার মালিক ওঁরা—আর সে টাকাপয়সার প্রতি যখন আমরা নির্লোভ নই !"

"যাক্ সে কথা। মেয়েটি কেমন—তোমার বউ হয়ে যখন আস্‌ছে দেখতে ভালো হবেই। স্বাস্থ্যটা কেমন ?"

"দিদিকে জিজ্ঞাসা করবেন।" চটির আওয়াজ হল। বোঝা গেল অজিত চলে যাচ্ছে। নীহার এখুনি এসে এ-ঘরে ঢুকবে। সুনন্দা একটু ক্যাকাসে হয়ে গেল। শরীরটাকে গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বসে রইল সে।

নীহার ঘরে এলো : "ভাই বিয়ে করছে আপনাদের, খবরটা দিলেন না একবার—রাস্তাঘাট থেকে খবরটা কুড়িয়ে আন্‌তে হল !"

সুপ্রিয়া নীহারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি উত্তর দেবে তা যেন সে জানে না।

উত্তর দিতে হল কাজেই সুনন্দাকে : "যা কাণ্ড লাগিয়েছিল বিয়ে নিয়ে অজিত—বিয়ে করবেনা কিছুতেই—"

"সত্যি ?" সুপ্রিয়া যেন আকাশ থেকে পড়ে।

"বাঃ—তুই জানিস্‌নে কিছু—মাকে ভয় পর্য্যন্ত দেখালে পালিয়ে যাবে !"

"কেন, গীতাত বেশ সুন্দর দেখতে—"

"এটা বুঝছেন না, সেই জন্যেই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত রাজী হল—" যে হাসিটা অজ্ঞ বা বিজ্ঞের মুখে থাকে তেমনি একটা হাসি ঠোঁটে এনে বললে নীহার : "বয়েসেকে ঠাণ্ডা করে দিতে সুন্দরই যথেষ্ট।"

সুনন্দা একটা হাই তুল্‌লে।

"আপনার শরীরত দেখছি খুব খারাপ হয়ে গেছে—" যথোচিত আশঙ্কা নিয়ে নীহার সুপ্রিয়ার দিকে তাকাল।

"কোথায় ?" চোখের নীচে নিয়ে হাতের পাঞ্জাটা সুপ্রিয়া উল্টাতে পাল্টাতে থাকে: "সুনির শরীর এবার কি হয়েছে দেখেছ ?"

"ও শরীর ভালো ছিল আবার কবে ?" সাদাসিধে গলায় বলে নীহার।

নিশ্বাসের সঙ্গে ছোট একটা শব্দ বেরিয়ে আসে সুনন্দার। উঠে সে ঘর থেকে চলে যায়। টুলুকে সঙ্গে করে টেনে নিয়ে যাওয়াতে যতটুকু অসন্তোষ দেখান যায় তার বেশি আর সে কিছু করতে পারে না। নীহার তাতেও বিচলিত নয়। বরং চেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিয়ে একটু ব্যাপ্তি অনুভব করে নেয় সে।

"কি হয়েছে আপনার ? সত্যি, শরীর খারাপ হয়ে গেছে ভীষণ !" রহস্য-উন্মোচনের একটু কৌতূহল এসে লাগে নীহারের চোখে।

"কি আবার হ'বে ! শরীর কি চিরদিন ভালো থাকে কারু ?"

"ওকথা বলার মত বয়েস আপনার নয়।"

"বয়েসও বা কম হল কি ?"

"কুড়িতে বুড়ি হবার ট্রাডিশন রক্ষা করছেন বুঝি ?"

"ট্রাডিশন ছাড়া দুহাতে জড়িয়ে ধরবার মত আমাদের আর কি আছে বল!"

"আছে, তা আপনারা ধরতে চান না।"

"কেউ ধরতে চায়না। কি লাভ আছে বা ধরে? বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকা ভালো।"

"মন বলে যে একটা বস্তু আছে বিশ্বাস দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা রাখা যায়—কিন্তু শরীরটা আমাদের ঠিক বিশ্বাসের পথে চল্‌তে চায়না—তা জানেন? জলের ধর্ম্ম নীচের দিকে যাওয়া—বেদমন্ত্র পাঠ করেও তাকে উপরের দিকে নেওয়া যায় না।"

"এসব কথাই বুঝি ছেলেদের শিখিয়ে বেড়াও?"

"না, শেখাতে উল্টোটাই শেখাই—নইলে চাকুরি থাকে না।"

"তা হলে দেখা যায় জোচ্চুরি তোমাদের পেশা!"

"পেশা কথাটার মানেই জোচ্চুরি, কাজেই ওকথা শুনে আমি নার্ভাস্ হইনে।"

"নার্ভ তোমার খুবই শক্ত তা আমি জানি।"

"নার্ভ শক্ত না হলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না বলেই হয়ত।"

"ভদ্রলোক বলে যেন তুমি দুঃখিত মনে হচ্ছে।"

"খানিকটা তা-ই। জানেন, একে জীবনে বলেনা—বলতে পারেন আত্মহত্যার আর্ট।"

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। নীহারের চোখে আজ আর তেমন হিংস্রতা নেই—বরং তা ব্যথায় বিষণ্ণ। এ ব্যাথার রং যেন একটু একটু চিনতে পারে সুপ্রিয়া। কোনদিন যেন তা তারও মনের উপরে ভেসে উঠেছিল। আজ তা মনের অনেক গভীরে তলিয়ে গেছে। কি করে যে তা হল সে-কথা নিজেও সে বল্‌তে পারবে না। নীহারের বেলায় ত এমন হয়নি।

নীহার সে ব্যাথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কেবল উপরের দিকে টেনে তুল্‌ছে। এমন এক সময় আস্‌তে পারে নীহারের যখন সমস্ত দেহমন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌বে এ-ব্যথার বিরুদ্ধে। সুনন্দার জন্যে দুঃখ হয় সুপ্রিয়ার।

খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে নীহার আবার বল্‌লে: "এ আর্টটা আপনারা খুব ভালো করেই আয়ত্ত করেছেন—আমরা এখনো অনভ্যস্ত।"

"সংযমকে তোমাদের আধুনিক ভাষা যদি অবদমন বলে আখ্যা দেয় তবে আর কি করা যায় বলো! সংযম সব মানুষের জন্যেই। জীবনকে পাওয়ার জন্যেই সংযম, হারাবার জন্যে নয়।"

"হতে পারে। কিন্তু ছেলেবেলায় সংযমের উপদেশটা এভাবে আসেনা—তাই ওর উপর আক্রোশ থাকে আমাদের ভীষণ। তাছাড়া খাদ্য যদি ছড়ানো থাকে তাহলে সংযমের সার্থকতা প্রচুর মানি—কিন্তু দুর্ভিক্ষের দেশে যে বাধ্যতামূলক সংযম, তার অপর নাম উপোস!"

ছোট্ট একটু হেসে সুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে যায়: "তোমার কলেজ বুঝি ছুটি যাচ্ছে কয়েকদিন?"

"না:—কেন?"

"নইলে কি আমার উপর বক্তৃতা চালাতে এসো!"

"কন্‌ফেশনকে বক্তৃতা বলে ভুল করলে আমি কি করতে পারি বলুন!"

"জানো, পথে ঘাটে এত কন্‌ফেস্‌ করতে নেই। গেয়ে বেড়াবার অভ্যাস থাক্‌লে চোর একদিন না একদিন পুলিশের কাছেও চুরির কাহিনী বলে ফেলে।"

নীহার চুপ করে যায় এবার। এ কথার উত্তরে যা বলা যায় বল্‌তে সাহস হয়না নীহারের। সুপ্রিয়া যেন স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে নিজের একটা অসাধারণ ব্যবধান তৈরী করে ফেলেছে। সেই সুন্দর, লোভনীয়,

রক্তমাংসের সুপ্রিয়া যেন আর নেই—মানুষ যে সব মেয়েদের দেবী আখ্যা দিয়ে প্রয়োজনের বাইরে ঠেলে দিতে চায়, এ যেন খানিকটা তা-ই হয়ে উঠেছে। নতুন করেই যেন নীহারের চোখে পড়ল—সুপ্রিয়ার পরনে থান কাপড়। চুলে সে তেল দেয়নি অনেকদিন। হাতে চার পাঁচটা করে চুড়ি ছিল—এখন সরু একগাছি মাত্র চুড়ি। ঠোঁটের লাল আভা মুছে সিঁটকে হয়ে যায়নি—শুকিয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। দূরের যাত্রী কোনো পথিক যেন একটা ম্লান সূর্য্যাস্তের দিকে চেয়ে রইল।

"সুনি কালে হাসপাতালে চলে যাচ্ছে—একটু একটু পেন্ হচ্ছে ওর।" সুপ্রিয়া বল্‌লে।

"কেবিন পাওয়া গেছে ?"

"যাক্ তবু খোঁজটা নিলে।"

"আপনারা এতসব আত্মীয়স্বজন থাকতে আমাকে খোঁজ নিতে হবে কেন ?"

"দায়িত্ব বুঝি আমাদেরই !"

"এ-ক'টা দিনের। তারপর সমস্ত জীবন ত আমার জন্যেই পড়ে আছে !"

"কেন ?" সুপ্রিয়া মুখ কালো করে তোলে : "এ ক'টা দিনের পরও ত সুনির বাপমা বেঁচে থাক্‌বেন !"

"স্বামীর স্বামিত্বটাকেও কি আপনারা হাতছাড়া করাতে চান ?"

"আমরা আর কিছু চাইতে জানলুম কোথায় ? তোমাদের চাওয়াই ফুরোলনা—"

আঘাত নয় কেমন একটা অস্বস্তি যেন নীহারকে অস্থির করে দেয়। মৃত রোগীর মুখ থেকে ডাক্তারের সমস্ত মনোযোগ যেমন এক মুহূর্ত্তে উঠে সরে আসে—তেম্নি অবস্থা হল নীহারের। ভালো লাগ্‌লনা সুপ্রিয়াকে।

মনে হল, সুপ্রিয়া আর কিছু নয়—হিন্দু বিধবা। ঘরের সাদা দেয়ালের উপর হতাশ ভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নীহার উঠে পড়ল। বসে থাকবার দরকার নেই, মানে নেই। এ ঘরের আকর্ষণও ফুরিয়েছে তার।

ষোল

প্রফেসর দাশগুপ্ত 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল্ ক্রাইসিস্' নিয়ে আলোচনা করছিলেন। একান্ত বাধ্য ছাত্ররা আলোচনায় যোগ দেয়নি—যদিও তাদের সে অধিকার তিনি দিয়েছেন। গুরুবাক্যে মগজ ভর্ত্তি করে নেওয়াই তাদের বিবেচনায় সব চেয়ে নিরাপদ।

প্রফেসরের ভারতীয় মন মেসিন ইণ্ডাষ্ট্রির খুঁত ধরে পুলকরোমাঞ্চ এবং শিহরণ অনুভব করছিল। এক ক্লাশ ছেলেমেয়েকে স্তম্ভিত করে দেবার অভিপ্রায়ে তিনি বলে যাচ্ছিলেন : "যন্ত্র দানবের সঙ্গে যে জুটো নন্দীভৃঙ্গী দেখা যায় তা হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন আর বেকার সমস্যা। ফোর্ডের কারখানার মতো হাজার কারখানা আমেরিকা তৈরী করতে পারে—সে-সব কারখানা থেকে কোটি কোটি মোটর গাড়ি পারে বেরিয়ে আসতে—কিন্তু তা কিন্‌বে কে? পয়সাওয়ালা ক্রেতা নেই। চাহিদা আর উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করছেনা, উৎপাদনই এখন চাহিদা তৈরী করতে তৎপর। তাই কারখানাকে বাড়তে দেওয়া হয় না। উৎপাদনের সীমা নির্দ্দেশ করে দিতে হয়। তারপর শ্রমিক-মজুরদের খেটে খাওয়া থেকে বঞ্চিত করে চলেছে এই যন্ত্র। যতই যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে ততই মজুররা গিয়ে বেকার অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে—তাদের অনেক কাজ এখন যন্ত্রই করে। কবে যুদ্ধ বা মহামারী হয়ে পৃথিবীর লোক সংখ্যা কমে যাবে ম্যালথাসের এই বাণীর উপর কর্ম্মঠ মানুষ আর বিশ্বাস করে বসে থাকতে পারে না। সভ্য মানুষ তার অর্থনৈতিক বিধানকে বাঁচাবার জন্যে তাই বর্ব্বরতার আশ্রয় নিতেও কসুর করেনি। নাৎসীদের ইহুদী-নিধনটা এ

প্রসঙ্গ তোমরা মনে করতে পার। কিন্তু সত্যিকারের এ সমস্যায় হাত দিয়েছে আমেরিকা। মজুরদের শ্রম-সময় কমিয়ে দিয়ে, বেতন বাড়ান হয়েছে। তাতে বেকার শ্রমিকদের উদরের সংস্থান হল আর শ্রমিকদের ক্রয় শক্তিও বেড়ে গেল—তাতে করে হবে উৎপাদন বৃদ্ধি, ইণ্ডাষ্ট্রির প্রসার। কিন্তু এতে যে সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায় তা নয়। এর আঘাত পড়ে সঞ্চিত অর্থের উপর—আমেরিকার মূলধনীরা সঞ্চিত অর্থে খানিকটা স্ফীত আছেন বলেই এ আঘাত আপাতত সাম্‌লে নিচ্ছেন। যন্ত্রোৎপাদন নামক বস্তুটির হাতের পুতুল যদি একবার হয়ে পড়, তাহলে আর নিস্তার নেই। এখানে তোমরা গান্ধীজিকে স্মরণ করতে পারো। তিনি যে যন্ত্রোৎ-পাদনের বিরোধিতা করছেন তা শুধু পাশ্চাত্য জগতের যন্ত্রশিল্পের সঙ্কট দেখ্‌তে পেয়েছেন বলেই। পাশ্চাত্যেরও বহু অর্থনীতিজ্ঞের অভিমত-যন্ত্রশিল্পকে খাটো করে আনা। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করবার জন্যে এই রকম নানা পরিকল্পনা চল্‌ছে। এই সমস্যাকে স্বীকার করেই আমাদের চল্‌তে হবে। আমরা শুধু পারি যেখানে সমস্যার মুখ ধারাল হয়েছে তাকে উকো দিয়ে একটু ঘষে দিতে—"

"চোখ বুঁজে চল্‌তে বা পালিয়ে যেতেও চেষ্টা করতে পারি—" মন্দারের কথাটা ছুরীর মতো কেটে দিয়ে গেল প্রফেসরের বক্তৃতা। এতক্ষণ গভীর মনোযোগে মন্দার গুরুবাক্য শুনে যাচ্ছিল।

প্রফেসর প্রথমটায় বিরক্ত হয়েও শেষে খুসী-খুসী হয়ে উঠ্‌লেন। আপত্তিটা একটি মেয়ের কাছ থেকে এসেছে!

"এ সমাধানগুলো তোমার যুক্তিতে ভালো ঠেক্‌ছেনা?" বিগলিত হয়েই প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলেন।

"একটা পথ বা পদ্ধতি যদি নষ্ট হয়ে যায়—নূতন পথ খুঁজে বার করতে হয়। অন্ধগলিতে ঘুরে মরে লাভ কি?" মন্দারের কণ্ঠ একটুও সলজ্জ নয়।

সমস্ত ক্লাশে গুঞ্জন উঠ্‌ল। সেই গুঞ্জনে মন্দারকে ধিক্কার দেবার মত ভালোছাত্রের অভাব ছিলনা—আবার মন্দারকে সমর্থন করবার মতোও মগজের উজ্জ্বলতা অনেকের ছিল।

"তোমার বক্তব্যটা কি ?" প্রফেসর মুখ টিপে হাস্‌তে লাগলেন।

"ভোগের জন্যেই উৎপাদন হবে লাভের জন্যে নয়—তাহলেই দেখা যাবে এসব সমস্যা সমস্যাই নয় !"

"ও, তুমি সোশ্যালিষ্ট !" ওই একটী কথায় প্রফেসর মন্দারের সব বিরোধিতাকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন : "এ সম্বন্ধে তোমরা একটা পেপার তৈরী করে ফ্যালো।"

অজিত সব সময়ই অন্যমনস্ক ছিল। প্রফেসরের কথার একটি বর্ণও তার কানে যায়নি। অনেকক্ষণ মন্দারের দিকে চেয়েছিল—মন্দারের প্রত্যেকটি পলকের সঙ্গে পলক ফেলে। মন্দার একবারও তাকায়নি তার দিকে। সে যে তাকিয়ে আছে তা-ও যেন মন্দার লক্ষ্য করবার প্রয়োজন বোধ করেনি। আশ্চর্য্য ! অজিত অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এ মন্দার যে কোনো দিন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—হেসে কথা বলেছে—অভিমান করেছে জড়িয়ে ধরেছে তার শরীর তা যেন আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। সেই শেষদিনের সেই মোটর-ট্রিপের কথা মনে পড়ে অজিতের। কেন যে মন্দার তার সঙ্গে মোটরে বেড়াতে রাজী হয়েছিল, আজও তা সে বুঝতে পারে না। পালিয়ে যাবার কথায় আগেও মন্দার তেমি ভাব দেখাতে পারত। কিন্তু মোটরে সে-কথা শুনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়ে গেল তার। একবার মাত্র 'না'—বলে পাথরের মত শক্ত হয়ে রইল সে। তারপর আর একটি কথাও বলেনি। অজিত আবেগে অস্থির হয়ে ক্ষমা পর্য্যন্ত চেয়েছে—মন্দারের ঠোঁট তবু একটুও কেঁপে ওঠেনি। ওদের বাড়ির গেটে মোটর থামাল

অজিত। নিজ হাতেই মোটরের দরজা খুলে, একটি শব্দ না করে—পেছন দিকে একটু না তাকিয়ে মন্দার সোজা ওদের বাড়িতে ঢুকে গেছে। নিজের কোনো অপরাধ আবিষ্কার করতে পারেনি অজিত তাই মন্দারকে তখন সে আর ক্ষমা করতে পারেনি। মন্দারের উপর আক্রোশেই অজিত বাড়িতে তেম্নি চলাফেরা করতে সুরু করেছে বিয়ের খবরে ছেলেরা খুশী হয়ে যেম্নি করে থাকে।

কিন্তু আশা ছিল অজিতের—মন্দার হয়ত এখনো দুর্লভ নয়। খেয়ে মুখ মুছে ফেলার মত করে মেয়েরা অবিশ্যি আগেকার ভালোবাসাকে মুছে ফেলতে পারে কিন্তু তা বিয়ের পরে। মন্দার কি এখুনি ভুলে যেতে পারবে অজিতকে? কিন্তু আশ্চর্য্য—মন্দার তা পেরেছে। অজিতের দিকে যদি তাকায়ও সে হয়ত এমন দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে—যা দেখে কেউ বল্‌বে না অজিতের সঙ্গে কোনোদিন তার সামান্যও আলাপ ছিল।

আসল কথায় মন্দারকে সে ভুল বুঝেছিল। সাহস নেই মন্দারের। সবটুকুই ওর প্রজাপতিপণা—সাধারণ চোখে দেখতে সুন্দর, মাইক্রোস্‌কোপে দেখতে গেলে সাধারণ, অতি সাধারণ মেয়ের মতই কুৎসিত। বাড়ন্ত আগাছা দেখে অরণ্য বলে ভুল করেছে অজিত। অজিত নিজেও যে দুর্দ্দান্ত সাহসী তা নয় তবে একটি সাহসী মনের স্পর্শ পেলে দুঃসাহসী হয়ে উঠবারও ক্ষমতা তার আছে। একা কিছু করা যায় না—অন্তত অজিত পারে না একা বাইরে এসে বিদ্রোহের চীৎকার তুল্‌তে। কি দরকারও বা আছে তার! বিদ্রোহের স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়ে এমন কি মহাসম্পদ সে লাভ করবে, এমন কি মূল্যবান বস্তুর প্রলোভন আছে তার?

হঠাৎ আশেপাশে ছেলেদের মুখে মন্দারের নামের একটা গুঞ্জন শোনা গেল। ভয় পেয়ে গেল অজিত। মিথ্যা ভয়। অভ্যস্ত ভয়। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই সে কৌতূহলী হল। কি বল্‌ছে এরা? প্রফেসরের সঙ্গে

তর্ক করছিল মন্দার ? ততটুকু সাহসই ওর আছে। যার আরেক নাম প্রদর্শনীবিদ্যা—এক্‌জিবিশেনিজ্‌ম্‌ ! ভেতরের সেই পচা মেয়েলি বৃত্তিটাকে আধুনিক উপায়ে জাহির করা ! পুরুষের কাছে নিজেকে উঁচু করে তুলে ধরা ! তোমরা দ্যাখ, বিস্মিত হও, প্রশংসা কর। প্রশংসা পেলে ওরা অনায়াসে হয়ত আত্মহত্যাও করতে পারে ! পুরুষের হাতে যে ওরা লাঞ্ছনা সয় হয়তো তা পুরুষের কাছ থেকেই প্রশংসা পাবার লোভে !

ফাউণ্টেন পেনের ক্যাপটা অজিত দাঁত দিয়ে কামড়াতে সুরু করলে।

"তোর মন্দারের কীর্তি দেখ্‌লি ?" পেছন থেকে সমীর ফিস্‌ফিস্ করে।

সাদা, ফ্যাকাসে মুখে পেছন দিকে তাকায় অজিত।

"বেড়ে বলেছে কিন্তু ! R. S. D. কুপোকাৎ।"

অজিত পেছন দিকে আর তাকায় না ! ঘাড় নাড়তে থাকে।

"গান্ধী-মার্কা একনমিক প্ল্যানিং চালিয়েছিলেন R. S. D। শুনেছিস্‌ ত ? দারুণ কাউণ্টার আর্গুমেণ্ট চালাচ্ছিল মন্দার। হয়ত তোরই শেখানো বুলি বাবা ! গরীবের বদলে তোরা বড়লোকরাই ত আজকাল কম্যুনিজম্‌ করে নিলি !"

কথার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা চাপা হাসি শুনতে পায় অজিত। মন্দার কি তার নামটা মুছে দিতে পারল অজিতের নামের পাশ থেকে ? হয়ত একদিন মুছে যাবে—এরা জান্‌তে পারবে অজিতের সঙ্গে তার বিচ্ছেদের অধ্যায়টা। অনেক কৌতূহল, অনেক প্রশ্ন এসে ঘিরে দাঁড়াবে এসে তাকে সেদিন। তার কি উত্তর অজিত দেবে ? কি উত্তর সে দিতে

পারে ? একমাত্র মন্দারই পারে তাদের কৌতূহল মিটাতে। কল্পনায় অনেককিছু আবিষ্কার করলেও সত্যটাকে খুঁজে বার করতে পারেনি অজিত। নোট নেবার খাতার কভারে অজিত হিজিবিজি আঁকতে সুরু করে।

ক্লাশ থেকে আগেই বেরিয়ে গিয়ে কমনরুমের দরজায় দাঁড়িয়েছিল অজিত। লতিকার সঙ্গে অনর্গল কথা বলতে বলতে আসছিল মন্দার। অজিতকে দেখতে পেয়েই চুপ করে গেল সে।

"এই—শোনো—" স্মার্ট হতে চেয়েও অজিতের গলাটা একটু কেঁপে গেল।

দাঁড়াতে চেয়েছিল লতিকা। কিন্তু তাকে টেনে নিয়ে মন্দার ঘরের ভেতর চলে গেল।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে লতিকা : "মানে ?"

"মানে শুনবনা।" মন্দার দৃঢ়তায় খানিকটা বিষণ্ণ দেখালে।

"কি হলো ?"

"কিছু একটা হয়েছে ত বুঝতেই পারছিস !"

"কিছু একটা হওয়াত উচিত ছিলনা।"

"ওটা দুর্ভাগ্য।"

"ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার সংঘাতকেই দুর্ভাগ্য বলে জানতুম। ইচ্ছা আর অবস্থাটাইত শুনতে চাই !"

"অবস্থা ভালো—মানে টাকাওয়ালা লোক আর ইচ্ছা হল অনিচ্ছা।" মন্দার কেটে পড়তে চায়।

"এই—বল্—সত্যিকরে—" চেঁচিয়েই ওঠে লতিকা।

অনেকগুলো মেয়ের চোখ তাদের উপর জ্বলে ওঠে। মন্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে খাতা খুলে নোট পড়তে সুরু করে। কিন্তু সে বুঝতে

পেরেছে এখুনি মেয়েরা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াবে—অজিতের সঙ্গে প্রথমে মোটর-ট্রিপের পর যেমি এসে দাঁড়িয়েছিল। এবারেও সোজাসুজি বিচ্ছেদের কাহিনীটা জানিয়ে দিতে হবে তাদের যেমি সে মিলনের কাহিনী জানিয়েছিল।

সতেরো

সেণ্ট্র্যাল এভিন্যু-তে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে দীপক ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরে আস্‌ছিল। বরাকর থেকে নেলীকে নিয়ে অসিত সোজা ওই ফ্ল্যাটে এসে উঠবে। বরাকরে ওদের হানিমুন হয়ত হয়ে গেল। টেলিগ্রামে অবিশ্যি ও সব কথা কিছুই লেখেনি অসিত—মাত্র একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে রাখতে অনুরোধ জানিয়েছে। অসিতকে নিয়ে ভেবে চলেছিল দীপক। হঠাৎ এম্নি ক্ষেপে উঠল কেন ছেলেটা? পরিবারের একটি সুপুত্র কি করে এম্নি বিগড়ে যেতে পারে! ওর স্ত্রী আছে—স্ত্রীর নিন্দা কোনোদিন অসিতের মুখে শোনা যায়নি বরং গোড়ার দিকে দু-এক পেগ শ্যাম্পেন যখন টান্‌ত স্ত্রীর রূপ আর গুণ বর্ণনায় মুখ ফেনিয়ে তুল্‌ত সে। নেলীর প্রয়োজন এমন কি ভীষণ হয়ে উঠতে পারে তার কাছে? সবটুকুই ক্ষণিক মোহ? ভাবালুতার তেমন কিছু নরম মাটিত ছিলনা অসিতের চরিত্রে যার উপর ক্ষণিক মোহ এসে জাঁকিয়ে বস্‌তে পারে! তবে এ কি? দীপক নিজেকে অপরাধী করে দেখতে চায়। সে-ই কি তার মনে এমন কতগুলো বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে যাতে অসিতের পরিবারের পক্ষে এ মারাত্মক ফসল ফলে উঠতে পারে? শরৎচন্দ্রের নায়ক আজকালও কি বাংলাদেশে জন্মায়? অসিতের ততটা বয়স হয়েছিল যখন নিজেকে চালিয়ে নেবার একটা আদর্শ মানুষ তৈরী করে ফ্যালে। সে আদর্শ যেমনই হোকনা, মানুষের জীবন-মৃত্যু তাকে ঘিরেই তৈরী হয়। স্নায়ুগুলোর গ্রহণ ক্ষমতা তখন আর পাল্টে যেতে পারে না। বুড়ো বয়েসে চোরের সাধু হয়ে ওঠাটা আগাগোড়াই ফাঁকি। এমন বিস্ময়কর

পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা যদি মানুষের মনে সত্যিই থাকত তাহলে ত আজ আমরা স্বর্ণযুগে বাস করতাম। একটা বয়েস পার হয়ে গেলে মনের পরিবর্ত্তন দুঃসাধ্য। বাইবেলের ঈশ্বর হুকুম দিয়ে আলো জ্বালিয়ে থাক্‌বেন—কিন্তু তাঁর হুকুমেও মানুষের মন উল্টো গাইতে সুরু করবে না। দীপক নিজেকে অপরাধ মুক্ত করে এনে একটা সিগারেট ধরায়। কিন্তু অসিতকে আবিষ্কার করতে পারেনা সে কোনো যুক্তি দিয়ে। প্রত্যেক মানুষ ছোটখাটো একটি ঈশ্বর—যুক্তির পথে কিছুতেই ধরা দেবেনা! তবু দীপক যুক্তিই শুধু হাতড়ে বেড়ায়। শেষটায় হাল ছেড়ে মানুষকে বুঝবার আরেকটা পথ খুঁজতে থাকে। হৃদয়ের পথ। এ পথের অলিগলি খুব বেশি জানা নেই দীপকের। একটা অদৃশ্য গ্রন্থির অতি সামান্য রস পরিবেশনে মানুষের শরীরের মতো, একটি ক্ষুদ্র আবেগের সূক্ষ্মধারাও যে মানুষের মনকে অদ্ভুত রকম বদলে দিতে পারে দীপক সে তথ্য বুঝতে চেষ্টা করেনি। আবেগকে আঁকড়ে ধরেই আজও হয়ত মানুষ বেঁচে যাচ্ছে কিন্তু সত্যি কি মানে হয় সে বাঁচার? সে নিজেও হয়ত তেম্নি করে বেঁচে এসেছে অনেক মুহূর্ত্তে। একটা মুমূর্ষু ভিক্ষুককে ব্যাগশুদ্ধ কতগুলো টাকা দিয়ে ফেলার কি সার্থকতা আছে? কি সার্থকতা আছে রুগ্ন ম্লান কেরানীদের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যাবার—রোগ-বীজাণুর আহার করে দিয়েও দেহকে যারা নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে পারে না, অন্ধকারে সে-সব মেয়েদের ঘোরা-ফেরা দেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাই কি যথেষ্ট? নিজেদের শ্রমকে যারা উজোর করে বেচে দিয়ে গেল, চোখের জন্যে রইল না আকাশের রং, শরীরের জন্য রইলনা পৃথিবীর হাওয়া, তাদের কথা ভেবে বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন করে উঠলেই কি সব হয়ে গেল? এদের ত দেখেছে দীপক। একলা অনেক মুহূর্ত্ত কাটিয়েছে এদের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় করে! কিন্তু কার কি

হয়েছে তাতে? তারপর কি এদের আর দেখা যায়নি পথে? ব্যথিত মুখ নিয়ে রোজইত এসে তারা রাস্তায় দাঁড়ায়!

হৃদয়ের পথে অসিতকে চিন্‌তে গেলে তার মুখ থেকে একটা মুখোস হয়ত খসে যেতে পারে। হয়ত অসিতের একটা ব্যথিত মুখ দীপকের চোখের সামনে যাতায়াত করতে সুরু করবে। কিন্তু তাতে কার কি লাভ? হৃদয়ের জানালাটা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে আজকাল তাই দীপক। অসিতের জন্যে তা ভাঙতে গিয়েও আবার ফিরে আসে। অসিতের বাইরের জীবনটাকেই দেখে যাবে দীপক। সে জীবনের সঙ্গে তর্ক করে ঝগড়া করে বা তাকে সমর্থন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়।

ড্রাইভার ভুলপথ ধরেছিল—তাকে শুধরে দেয় দীপক। অসিতকে ছেড়ে দিয়ে কলকাতার রাস্তায় সে ফিরে আসে। দিনের পর দিন একই রকম চেহারা এ রাস্তার। ব্রাউনিঙের জগতের মতো সমস্তই ঠিক আছে। একটু গরমিল, একটু ক্রুটী, একটু অপরাধ, একটু অন্যায়ের দোলা যেন কখনো কোথাও নেই—নিরুদ্বেগ, শান্ত এই সহরের জীবন-যাত্রা! ট্রাম-বাস মোটর-লরীর মসৃণ গতি তার অচঞ্চল রক্তস্রোত। সহস্র পরিবারের মানসিক রুগ্নতা এ দৃশ্য কখনো ছুঁয়ে যায় না। তাই দীপক আজকাল অনেক সময় রাস্তায়ই ঘুরে বেড়ায়। পচা পুকুরে ডুবে থেকে পচে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। এর আধুনিক সংজ্ঞা হয়ত পলায়নবাদ। বাঁচতে হলে যদি পালাতে হয় তাহলে সে সেই বিখ্যাত সংস্কৃত উপদেশের অনুসরণই করছে হয়ত। দীপক বাঁচতে চায়।

ড্রাইভারকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দীপক তার পড়ার ঘরে এসে ঢুকল। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। অনেকক্ষণ বসে থেকেই হয়ত ঘাড়টা কাঁপছিল তাঁর—দীপক সসম্ভ্রমে তার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু

বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্যকে বিন্দুমাত্র সম্ভ্রম না দেখিয়ে ভদ্রলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন : "আপনিই হয়ত দীপকবাবু—অসিতের বন্ধু ?"

দীপক অবাক হল। পাশেই একটা চেয়ারে বসে বল্‌লে : "কেন, বলুনত ?"

ভদ্রলোকও আবার বসে পড়লেন : "আমার নাম রমেশ তালুকদার। অসিতদের কোম্পানীর ওয়ার্কিং ডিরেক্টর। অসিত অনেকদিন কারখানায় যাচ্ছে না—বাড়ি থেকেও ওর কোনো খবর বলতে পারলে না। আপনি ওর বন্ধু—কারখানায়ও অনেকদিন গিয়েছেন শুনলুম—খোঁজ করে শেষটায় আপনার কাছেই এলুম।"

"ওর বাড়িও যখন ওর খবর রাখে না আপনার সে খবরের কি দরকার ?"

"বুঝতে পারলেন না—বিস্তর অসুবিধে হচ্ছে কাজ কর্ম্মের। কোথায় সে গেল—কবে আসবে জানতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত !" দরদে ভিজে উঠলেন রমেশবাবু।

"কিন্তু আমিও ত সে-খবর জানিনে !"

"আপনিও জানেন না !" হতাশের চেয়ে বিস্মিতই বেশি হলেন রমেশবাবু।

"কি করে জানতে পারি বলুন !"

"তা নয়। ভেবেছিলুম খবর রাখেন। অসিত না থাকলে কারখানা চলাই মুস্কিল কি না। ধরুন আমি বুড়ো মানুষ, মেডিক্যাল লাইনে সরকার-পোষা লোক ছিলুম—কারখানার আমি জানিই বা কি—সঙ্গে থেকে অসিতকে একটু হেল্‌প করা! জ্ঞান বিদ্যায় আমরা হচ্ছি সেকেলে মানুষ, আপনাদের কাছে এগুতে পারি সাধ্য কি ?"

"অসিত না থাকায় আপনার তাহলে অসুবিধে হচ্ছে !"

"অসুবিধে! প্রায় অচল অবস্থা!"

"আপনাদের জানিয়ে ওর যাওয়া উচিত ছিল।"

"দেখুনত! রাগ করেন আর যা-ই করেন দীপকবাবু, আমি বল্‌বই আপনারা মানে আজকালকার যুবকসম্প্রদায় একটু খেয়ালী! জানেন শুনেন আপনারা ঢের কিন্তু কোনো কাজে টেনাসিটি নেই!"

"না এত' রাগ করবার কথা নয়, সত্যি কথা।"

"ঐ টুকুতেই আমার আপত্তি। নইলে ত আপনারা সোনার টুকরো সব ছেলে!, এতক্ষণ আপনার বই এর আলমারীগুলো দেখছিলুম আর অবাক হচ্ছিলুম! পড়াশুনোয় আপনার আগ্রহ দেখে অবাক হতে হয়।"

দীপক একটু অস্বস্তি নিয়েই বইএর আলমারিগুলোতে চোখ বুলিয়ে আন্‌লে। লিখবার টেবিলের উপরই অসিতের টেলিগ্রামটা পড়ে আছে। একটু ফ্যাকাসে হয়ে উঠল দীপক। রমেশবাবুর দিকে মূঢ়ের মতো তাকাল সে।

"এঞ্জিনিয়ারিং লাইনে অসিতেরও অসম্ভব পড়াশুনো! আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুসী হলুম দীপকবাবু—যাবেন মাঝে মাঝে কারখানায়।" রমেশবাবু উঠে পড়লেন।

দীপক সামান্য একটু ঘাড় নাড়তে চেষ্টা করল।

"ফিজিওলজি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করা যাবে—আপনার সঙ্গে। ওখানে ফিজিওলজির কয়েকটা বই দেখা গেল!" রমেশবাবু হাস্‌লেন।

হাসিটা বিদ্রূপের মত ঠেকল দীপকের চোখে।

"আচ্ছা—আসি আজ—আপনাকে বিরক্ত করে গেলুম।" হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে রমেশবাবু প্রায় যুবকের ভঙ্গীতেই হেঁটে চলে গেলেন।

দীপক উঠে গিয়ে টেলিগ্রামটা হাতে তুলে নিলে। খাম থেকে

কাগজটা টেনে বার করে আবার তা খামে ভরে রাখলে। অসিতের দুর্ভাগ্যে বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌তে হল তাকে। নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক—অত্যন্ত ভুল পেশা গ্রহণ করেছিলেন। ডিটেক্‌টিভের কাজে প্রচুর উন্নতি করতে পারতেন তিনি, বুড়ো বয়েসে লোহার কারখানায় এসে আর সর্দ্দারি করতে হত না।

ভদ্রলোক যা জেনে নিয়ে গেলেন অসিত এসে শুন্‌লে খুবই দুঃখিত হবে। অসিতের দুঃখটাকে মনে-মনে গ্রহণ করে নিল দীপক। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। তারপরই মনে হল তার, দুঃখিত হবার অধিকার অসিতের নেই। আজ হোক, কাল হোক সবাই এ খবর জান্‌বে—চিরদিন নেলীকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না অসিত। এটা তার ভালো করেই বোঝা উচিত। সব কিছুই গোপন করে রাখবার একটা হাস্যকর দুর্ব্বলতা দেখা যায় অসিতের মনে। এ দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। দীপক নিজের বেলায় এমন কোনো দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেয়নি। তার সমস্ত অপরাধের খবর মা যথাসময়ে পেয়েছেন। হয়ত তাই মা আজ বেঁচে থেকেও তার কাছে বেঁচে নেই। অসিত কাউকে ছাড়তে চায়না—নূতন-পুরোণ মিলিয়ে ক্রমেই তার বৃত্তটাকে বড় করে তুল্‌ছে। তাই তার দ্বন্দ্বের শেষ নেই—ট্র্যাজেডি আর কোনোদিন ফুরোবে না।

ট্র্যাজেডি কি কোনোদিনই ফুরোয়? দীপকেরই কি তা ফুরিয়েছে? তার বৃত্তে সংঘর্ষ তুলবার কোন মানুষই ত নেই—নিজেকে নিয়েই আছে সে। ফাঁকা মাঠের মত চারদিক। কার্য্য ঘটাবার মতো কোনো কারণই উপস্থিত নেই। ট্র্যাজেডির হাত থেকে কি তবু সে মুক্ত হতে পেরেছে! সে বই পড়ে, লেখে, খায়, বেড়ায়, ঘুমোয়; কিন্তু এই কি জীবন? এই বর্ণহীনতায় কি কোনো ট্র্যাজেডি নেই? রক্ত-বজ্রের জাঁকাল ট্র্যাজেডির সুর নাই বা থাক্‌ল, বর্ণহীনতার ফল্গুতে ব্যথার নিঃশব্দ সুর ত শোনা যেতে

পারে কখনো। সে সুরকে জয় করে দীপক স্বস্তির জন্তে চারদিক হাতড়ায়। চোখকে, মনকে চালিয়ে নেয় চারদিকে। কোথায় আছে নিষ্কৃতি? হয়ত আছে—তাকে খুঁজে বার করতে চায় দীপক। পারে না।

অসিতের ট্র্যাজেডির চেয়ে দীপকের ট্র্যাজেডি কম?

আঠারো

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েই সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে অসিত দীপককে বললে : "কি এমন জরুরী কথা আছে, বল।"

"এই জরুরী কথা শুন্‌বার তাগিদে মেমসাহেবকে একা রেখে বেরিয়ে এলি?" দীপক শুকনো ঠোঁটে হাসে।

"একা থাক্‌লেও পালাবে না।"

"বলা যায় না—সাহস করে একবার পালাতে পারলে দ্বিতীয়বার আর সাহসেরও দরকার হয় না।"

"বসে বসে সেই পরামর্শই দিচ্ছিলি নাকি?"

"বিবাহিতাদের উপর লোভ আমার নেই। মানে লোভ করেও লাভ নেই। কারণ নিজের চেহারা সম্পর্কে আমি মোহমুক্ত।"

"চেহারাই কি সব? এখানো আমাদের সমাজে ওথেলো বাতিল হয়ে যায়নি।"

"This is the cause"-ও তাই বেঁচে আছে। খুনোখুনি হয় না, চুলোচুলি হয়। সন্দেহ-বাতিকে ওথোলো বেচারীরা অনেক সময় সারা-জীবনই পাগ্‌লামি করে যায়।"

"চুলোয় যাক্‌ ওথেলো। জরুরী কথাটা বল এবার।"

"তোদের রমেশবাবু কাল তোর খোঁজে হঠাৎ আমার বাড়ি গিয়ে হাজির। আমি এসেছিলুম এই ফ্ল্যাট ভাড়া করতে। তোর টেলিগ্রামটা টেবিলে পড়েছিল বাড়িতে। মনে হল, টেলিগ্রাম থেকে তোর আর নেলীর খবরটা ভদ্রলোক জেনে নিয়েছেন।"

ওরা ফুটপাথে এসে দাঁড়াল। অসিত বারকয়েক ঠোঁট কাম্‌ড়ে নিয়ে বললে: "ও সুযোগ হারাবার পাত্র বুড়ো নয়।"

"বুড়ো বয়েসে এত ছটফট করে যারা তারা কোনো সুযোগই হারায় না।"

"তাহলে আমাকে অপিসেই যেতে হয় একবার। এখন আর মার্কেটিং এ যাচ্ছিনে।"

"শুধু অপিসে কেন, বাড়িতেও। বাড়ি ত আর ছাড়ছিসনে তুই। কাজেই ওখানকার সিচুয়েশনটাও দেখা দরকার।"

"Then goodbye friend—দেখা হবে আবার।" ফিরিঙ্গি-ভঙ্গীতে হাত নাড়ল অসিত।

"রবিঠাকুরের এত সুন্দর বাংলা থাক্‌তে ওই ইংরিজি কেন বাপু—বল—হে বন্ধু বিদায়!"

"হিঁহিঁ-হিঁ-হিঁ!" অসিত হাস্‌তে হাস্‌তে একটা ট্যাক্সি লক্ষ্য করে হাত তুলল।

বিপরীত দিকে হাঁটতে সুরু করলে দীপক। মনটা তার খুবই হাল্কা হয়ে গেছে। খবরটা অসিতকে বিচলিত করেনি। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে ওর! শুধু বিলেত দেশটাই মূককে বাচাল করে না, বিলিতি মেয়েদেরও এ ব্যাপারে দেখা গেল অদ্ভুত হাতযশ।

রমেশবাবু এমন একটা অনার্য্য সময়ে অসিতকে আশা করেন নি। দেড়টার সময় অসিত আসে কি করে? যদি এলোই সে, এক ঘণ্টা আগে আসতে কি হয়েছিল তার! অবনীবাবু তখন অফিসে ছিলেন—তিন বছর পর এই প্রথম এসেছিলেন তিনি। যা দুর্ঘটনা হবার তাঁর সামনেই হয়ে যেতো—এখন একা রমেশবাবু অসিতকে সামলাবেন কি করে?

অসিতের টেবিলে বসেই ঘাড় গুঁজে রমেশবাবু চিঠি ড্রাফট করছিলেন।

অসিতকে আসতে দেখেই কাজে তাঁকে এতটা মনোযোগ দিতে হয়েছে। মনে মনে ভাবছিলেন তিনি আজই অবনীবাবু তাঁকে এ চেয়ারে বসিয়ে না দিয়ে গেলেও পারতেন।

একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে যখন অসিত, তখন রমেশবাবু হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে প্রায় নাটকীয় ব্যস্ততায় বললেন: "অসিত! এসেছ বাবা! বাঁচালে!" কিন্তু বাঁচাবার সুযোগ দিতে তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। চেয়ারটা ছেড়ে যাবার কোনো মতিগতি দেখালেন না রমেশবাবু।

"আমি আসব না ভেবেছিলেন নাকি?" অত্যন্ত শক্ত গলায় বললে অসিত।

"সে কি কথা? তুমি নেই আর যত বিশৃঙ্খলা কারখানার! মূলার কোম্পানীর অর্ডারটা কিছুতেই এগোচ্ছে না। এত ধরেপড়ে অর্ডার আনা গেল—একটা কেলেঙ্কারীই হবে দেখছি!"

"অর্ডার এনেছেন—সাপ্লাই করুন!'

"তোমার বাবারও ওই এক কথা। আমি সাপ্লাই করব কি হে—আমি এর মাথামুণ্ডু কিছু জানি না বুঝি? সেজে আছে সব তোমার জন্যে। কারখানা ঘুরে ঘুরে করতে হবে তোমাকেই সব।"

"আপনাদের ওয়ার্ক-ম্যানেজারই ত আছে—আমি কারখানায় ঘুরতে যাব কেন?"

"তাকে ত জবাব দিয়েছেন তোমার বাবা।"

"কেন?" কুঁচকে চোখ ছোট করে আনল অসিত।

"বললেন তুমিই এখন দেখবে সব। ওই ত তোমার টেবিল চেয়ার তিনি আনিয়ে দিয়ে গেছেন আজ এখানে।"

"কত মাইনে দেবেন আমায়?"

"ওই ত তুমি রাগ করলে অসিত! আমি বুড়োমানুষ—ডাক্তার মানুষ—কারখানার কি বুঝি—করতে হবে সবই তোমার!"

"আর আপনি গিয়ে বাবাকে তার রিপোর্ট দেবেন!"

"ছিঃ" জিভ কাটলেন রমেশবাবু: "তোমার কাজে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা খুঁত ধরতে পারবে না—আর আমি করব রিপোর্ট!"

"আজেবাজে কথা বলবেন না—" অসিত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সমস্ত শরীরটায় জ্বালার মতো একটা উত্তাপ অনুভব করছিল সে।

অবনীবাবু ইজিচেয়ারটায় শুয়ে চোখ বুঁজে ছিলেন। চোখ বুঁজে বিস্মৃতি থেকে অনেক কিছু তুলে আনা যায় আবার ডুবিয়েও দেওয়া যায় বিস্মৃতিতে অনেক কিছু।

অসিত একটু আওয়াজ করেই ঘরে ঢুকল।

চমকে উঠলেন না অবনীবাবু। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। অসিতকে দেখেও মুখের কোনো বিশেষ রেখা কোনো বিশেষ ভঙ্গী নিয়ে ফুটে উঠল না।

অসিত গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে: "জামশেদপুর গিয়েছিলুম।" তবু প্রথম মিথ্যা বলতে যতটুকু দুর্ব্বলতা থাকে গলায়, অসিত তা গোপন করতে পারল না।

অবনীবাবুর দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইল অসিত। কি যে উত্তর আসে তারই একটা অসহ্য প্রতীক্ষা ছিল অসিতের দৃষ্টিতে। জলের শান্ত সমতলে যেন একটু হাওয়া লাগল—অবনীবাবুর ঠোঁটে কয়েকটা রেখার আভাস যেন দেখা যায়। ভারি, স্বাভাবিক গলায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "চাকুরী হল ওখানে?" শুধু জিজ্ঞাসাই মাত্র, তার উত্তর তিনি চান না।

অসিতও এ-জিজ্ঞাসার উত্তর দিল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

অসিতকে দেখে মনোরমাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সবচেয়ে বেশি। সুনন্দা ব্যস্ততর হতে পারত—কিন্তু সে এখন হাসপাতালে, রোগা শরীর থেকে একটি সুস্থ, বাঁচবার প্রয়াস-শীল মেয়ে জন্ম দিয়েছে। ওজনে শিশুটির শরীরের মাংসের মতই খানিকটা মাংস যেন তার হাত, পা, মুখ থেকে সরে গেছে। সুনন্দাকে দেখলে কৌতূহল হয়, দুঃখ হয় না। কি করে যে ও বেঁচে আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবেও! এ অবস্থায় সুনন্দা বাড়ি থাকলেও অবিশ্যি অসিতকে দেখে তার কৌতূহল হত না।

অসিত সোজা তার ঘরে গিয়ে ঢুকল—যেটা একসময় অলকার ঘর ছিল। মনোরমা পেছন পেছন গেলেন। অসিতের চোখমুখের অবস্থায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন মনোরমা।

ঘরে ঢুকে আঁচল দিয়ে নিজের চোখ না মুছে থাকতে পারলেন না মনোরমা। এ দৃশ্য অসিত জীবনে খুব বেশি দেখেনি। সুপ্রিয়ার বৈধব্যের সময় মাত্র দেখা গিয়েছিল। তবু এতে অসিতের নিজকে খুবই অভ্যস্ত মনে হল।

"আমায় কি তোরা বাঁচতে দিবিনে, অসিত?" মনোরমা কাঁদলেন না—কিন্তু খুব করুণ শোনাল কথাটা।

"কি হল তোমাদের?" অসিত সংসারের কোনো ব্যতিক্রমই যেন খুঁজে পায় না।

"বৌমা আসবে না, পড়বে—"

"বেশত। পড়ুক না। ওর স্বাধীনতায় হাত দিয়ে লাভ কি?"

"তুই বাড়ি আসবি না—না বলে কয়ে চলে যাবি কোথায়—পূজোআচ্চা

নিয়ে যেতে উঠেছে বড়খুকী—ছোট-টা হাসপাতালে এখন তখন, আমি বাঁচব কি নিয়ে বল্‌তে পারিস ?"

"কাজ থাকলে বাইরে যেতে হয়। আর তাছাড়া বা কি ? চব্বিশঘণ্টা আমায় বাড়ি বসে থাক্‌তে হবে ?"

"কাজ কি তোর আগে ছিলনা, বাবা ?"

"অপিসের কাজ ছাড়া-ও ত অন্য কাজ থাক্‌তে পারে ! বন্ধুবান্ধবরা আছেন—"

"কোন বন্ধুর সঙ্গে ত একবার এক কীর্ত্তি করে এলি !" মনোরমা ব্যথিত হয়েই বল্‌লেন।

"হেঁ—তারপরইত তোমরা যত কুকীর্ত্তি করতে সুরু করেছ !"

"উনি কত দুঃখিত হয়েছিলেন তা ত তুই বুঝতে পারসি, অসিত।"

"ওঁর জীবনে যা নেই তা যে পৃথিবীতে কোথাও নেই এমন ত হতে পারে না !"

"কিন্তু উনি সম্মানী লোক !"

"আমার ব্যবহারে ওঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হবেনা তেমন একটা কলের পুতুল হয়ে থাক্‌তে আমি ত রাজী নাও হতে পারি !"

"তাতে তোর অনিষ্ট হবে না।"

"আমার ইষ্ট-অনিষ্ট ভাববার বয়েস কি আমার নিজের হয়নি ?"

"আমরা ত তোর মা-বাপ ! আমাদের কাছে তোর বয়েস দেখিয়ে কি হবে ? বয়েস হয়ে গেছে বলেই কি তোর জন্যে চিন্তা করা আমাদের ফুরিয়ে গেল ?"

"একসময়ে তা ফুরোনো উচিত্।"

মনে হল মনোরমা আহত হয়েছেন। মা-রাও মানুষ, মাতৃস্নেহের একটা সীমাহীন ব্যাপ্তি নেই।

"নেলী মেয়েটি কে?" মনোরমা যে অনেকক্ষণ ধরে কথাটা বল্‌বার সুযোগ খুঁজছিলেন তা নয়। হয়ত জিজ্ঞাসা করাই হতনা প্রশ্নটা। কিন্তু এখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"নেলী?" চমকে উঠ্‌তে চেয়ে নিজকে আবার সামলে নিলে অসিত।

"উনি বলছিলেন, তোর সঙ্গে দেখা হলে মেয়েটীর খবর জেনে নিতে।"

"আমার পেছনে কজন পুলিস-স্পাই রেখেছেন উনি?" অসিতের মুখ শক্ত হয়ে আসে।

এর পর মনোরমা আর কিছু বল্‌তে পারেন না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তাঁর মনে হয় যেন কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে এলেন।

অসিত পোষাক ছাড়তে সুরু করে। ঘরের কোনো পরিবর্ত্তনই হয়নি। তবু অসিতের মনে হয় আলনাটা যেন ঠিক জায়গায় নেই। বেড-কভারটা কি তার এই রঙেরই ছিল? দুটো চেয়ার দেখা যাচ্ছে। অলকা চলে যাবার পর দুটো চেয়ার আর যেন ছিলনা। অলকা চলে গেল! অসিত অবিশ্যি জানত সে থাক্‌তে পারে না। মুখে তার মদের গন্ধ পেয়েছে অলকা অনেকদিন—তা বিশেষ কারণ নয়, হয়ত কারণই নয়। মেয়েরা মাতালকে ভয় করে, মাতাল স্বামীকে ভয় করে না। স্বামীর মাতলামিকে তারা ঘৃণাও করেনা হয়ত, যদি স্বামীকে পাওয়া যায়। অসিতকে হারিয়ে ফেলছিল অলকা। অসিত সরে যাচ্ছিল দূরে। ইচ্ছে করে যে সে সরে যাচ্ছিল তা নয়, অসিতের সমস্ত শরীর ফিরিয়ে দিচ্ছিল অলকাকে। নেলীকে ত ফিরায়না তার শরীর। নেলীর শরীরের স্পর্শও একই রকম—একই রকম মৃদুতা আর উত্তাপ। তবু নেলী ফুরিয়া যায় না—মনে হয় আরো অনেক রহস্য, অদ্ভুত অনেক অনুভূতি নেলীর শরীরে লুকিয়ে আছে। বিচিত্র নয় অলকা—ওর মনে যৌনতা

আদিম বৃত্তির সীমা পার হয়ে আসেনি। যৌনতা ব্যবহারের সামগ্রী হয়ে উঠেছে নেলীর কাছে। অসিতের অস্পষ্ট ইচ্ছা ব্যগ্র হাতে র স্পষ্টতার সন্ধান করছিল—নেলী হয়ত তাকে তা এনে দিয়েছে। মলকার রবিঠাকুর-পড়া শালীন, স্তিমিত মন তা কোনোদিনই দিতে পারবে না।

আরো অনেক নূতন ধারায় জীবনকে দেখতে পাচ্ছে অসিত। হয়ত তাও নেলীরই জন্যে। মুকুলের সঙ্গে আগেও নেলীকে দেখেছে অসিত—দীপ্তি যে তার ছিলনা তা নয়—দীপ্তি না থাকলে অসিতের চোখকে নেলী আকর্ষণ করত না। কিন্তু এখনকার অপরূপ উজ্জ্বলতার কাছে সে দীপ্তি খুবই ম্লান মনে হয়। অদ্ভুত আভায় ঝলমল করছে নেলীর চোখ, বরফের মত ভয়ঙ্কর সাদা মুখটা তার এখন গোলাপী মদের মতো চিকিয়ে ওঠে। এবং মুক্তির উল্লাসের। দীপকের মুক্তি-তত্ত্বের চাক্ষুষ উদাহরণ তার সামনে। বরাকরের পীচ্-ঢালা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে পিছল জ্যোৎস্না—দুর্দান্ত হাওয়া—সব, সবকেই ছাপিয়ে উঠেছিল নেলীর উজ্জ্বলতা—উচ্ছলতা। ক'টা মুহূর্ত মানুষের জীবন পৃথিবীকে পেছনে ফেলে আসবার আনন্দ নিয়ে বাঁচতে পারে? সাত-সাতটা দিনরাত সে-জীবন নিয়ে নেলীর সঙ্গে অসিত বেঁচে এসেছে।

শুধু তোমাকে নিয়ে তুমি যদি জীবনের পরিকল্পনা কর—পাশে আছে নেলীর মতো একটি মেয়ে—সভ্যতার সজীব একটি মেয়ে—অগাধ সে-জীবনের গভীরতা। সেই জীবন নিয়ে এই বিশ্রী পৃথিবীতেও বেঁচে যেতে পারো তুমি। বাঁচবার জন্যে না কি যুদ্ধ করতে হয় প্রাণীদের। কি দরকার সেই যুদ্ধের! যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় পেছনে ফেলে রেখে তাদের তুমি এগিয়ে যাও। ওদের চীৎকার যেন শুনতে না পাও—ততদূরে তোমাকে যেতে হ'বে! তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে

জয়ী হওয়ার চেয়ে এ-পথই ত অনেক সহজ! অনেক সহজ নিজকে তুলে নিয়ে যাওয়া। শান্তির জন্যেইত যুদ্ধ—কিন্তু যুদ্ধে শান্তি কই!

বাথ্-টাবে বসে অসিত 'শাউয়ার'-টা ছেড়ে দেয়। গা থেকে জলের সরু সরু স্রোতে বরাকরের ধূলো-বালি গলে গলে পড়ে যায়—কিন্তু ধুয়ে যায় না বরাকর, কোনো এক ভারতীয় নদী যেখানে গাঢ় বাহু-বন্ধনে জড়িয়ে ধরেছে শ্বেতশুভ্র গ্র্যানাইটের তটভূমি

উনিশ

প্রকাণ্ড টেবিলটাকে একেকসময় দুহাতে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হয় রমেশবাবুর। দু'টো হাত অনেক সময় ছড়িয়েও দেন টেবিলের পুরু কাচের উপর। কাচের ঠাণ্ডা মসৃণতা সমস্ত শরীরে তাঁর শিরশির করে ওঠে। এ অনুভবে সমস্ত কারখানাটা হাতের মুঠোর মধ্যে পাবার একটা অসহ্য আনন্দ আছে। আনন্দটা ক্রমেই উষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে তাঁর শিরায়। ক্ষিপ্রহাতে পরের মুহূর্তেই তিনি ড্রয়ার টেনে ফাইল আর চিঠিপত্র বার করে নেন। মুলার কোম্পানীর অর্ডারটাতে একটু বিশৃঙ্খলা হল। কিছু কিছু সেম্পল্ মঞ্জুর হয়ে এসেছে—আর আর সেম্পল্গুলো কিছুতেই হয়ে উঠছেনা। সব বুঝতে পারেন না রমেশবাবু কিন্তু ওয়ার্ক ম্যানেজারকে জবাব দেবার পরই কারখানার আবহাওয়াটা যেন আর তেমন মসৃণ নেই। অসিত যখন কারখানায় আস্ছেই না— কি দরকার ছিল লোকটাকে জবাব দেবার? এখন ম্যানেজারের উপলক্ষে যদি একটা ষ্ট্রাইক-ফ্রাইক হয়ে বসে, তিনি তা সামলাবেন কি করে? অবিশ্যি কারিকরদের পিঠে তিনি হাত বুলিয়ে গদগদ কথা সব বল্তে সুরু করেছেন—কাজ আদায় করবার এই একটা পুরোণ পথই তাঁর জানা আছে। তার বেশি তিনি কি করতে পারেন? মনে হয় এতেই ফল ফল্বে। কাজ একরকম ভালোই চলেছে এ দু'দিন। কোম্পানীর সাহেব অবিশ্যি চিঠি দিয়েছেন কোটেশনটা রি-কন্সিডার করতে! তাই রমেশবাবু নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিলেন না—কেউ আবার উপরে পড়ে কোটেশন দিয়ে বস্ল না কি? ক্যালকাটা ষ্টীলকে বিশ্বাস করা

যায় না। কিন্তু কি করে এর চেয়ে কম কোটেশন ওরা দিতে পারে? অর্ডারটা ধরবার জন্যে অনেক হিসেব নিকেশ করে, ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিটে কোটেশন ছাড়া হয়েছিল—অবনীবাবু অবিশ্যি সমস্তই দেখেশুনে দিয়েছেন—তার উপর ত আর কথা চলে না। দুদিনের ভুঁইফোড় কোম্পানী 'ক্যালকাটা ষ্টীল' বল্লেই ত হবেনা এর চেয়ে কম দামে কাজটা নামিয়ে দেবে!

একটা দিক প্রায় গুছিয়ে এনেছিলেন রমেশবাবু—অসিত আর অফিসে আসছেনা। অবনীবাবুকে এখন তাঁর উপরই নির্ভর করতে হবে! কিন্তু অবনীবাবু বরাবরই বুঝে আসছেন তাঁর উপর নির্ভর করেই রমেশবাবুকে চলতে হয়। বুঝে আসছেন কি আর নিজে থেকে? রমেশবাবুই তাঁকে তেমন বুঝিয়ে আসছেন। রমেশবাবু ভেবে একেক সময় অবাক হয়ে যান, অবনীবাবুর মতো অত্যন্ত সাধারণ মাথা এত বড় কারখানাটা গড়ে তুলল কি করে! ব্যবসা জিনিষটাতে হয়ত বুদ্ধির খুব বেশি দরকার নেই। বেশি যুক্তি, তর্ক, বিবেচনা দেখাতে গেলে ব্যবসাতে বড় হওয়া মুস্কিল।

অবনীবাবুকে মনে মনে উড়িয়ে দিতে চাইলেও রোজই তাঁর কাছে গিয়ে বসতে হয় রমেশবাবুর। বসতে হয় বুদ্ধের পাশে ভিক্ষু আনন্দের মতই।

"কারখানার বড় খারাপ দিন দেখতে পাচ্ছি রমেশবাবু—" দুশ্চিন্তায় অবনীবাবু যেন রোগা হতে সুরু করেছেন—রোগা মানুষের ভীরুতা শোনা যাচ্ছিল তার গলায়।

"না, তেমন আর বিশেষ কি? অসিত যেতে সুরু করলে সব গোলই মিটে যেত কারখানার।"

"অসিত যাচ্ছেনা, না?"

"না—" পরম সঙ্কোচে যেন নিবেদন করলেন রমেশবাবু।

আগেকার মত আর সহজ ধ্যানে ডুবে রইলেন না অবনীবাবু—মনে হল অনেক পরিশ্রম করে তবে তাঁকে চুপ করে থাকতে হচ্ছে। রমেশবাবু খুসী হলেন। কিন্তু দুঃখিত হয়ে বসে থাকা ছাড়া তাঁর উপায় নেই।

অনেকক্ষণ—যতক্ষণ একজন অসামাজিক মানুষ চুপ করে থাকতে পারে তার চেয়েও বেশিক্ষণ পরে অবনীবাবুর আর্ত্তকণ্ঠ আবার শোনা গেল : "ডিভিডেণ্ড দূরের কথা—ডিবেঞ্চারের সুদই চলবেনা এবার!"

"না তর্তটা ভেবে আপনি ব্যাকুল হয়ে উঠবেন না দুর্বৎসর গেল বলে কি সুদও চলবে না? তাছাড়া কিউমেলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার আছে যাঁদের—তাঁরাত আগামী বছরই এ বছরের ডিভিডেণ্ড শুদ্ধ ডিভিডেণ্ড পেয়ে যাবেন।"

"আগামী বছর কি হবে এখানে বসে আমরা বলতে পারিনে!" অবনীবাবু আগেকার মেজাজে আবার ফিরে যেতে চাইলেন।

"চারদিকটা বুঝে-টুঝে নিতে এ-বছরটা যাবে—আগামী বছরে আর—"

"চোখ মেলে কিছুই দেখতে চাননা আপনারা! চোখের উপর রাইভ্যাল কন্‌সার্ন দাঁড়িয়ে গেল—আপনি ভাবছেন আগামী বছর 'ক্যালকাটা ষ্টীল' লিকুইডেশনে গিয়ে আপনাদের পথ নিষ্কণ্টক করে দেবে?"

"আমাদের পুরোণ পার্টিরা ত কেউ কেউ আছেন!"

"অনেকেই নেই। বেশি বেতন দিতে হলে পুরোণ চাকরকেও কেউ রাখেন না!"

"এস্‌টাব্লিশমেণ্ট কমিয়ে দিয়ে আমরাও ক্রমে কম্পিটিশনে গিয়ে দাঁড়াব।"

"কোম্পানী তাতে বাঁচতে পারে—কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়াবে তা কোম্পানীর পক্ষে গৌরবের নয়। ওটাকে প্রোগ্রেস্ বলেনা !"

এ-সব কথায় কিছুটা কাবু হয়ে পড়েন রমেশবাবু। বৈষয়িক বুদ্ধি দিয়ে যেন এরকম জটিল বিষয়কে ধরতে পারেন না। তাছাড়া তাঁর মনে হয়, অবনীবাবু অসিতের ব্যাপারটায় কাতর হয়ে পড়েছেন বলেই এসব হেঁয়ালী তৈরী করে চলেছেন। অবনীবাবু কাতর হয়ে পড়েছেন এটুকুতেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তিনি। অবনীবাবু তাঁর কাছ থেকে পাল্টা কোনো কথাও যেন প্রত্যাশা করেন না। উঠে বারান্দায় গিয়ে তিনি অজিতকে ডাকেন। তারপর ফিরে এসে বাক্স থেকে একটা সিগার তুলে নেন।

খুব দ্বিধা নিয়েই রমেশবাবু বলতে সুরু করেন: "অজিত যদি কারখানা দেখা শোনায় এখন থেকেই একটু মন দেয়—"

এবার আর রমেশবাবু লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি—অবনীবাবুর পাথুরে মুখে হাসির কয়েকটা রেখা যেন ফুটে উঠতে চায়।

অজিত আসে। বাধ্য ছেলের মতই অনেকটা তার ভঙ্গী।

"কাল থেকে তুমি কারখানায় যাবে।" অবনীবাবু আদেশটাকে নিরেট করে তোলেন যাতে তার ভেতর প্রতিবাদের কোনো সূত্র না থাকে।

"কারখানায় যাব !" প্রশ্ন নয়, প্রতিধ্বনির মতই শোনায় অজিতের কথা।

"রমেশবাবুর কাছ থেকে বুঝে-টুঝে নিতে চেষ্টা করবে—"

অবনীবাবুর মুখ থেকেই বাকি কথাটুকু যেন রমেশবাবু লুফে নেন: "তোমাদের মত ছেলেদের এনার্জ্জি ছাড়া কি কোম্পানী চলে—আমরা কতটুকু পারি—নড়াচড়া যে করতে পারি সে-ই ঢের !"

"আচ্ছা যাও—" রমেশবাবুকে নীরব করবার প্রয়োজন ছিল—তাছাড়া অজিতকেও দাঁড়িয়ে রেখে বাদানুবাদের সুযোগ দেওয়া যায় না তাই অবনীবাবু অজিতের সঙ্গে কাজ শেষ করে ফেলেন ও দুটো কথাতেই।

অজিত চলে আসে। খুব নিরুৎসাহ দেখায় না তাকে, খুব উৎসাহও নেই।

অসিতের ঘরে এসে উঁকি দেয় অজিত। অসিত ঘরে নেই। বাড়িতেই আসেনি হয়ত রাত্রিতে। আজকাল কখন যে অসিত বাড়ি থাকে তার ঠিক নেই। অজিত অবশ্য সে খোঁজ রাখেনা। খোঁজ রাখবার দরকারই বা কি? এমন কোনো জরুরী প্রয়োজন অসিতের সঙ্গে তার নেই যার জন্যে তার যাওয়া আসার খোঁজ রাখতে হবে। অজিতকে দিয়েও অসিতের প্রয়োজন নেই। অজিত চলে আসে। সুপ্রিয়ার ঘরে দরজা ভেজানো—ফাঁক দিয়ে ধূপের ধোঁয়া আসছে—ভেতরে ঘণ্টার আওয়াজ। ধূপের গন্ধটা এখন আর দুর্ব্বহ মনে হয়না অজিতের নিশ্বাসে। কিন্তু ঘণ্টা নাড়াটা এখনও তার স্নায়ুকে পোষ মানাতে পারেনি।

মনোরমার ঘরে কোলাহল—টুটুল-টুলু ছাড়াও কাঁচা মেয়েটা অনবরত ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে। অজিত ও ঘরেই ঢুকে পড়ে—অনেকটা যেন অনিচ্ছায়ই।

"কাল থেকে কারখানায় যাচ্ছি, মা!" অজিত টুটুলের হাত দুটো ধরে তাকে দোলাতে দোলাতে বলে।

"উনি বল্লেন?" কাঁচা মেয়েটার হাড় আর চামড়া থেকে মনোরমা তাঁর মনোযোগ তুলে আন্লেন।

"হুঁ। পড়া-টা হলনা আর কি!"

"কি হবে পড়ে—দাদা কি কম পড়েছিল, কি হল তাতে?" বিছানায় লেপটে থেকেও চিঁচিঁ করে সুনন্দা—পাখীর ছানার মত ওর কণ্ঠনালীটা ধুকপুক করছিল।

"অপিস ত দেখতে হবে একজনের—" মনোরমা একটা নিশ্বাস ফেলে একটু জিরিয়ে নেন: "পরের হাতে ত ওটা আর তুলে দেওয়া যায় না!"

"দাদা রাত্রিতে আসেননি, না?" কৌতূহল না নিয়েই জিজ্ঞাসা করে অজিত।

"না—" টুলুর হাত থেকে কাঁচা মেয়েটাকে রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মনোরমা। সুনন্দা আবার দম ফিরে পায়: "বৌদিকে আসতে লিখেছ ত মা অজিতের বিয়েতে—?" অজিত টুটুলের সঙ্গে কতক্ষণের জন্ম আলাপে ডুবে থাকতে চায়। মনোরমা নিরুৎসুক হয়ে বলেন: "চিঠি গেছে। বৌমা লিখেছেন তার বাবা নাকি শয্যাগত—সন্ন্যাসের মতো হয়েছিল—তাঁকে দেখবার শুনবার কেউ নেই—হয়ত আসা হয়ে উঠবে না!"

"আসছে মঙ্গলবার ত বিয়ে—এক'দিনেও অসুখ সারবেনা?" সুনন্দা হয়ত সোজা ভাবেই কথাগুলো বলতে চায় কিন্তু তার রোগা মুখে ভেংচি কাটার মতো কতগুলো বিশ্রী রেখা ফুটে ওঠে।

"বৌমা আসবেনা।" টুলুকে আড়কোলে নিয়ে ওর মাথায় হাত বুলোতে থাকেন মনোরমা।

"আমার শরীরটাও কি সারবে!" সুনন্দা করুণ হয়ে ওঠে।

টুটুলকে নিয়ে আবোলতাবোল বক্তে বক্তে অজিত ঘর থেকে চলে যায়।

"গীতাকে পছন্দ হয়েছে ত অজিতের?" সুনন্দার মন সাংসারিকতা ছেড়ে যায় না।

"না হলেও একদিন হয়ে যাবে।"

"লেখাপড়া জানা মেয়ে আবারো আনছ কিন্তু ঘরে!"

"ভালো পরিবারের মেয়ে—ওর মা যে কি ভালো মানুষ ছিলেন—তেমন গেছেনও ভালোয় ভালোয়!"

মনোরমা একটু উদাস হয়ে যান। সুনন্দা একটা তেতো ঢোঁক গিলে মনটাকে তেতো করে তোলে। বেঁচে থাকবার একটা দুর্দ্দান্ত আগ্রহ আছে সুনন্দার মনে। তার শরীর তাতে সায় দেয় না—বাইরের আবহাওয়াও যখন বিষণ্ণ হয়ে উঠতে থাকে সেই সঙ্গে, সুনন্দার শক্ত মন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। জীবনের দাম নেই—ভাবতে থাকে সুনন্দা। ভবিষ্যৎটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার মনে হয়। হয়ত সুপ্রিয়ার অন্ধকারের চেয়েও তার অন্ধকার ধারাল—জীবনকে তা শুধু থিতিয়েই দেবে না, ছিঁড়েফুঁড়ে যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলবে। তার চেয়ে হয়ত মৃত্যু ভালো—সত্যি, অনেক ভালো।

টুটুলকে বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে অজিত এসে তার ঘরে আশ্রয় নেয়। ওটাকে আশ্রয় নেওয়াই বলা যায়। বাড়ির আবহাওয়া থেকে নিজকে গুটিয়ে নিয়ে এ ঘরে সরে আসে সে। নিজের সঙ্গে মুখোমুখি বসতে চায়। পড়তে তার ভালো লাগছিলনা সত্যি—চোখের উপর মন্দারকে দেখে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাকে ভাবতে হচ্ছে অপরিচিত. থাকতে হচ্ছে নিরুৎসুক—সে-যন্ত্রণার তুলনা নেই। সহপাঠীদের কৌতূহল ফুরিয়ে গেছে—তবুত তাকে সবসময়ই আশঙ্কা নিয়ে থাকতে হয় কোথায়, কোন প্রসঙ্গে মন্দারের নামের সঙ্গে কুৎসিৎ ভাবে তার নামও জড়িয়ে তোলে তারা। য়ুনিভার্সিটিতে ক্লাশ করবার উদ্দীপনা একটুও আর মনে বেঁচে নেই অজিতের। সেখানে তার যাতায়াত যন্ত্রের মতই হয়ে উঠেছে। যন্ত্রের মতই অবিকার থাকতে হবে—মন্দারের

পড়াশুনোয় অতিমাত্রা আগ্রহ দেখে দুঃখিত হতে পারবে না অজিত, দুঃখিত হলেও চোখেমুখে তার দুঃখের ছায়া পড়তে পাবে না—এ আত্মনিগ্রহ চীৎকার করে কান্নার চেয়েও ভীষণ। কি দায় পড়েছে তার দিনের পর দিন বিষাক্ত আবহাওয়ার বিষ গায়ে মেখে নিয়ে আসার? আর অপমান? অপমানেরও ত আশঙ্কা কম নেই! দৈবাৎ মন্দারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে ওর দাম্ভিক মন নিশ্চয়ই ভেবে নেবে, সে ভুলতে পারেনি মন্দারকে। এ সুযোগ কেন দেবে সে ওকে? হ্যাংলাপনা করবার মত দুর্বুদ্ধি অজিতের নেই। না সে নয় মন্দারকে তা ভাবতে দেওয়া কেন? কেন নিজেকে সে অপমান করাবে একটি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ের হাতে? অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে ছাড়া কি এ-সম্বন্ধটাকে এত সাধারণ ভাবতে পারে কেউ? অজিতের প্রয়োজন কি এম্নি করে ফুরিয়ে যেতে পারে? অজিতকে পাওয়া হয়ে গিয়েছিল ওর, তাই হয়ত তার সম্বন্ধে কোনো উত্তেজনা, কোনো আবেগই ছিলনা আর মন্দারের।

অজিত চিন্তার গতিটা ফিরিয়ে নেয় -একটা জায়গায় ত সব মেয়েই এক। গীতাও কি কোনো মুহূর্ত্তে ঠিক তেম্নি আবেগই অজিতের মনে ঘনিয়ে তুলবেনা—ট্রেনের কামরায় মন্দার থেকে যেম্নি আবেগ সে অনুভব করেছিল? একই গঠন শরীরের, একই স্বাদ। এম-এ পড়ছেনা বলে গীতা তার দেহকে অন্যরকম করে তোলেনি—মন্দারের চেয়ে তার দেহের নিবিড়তা একতিলও কম হবে না। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ কি দেহের নয়? বায়োলজিতে খানিকক্ষণ ডুবে থাকে অজিত। গীতার চেহারাটা অনেক আকর্ষণ নিয়ে তার চোখের উপর ভেসে ওঠে। ওর স্নিগ্ধতা মন্দারের নেই—সৌন্দর্য্যের অনেকখানিই ত স্নিগ্ধতা। গীতাকে পেয়ে যে সে কাঞ্চনের বদলে কাচ পেল এমন ত কিছু নয়।

অজিত মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চল্‌ছিল। বাড়ির পারিপার্শ্বিক এখনো তার মনে বিবর্ণ হয়ে যায়নি—যত উজ্জ্বলই বাইরের রং হোক না। গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বার করতে গেল অজিত—টুলু-টুটুলকে নিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে আস্‌তে হবে।

কুড়ি

দীপক Hilaire Belloc এর 'The Crisis of our Civilization'— বইটা পড়ছিল। ভদ্রলোক নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে য়ুরোপের সভ্যতার সঙ্কট উপস্থিত; ধনতন্ত্র এবং তারই দোসর সমাজতন্ত্র য়ুরোপের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেনা।—আবার ক্যাথলিক কালচার ফিরে এলে, ফিরে এলে যীশুর বাণী, মানুষ বাঁচতে পারবে। মার্টিন লুথারেরই নয়, ডি-এইচ লরেন্সের যে তাড়া খেয়েছেন মধ্যযুগের যীশু তারপর তাঁর ফিরে আসা উচিত হবে কি না তিনিই জানেন। ফিরে কি আসে কিছু? মানুষ মরে ফুরিয়ে গেলে আর ফিরে আসবে? প্যাসিফিকের জল সরিয়ে দিয়ে চাঁদ ফিরে এসে বসতে পারে তার আগেকার জায়গায়— আবার কি প্রটোপ্ল্যাজমে ফিরে যেতে পারে মানুষ আর জীবজন্তু সেই প্রটোপ্ল্যাজমও কি আবার নিষ্প্রাণ জড়তায় ফিরে যাবে? মানুষের শরীরে অবিরতই হয়ত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে, ডারউইনের কল্পনা অলক্ষ্যে অদৃশ্যে কাজ করে যাচ্ছে—অসম্ভব নয় মানুষ একদিন নীৎশের মহামানবের স্তরে গিয়ে পৌঁছবে। ডারউইন আর কিছু না করুন যীশুর প্রয়োজন বাতিল করে দিয়ে গেছেন। মধ্যযুগে ফিরে যাবে না য়ুরোপ, যেতে চাওয়াটাই অবৈজ্ঞানিক। দীপকের মাথায় যেন 'টর্চ্চ' জলে উঠল। সুরু হল চিন্তার অভিযান।

মানুষ কি বৈজ্ঞানিক হতে পেরেছে? মনেপ্রাণে? বৈজ্ঞানিকরাও কি ঝুড়ি ঝুড়ি ধোঁয়াটে কল্পনা মগজে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন না? এখনো কেউ আমরা পুরোণ জীর্ণ বস্ত্রটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারিনি—

তাই ভাবি নূতন অবস্থায় ওটা কত সুন্দরই না ছিল—নূতন অবস্থাটা ভেবে সুখ পাই। সব মানুষই তা-ই। আমাদের দেশে যে Belloc নেই তা নয়। বরং এদের ভীড় ঠেলেই অনেক সময় আমাদের পথ করতে হয়। রামরাজত্বের স্বপ্নে এখনও ভারতীয় চোখ মাতাল। তপোবন-সভ্যতার স্মৃতিতে আমরা পাগল হয়ে যাই। এমন সভ্যতা-বিরোধী মন নিয়েই সভ্যতাকে যাচাই করতে এগিয়ে যাই আমরা আর মনকে খুশী করতে না পেরে বলে উঠি: 'সভ্যতার সঙ্কট!' সভ্যতা আঁকাবাঁকা পথ নেয় তার সঙ্কট উপস্থিত হয়না কোনো সময়। সভ্যতার অগ্রগতি প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক—সে গতি রোধ করবার শক্তি উপনিষদের নেই, যীশুর নেই, নেই নেপোলিয়ন, মেকিয়াভেলি, মেত্তারনিকের, নেই কাইজারের, হিটলারের।

মানুষকে নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে দীপকের—মানুষের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ঝক্-ঝক্ করে ওঠে তার কল্পনার চোখের উপর। সে মানুষের গায়ে অতীতের কুৎসিৎ রংগুলো নেই। ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে অতীতের কতগুলো দুর্ব্বহ বোঝা বয়ে বয়ে পিঠ কুঁজো হয়ে থাক্‌বে না কারু। মানুষ দৃঢ় ঋজুতায় দাঁড়াতে পারবে তার পরিপূর্ণ দৈর্ঘ্য নিয়ে সে-মানুষের কথা ভাবতে মনে নেশা লাগে দীপকের।

জীবন যে এখন বিষ তুলে দিচ্ছে মুখে তা থেকে উদ্ধার আছে কি আমাদের? কি করে বাঁচতে পারি আমরা—কি করে এগিয়ে যেতে পারি কোনো সুস্থ, নির্ম্মল জীবনের পরিবেশে? কখনো-না-কখনো সে-জীবনের মধ্যে ত গিয়ে পৌঁছুবে মানুষ—পৌঁছুবে আজকের মানুষেরই চেষ্টায়—সে চেষ্টার ক্রমিক বলিষ্ঠতায়। কিন্তু আজকের সে-মানুষ কারা? গান্ধীজির সেবাগ্রামের কেউ—অরবিন্দের কল্পিত অতিমানসিক মানুষ কি সম্ভব হবে কোনদিন? জওহরলাল-সুভাষ-আব্দুলগফুরখাঁ

রাজাগোপাল—এঁরা কি ভারতবর্ষের কোনো ভবিষ্যতের পথ দেখতে পাচ্ছেন? এঁদের রাজনীতির সফলতায় সুস্থভাবে বাঁচতে পারবে ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি লোক? বাঁচতে পারে পথের অন্ধ, আতুর, কুষ্ঠ রোগীরা? বাঁচতে পারবে উপোসী চাষার দল, মাটির সেই নির্বোধ সন্তানেরা—মাটির বুক থেকে ছিনিয়ে আনা হচ্ছে যাদের দিনের পর দিন। বাঁচবে মাতাল মজুরের জীবন—বাঁচবে তারা স্বপ্ন নিয়ে, প্রেম নিয়ে, জীবন-বোধ নিয়ে?

দীপক চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে থাকে। মোটা মোটা শক্ত আঙুলগুলো তার চুলের অন্ধকারে অনবরত পথ করে নেয়। কিন্তু মাথার ভেতর মগজের স্নায়ুর শিকড়গুলো কোনো সমাধানের বোধকে যেন স্পর্শ করে যেতে পারে না। মাথায় মরুভূমির অনুর্বরতা। হয়ত তার মগজ কোনোদিন খুঁজে পাবেনা মানুষের ভবিষ্যৎ গতি-পথের উৎসকে। কোনো চিন্তা, কোনো দর্শন, কোনো বই তাকে আজ পর্য্যন্ত সাহায্য করতে পারেনি।

দীপক তার কল্পনার ব্যাপ্তি গুটিয়ে নিয়ে আসে প্রশ্নটাকে প্রত্যক্ষ করে তুলে ধরে চোখের সামনে। অবনীবাবু বা তাঁর চেয়ে বেশি সার্থক যাঁরা হয়েছেন, কতটুকু করবার সাধ্য আছে তাদের? দেশের মুখের রং, মানুষের মনের রং একদিন ধনতন্ত্রের দীপ্তিতে যেমন বদলে গিয়েছিল পৃথিবীতে—ততটুকু কি আর হয়ে উঠবে এখনকার সময়ে—ভারতবর্ষের নূতন মাটিতেও? ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের সুস্থ জন্ম হবেনা কোনোদিন—জ্বলে উঠবেনা তার যৌবনের মধ্যাহ্ন—আবির্ভূত হচ্ছে সে বার্দ্ধক্য নিয়ে। ধনতন্ত্রের ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে—এখানকার শৈশব তার তাই ফাঁকির খোলসেই জড়ানো। অসুস্থ ধনতন্ত্র ভারতবর্ষের অসুস্থ দেহে নূতন ব্যাধিরই জন্ম দিচ্ছে—রোগমুক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

জাতীয়তাকে অস্বীকার করেনা দীপক। আগামীর প্রথম পদক্ষেপই হয়ত ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতার পদক্ষেপ। সে স্বাধীনতা ক্ষমতা-প্রিয়তার জন্যে নয়, হিটলারের মুক্তির চীৎকার আমাদের কণ্ঠে থাকবেনা—সুস্থভাবে, সম্মানিতভাবে বাঁচবার জন্যে আমাদের স্বাধীনতা। জীবন যদি সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আস্‌ত—ধর্ম্ম, নীতি-দর্শনের কুসংস্কার—যদি মনুষ্যত্বের দাম দেবার সুযোগ থাক্‌ত আমাদের তাহলে জাতীয়তার জীর্ণবস্ত্রকে অনায়াসে ত্যাগ করে আন্তর্জাতিকতার সমুদ্র-স্নানে জীবনকে সুস্থতর করে নিতে একটুও বাধত না। কিন্তু কে জন্ম দেবে এ জাতীয়তার? দেশে দেশে এই মহাযজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক, পুরোহিত হয়েছে ধনতন্ত্র—কিন্তু আজ আর ধনতন্ত্রের আগুন জ্বালাবার ক্ষমতা নেই—ঘুচে গেছে তার ব্রাহ্মণত্ব। কারা পারে? কারা পারে সমিধ আর হবি যোগাড় করে আন্‌তে? পারে কি তারা—জীবন থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে যারা চিরদিন? আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি যারা কোনোদিন, শুন্‌তে পায়নি হৃদপিণ্ডের রক্তে বিচিত্র রাগিণী-জীবনের প্রতি তাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা—নবজাত দুর্দ্ধর্ষ আকাঙ্ক্ষা হয়ত পারে জীবনের একটা নূতন সন্ধান এনে দিতে। কিন্তু কোথায় তারা? তাদের কি দেখতে পাওয়া যায় কোথাও? কৃষাণ মজুরের সভায় বা শোভাযাত্রায়? দীপক পার্কে পার্কে অনেক সভার চারপাশে ঘুরে দেখেছে—আগ্রহ নিয়ে লালঝাণ্ডার শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়েছে—কারু চোখে, কারু মুখে নেই নতুন জীবনের, নতুন আগুনের আভাস। নির্ব্বোধ মুখে, নিরুৎসাহ চোখে তারা শুনে যায় দিনের পর দিন নেতাদের প্রগলভতা—নিস্তেজ দুর্ব্বল পায়ে হেঁটে যায় নেতাদের পরাক্রান্ত পদক্ষেপের পেছনে পেছনে। এদের উপর আশা নিয়ে বাঁচা যায়না—দীপক হতাশায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

সত্যি বল্‌তে কি—মধ্যবিত্তের নেতৃত্বের কোন মানে হয় না। এরা ক্ষেপে উঠে ফ্যাসিজম্ পর্য্যন্তই দৌড়ুতে পারে, তার বেশি নয়। বেশি দৌড়ুতে গেলে এদের মধ্যে থেকেই আরেক দল ক্ষেপে উঠে এদের হটিয়ে দেয়। রাস্তার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দীপক। ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয় করা ছাড়া একে একে ধনতন্ত্রের সব রীতি-নীতিই ত ফিরে এলো সেখানে! কার অপরাধ? লেলিনের, ট্রট্স্কির, ষ্ট্যালিনের? হয়ত কারু নয়। হয়ত মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের—হয়ত পার্টির। দলগঠনের মধ্যেই এই বিষ লুকিয়ে আছে—নায়কতাই আমলাতন্ত্রের জন্ম দেয়—সে নায়কতা ব্যক্তিরই হোক আর দলেরই হোক। সমাজের দেহ থেকে শ্রেণীর গ্লানি মুছে দিতে চায় যে-বিপ্লব তাতে নেতৃত্বের শ্রেণী-সত্তার ঠাঁই থাক্‌তে পারেনা। সে-বিপ্লব নেতার কীর্ত্তি নয় দলের কীর্ত্তি নয়—গণদেবতারই ইচ্ছার উৎসার থেকে তার জন্ম। পৃথিবীর একটি বিপ্লবের ইতিহাস বই-এর কয়েকটি লাইন মনে মনে উচ্চারণ করতে থাকে দীপক: "Without a look back the masses made their own history" ......"The masses moved of themselves, obeying some unaccountable inner summons,"......"No body led the revolution, it happened of itself"....এর চেয়ে স্বাভাবিক সত্য হয়ত কিছু নেই। বঞ্চিতদের হৃদয় কখন যে অগ্নিগিরির মত রাঙা হয়ে ওঠে নেতারা তার কি খোঁজ রাখে? খোঁজ রাখতে পারেনা। রাশ্যার ফেব্রুয়ারী দিনগুলো তার সাক্ষী হয়ে আছে। যে পাঁচদিন গণশক্তির উন্মুখর আবেগ ভূকম্পের মতো কাঁপিয়ে দিয়েছিল পৃথিবীকে, কোথায় ছিল সেদিন নেতা আর নায়ক দল আর দলের বিধান? দলপতি থেকে শ্রেণীসমাজের জন্ম—শ্রেণীহীন সমাজের পথে দলপতি অবান্তর। রাষ্ট্রের প্রয়োজন একবার স্বীকার করে নিলে তার আর ক্ষয় হতে

পারেনা। রাষ্ট্রের মৌচাকে মৌরাণীর আবির্ভাব হয়—তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের ঘরসংসার।

চাষীমজুর—যারা চিনতে পারেনি নিজেদের—উত্তেজনার উত্তাপে করতে পারে কোনো এক সময়ে তারা বিপ্লব। তারপর তারা আবার তেমনি নিরুত্তাপ, অসহায়। সে লগ্নের অপেক্ষা করে থাকতে শিখেছে মধ্যবিত্ত নেতা—বিপ্লবের মুখে নিজেদের মনের মত মুখোস চড়িয়ে নিয়ে নেতারা এগিয়ে আসেন শেষে—তাঁদের হাত ধরে এসে উপস্থিত হয় পুরোণ পৃথিবীর অনেক পুরোণ রঙ।

নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবার জন্যে এগিয়ে গেল যারা—তারা কি জেনেছে কোনোদিন নতুন পৃথিবীর রঙ? জেনেছে কোথায়, কতদূর তারা যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? তারা তা জানেনা—জানেনা বলেই আসে নেতা—গড়ে ওঠে দল গড়ে ওঠে শ্রেণী—সমাজে এগিয়ে গিয়ে পেছুতে সুরু করে।

এমনই হয়। ভারতীয় ইতিহাসেও কি এম্নি কতগুলো পৃষ্ঠা জুড়ে যাবে? অর্থহীনতায় বিপ্লবকে মনে হবে অবান্তর? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অবসন্ন হয়ে আসে দীপকের মন। মানুষকে সুস্থতায় বাঁচিয়ে তুলতে পারে দিনের পর দিন তেমন মানুষের জাত নেই এখানে—নেই পৃথিবীর কোথাও। কিন্তু তারা আসবে—দীপক নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়না, সত্যের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পায়।

সেই সৈন্যদলের প্রয়োজন নেই সেনানায়কের—সেই নির্ম্মাতাদের প্রয়োজন নেই রাষ্ট্রপতির। দীপক সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করে প্যারিস কম্যুনকে। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে রাষ্ট্রের অবসান হয়েছিল। ছিলনা পুলিশ, সৈন্য, গীর্জ্জা আর রাষ্ট্রিক আমলাতন্ত্র। সমাজের শরীরে ক্যানসারের মতই প্রায় রাষ্ট্র—সমাজের শক্তিকে তা শোষণ করে নেয়,

সংপ্রসারিত হতে দেয়না মুক্তির আলোবাতাসে মানুষের মনকে। প্যারিস্‌-কম্যুনের মন আর রাশ্যার বিপ্লবের শক্তি নিয়ে হয়ত মানুষ তার আগামী বিপ্লবের রূপ তৈরী করবে—সেইদিনই হবে পৃথিবীর সত্যিকারের রূপান্তর।

অনুর্ব্বর, অনুজ্জ্বল জীবন নিয়েও দীপক একটু যেন চিকিয়ে ওঠে। মানুষকে বাঁচতে না দেখলে নিজেকে নিয়ে কেউ বাঁচতে পারেনা—তাই দীপক মানুষের ভবিষ্যৎকে মনে মনে বাঁচিয়ে তোলে। যে বিষের ক্রিয়া চলেছে তার নিজের জীবনে সবাই সে বিষে মুমূর্ষু হয়ে থাক—দীপক তা চায়না। আজ কেউ আমরা বাঁচতে পারছিনে—বাঁচতে পারবনা—তাই বেশি করে নতুন প্রভাতের জন্য প্রার্থনা জানায় তার মন। সে-প্রার্থনা সোচ্চার হয়ে ওঠে আরো, যখন অতীতের দিনগুলোর প্রেত-স্মৃতি তার মনে এসে উঁকি দেয়। কি জঘন্য অপচয় গেছে তার জীবনে! চারদিকে তাকিয়ে দেখবার যথেষ্ট সুযোগ তার ছিল -ছিল বয়েস তারুণ্যে উজ্জ্বল। এখন সে আর কতটুকু করতে পারে? তখন হয়ত পারত। কিন্তু করেনি। কেউ করেনা। তার মত যারা সবাই তারা আত্মধ্বংসেই সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে—শক্তি দান করে যায়না। মুকুল—অসিত—সব—সব। সবাই এক সোজা সরল পথ ধরে চলেছে। এই হয়ত তাদের জৈব ধর্ম্ম। দীপকেব চিন্তা তার মগজের স্বাভাবিক বৃত্তি নয়।

বইটা বন্ধ করে দীপক সেল্‌ফে তুলে রাখে। তারপর সিগারেট। সিগারেটের সূক্ষ্ম ধূম-তন্তু তার মুখের, কণ্ঠনালীর গোপনতম স্পর্শকাতর স্নায়ুগুলো ছুঁয়ে আসুক—সুদূর ভবিষ্যতের আনন্দের কল্পনার মত ম্লান একটু উত্তেজনা এনে দিক শরীরে।

অসিত এসে দীপকের সামনে দাঁড়াবার আগে ভাবতেই পারছিল না দীপক—এতক্ষণ যে সে একা ছিল। ছিল যেন তার আশেপাশে অজস্র

মানুষের আনাগোনা—আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, উজ্জ্বল মুখ তাদের, একটা উজ্জ্বল দৃশ্যের দিকে যেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল দীপক—গ্লোসিয়ারে সূর্য্যের ঝিকিমিকির মত উজ্জ্বল সে-দৃশ্য। অসিতের সঙ্গে আবার এখন তার সুরু হবে পরিচিত সমতলে বিচরণ। ক্ষয়ে যাওয়া এখানকার দৃশ্য—অতি পরিচয়ে নষ্ট হয়ে গেছে তার সম্মোহন।

"হ্যালো পণ্ডিত—" ময়লা প্যাণ্টের পাগুলো চিমটি কেটে উপরে তুলে নিয়ে অসিত একটা চেয়ার দখল করে : "বহুদিন তোমার দেখা নেই—বিধর্ম্মী গেরস্তের বাড়িতে একটু পায়ের ধূলো দিলে তোমার পাণ্ডিত্যের গায়ে ফোস্কা পড়ত না নিশ্চয়!" ঘামে-ভেজা সার্টটাকে গা থেকে একটু আল্‌গা করে আনে অসিত।

"মানে?—তুই খৃষ্টান হয়েছিস নাকি? মাইকেলের ইনফ্যান্‌টাইল ডিসর্ডার এদিনে?" দীপক হাস্‌তে সুরু করে।

"আমি ওর সহধর্ম্মী না হতে পারি কিন্তু নেলী ত আমার সহধর্ম্মিনী!"

"হোক না। দুজন দুটো ক্রশ হাতে নিয়ে ত মুখোমুখি বসে থাকিস্ নে! কিম্বা ও ক্রশ, তুই ত্রিশূল!"

"জানোই যদি ত্রিশূলের ভয় নেই তাহলে মুখদর্শন বন্ধ করেছ কেন বাবা?" ঘাড় নীচু করে অনবরত একটা সিগারেট ঠুক্‌তে থাকে অসিত।

"ডাকাতি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি—বাল্মিকীর আদর্শ বল্‌তে পারিস্—তোর পাল্লায় পড়ে দিনদুপুরে ডাকাতি করতে হয় পাছে সেই ভয়ে।" মনোযোগ দিয়ে অসিতকে লক্ষ্য করতে থাকে দীপক।

"ও, মদের কথা বল্‌ছিস—তা আজ একটু হয়ে গেল!"

"হয়ে যেতে পারাটাও কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়।"

"সৌভাগ্য!" অসিত মুখ তুল্‌ল : "কি বলে যেন তোদের বাংলায়—

ভাগ্যের রবি অস্তমিত—আমারও তাই হয়েছে! বাবার চাকরিতে ইস্তফা—"

"ধনতন্ত্র এ আবার কোন্ তন্ত্র প্রসব করল!"

"তোর ফরমূলায় ওসব পড়বেনা। চাকরি খুঁজছি এখন বেকার অবস্থা—দিবি একটা চাকরি?" ফিক্ করে হেসে ফেল্‌ল অসিত।

"মানে, বাংলাদেশে সুজা বিদ্রোহ করেছ? তা দিল্লীর সিংহাসন কেড়ে নিলেই হয়—আরাকানের রাজ-সরকারে চাকরি করতে যাওয়া কেন?"

"দুশো বছর ধরে চাকরি করে আসছি হিন্দুরা—নাড়ীতে তাই চাকরির নামই শোনা যায়।—আমি কি সেই নাড়ীর টানকে অস্বীকার করতে পারি?"

"কোথায় হল চাকরি—শুনি?"

"বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানীর জাতশত্রু 'ক্যালকাটা ষ্টীল কোম্পানী'তে!"

"বাঃ চমৎকার! সমাজতান্ত্রিকরা এখনো তোকে লুফে নিচ্ছে না অসিত!"

"তাইত এলুম তোর কাছে!"

"আমি কে? সোশ্যালিষ্ট? গাঙ্গেয় ভূমি অবিশ্যি আমার মতো সোশ্যালিষ্টই তৈরী করে!"

"সে যা-ই হোক শ'দু'য়েক টাকা দিতে হবে কিন্তু সোশ্যালিষ্ট!"

"পিতৃদ্রোহের পুরস্কার?" জোরে জোরে হেসে ওঠে দীপক।

"পিতৃদ্রোহের ফলে ওটার দরকার আপাতত। একমাস দশটা পাঁচটা করলে ত শালারা মাইনে দেবে!"

"শালা বুলিও বল্‌তে শিখেছিস, অসিত? হায় বুর্জ্জোয়া, শেষটায় তোমাকে ইতর হ'তে হল?"

"ও গালি অনেক শুনেছি—এখন শোনাব—মন্দ কি ?"

"মন্দ কিছুই নয়। সব ভালো। সব মধু। ব্রাউনিঙের মতো, রবিঠাকুরের মতো আমিও বলি সব মধু।"

"ওসব নামের লিষ্টটা আমার কাছে না আওড়ালে নিশ্চয় তোর ঘুম হয় না দীপক !"

"হয়। ওটা আমার কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স। যাক্ তাহলে ভালোই আছিস্?"

"সুখেদুঃখে কেটে যাচ্ছে দিন !"

"দুঃখ এলো আবার কোত্থেকে ?"

"ভয় নেই—নেলীর দিক থেকে নয় ?"

"প্রথমা স্ত্রী গোলমাল করছেন ?"

"হিন্দু স্ত্রী গোলমাল করেন না।"

"বিষ ত খান।"

"জেলাসিতেও লাইফ ফোর্সের দরকার।"

"কাশীবাস করছেন নাকি ?"

"প্রায় তাই—পড়াশুনো করছেন।"

"তাহলে আর হিন্দু স্ত্রী হল কই ?"

"পড়াশুনোতেই কি মেয়েরা বদলে যায়, পণ্ডিত ? জীবনে ত বাঙালী মেয়ে দেখনি—তাই থিয়োরীর মানুষ তৈরী করে সুখে আছ !"

"বাঙালী মেয়ে দেখিনি মানে ? রাস্তায় আমি হেঁটেছি আর সব সময়ই মাতাল হয়ে হাঁটিনি।"

"পদ্মার বুকে বোটে বসে থেকে রবিঠাকুরের যেমন গাঁয়ের জীবন দেখেছিলেন !"

"আমার লিষ্ট থেকে এবার কিন্তু তুই নাম চুরি করতে সুরু করেছিস, অসিত—এবার আর আমার দোষ নেই !"

"ভুল হয়ে গিয়েছিল—" মাথাটা একপাশে হেলিয়ে দেয় অসিত: "কিন্তু দোহাই তোমার—পাণ্ডিত্যের গুলি ছুঁড়তে সুরু করোনা—ও তোমার কাগজ-কলমের জন্যে তোলা থাক।"

"তাহলে বল্—তারপর কি? বাড়ি থেকে পালিয়েছিস্—এখন সে-ফ্ল্যাটেই?"

"আছি কয়েকদিন।"

"বাড়ি ফিরে যাবার মতলব আছে?"

"আপাতত কিছুদিন নেই—পরের কথা জানিনে।" অসিতের মুখের উপর দিয়ে হাল্কা কয়েকটা মেঘ উড়ে যেতে লাগল।

"নেলী এখনো পুরোণ হতে সুরু করেনি?"

"ভুল ডায়গ্নোসিস্ হল।"

"ভুল?"

"হ্যাঁ। নেলী না থাকলেও একদিন না একদিন বাড়ি ছেড়ে আস্তেই হত আমাকে।"

"তাহলে তুই অনেকদিক দিয়েই কীর্ত্তিমান বল্।"

"হয়ত তাই। কিন্তু বাড়ির জীবনটাকে তুই জীবন বল্‌তে চাস দীপক? তোরা জানিসনে—সে-জীবনের মধ্যে কোনোদিন থাকতে হয়নি তোদের—বাইরে থেকে দেখতে পাবিনে সে যে কি অসহ্য নির্য্যাতন। আমি সেখানে উত্তরাধিকারী—মানুষ নই।" অসিত ঘনঘন ফুঁকে যাচ্ছিল সিগারেট-টা।

অসিত আবেগময় হয়ে উঠ্‌তে চাচ্ছে—বুঝতে পারে দীপক। মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে: "কোথায় যে কে মানুষ হতে পারছে তা-ত আমি জানিনে। বুঝতে পারি এ-ও-তা খারাপ, কিন্তু বল্‌তে কি পারি এইটেই ভালো? বলতে পারিনে। খারাপের বিচিত্রতায় চলাফেরা করতে পারি শুধু।"

"তাই।" অসিত মাথা নাড়তে সুরু করে।

"যাক্—ওবেলটিন খাবি অসিত ?"

"চা নয়—ওবেলটিন ?" অসিত একটু চাঙ্গা হয়ে আসে: "নির্দোষ পানীয় ছেড়ে নির্দোষতম পানীয় ধরেছিস্ ?"

দীপক একটু একটু হাসতে থাকে। হয়ত খানিকটা লজ্জিতও হয়।

"আন্ তা-ই খাব। উত্তমর্ণের অনুরোধ এড়াতে নেই।"

"বাঃ—এইত মানুষ হয়ে উঠছিস—আভিজাত্যের খোলস ছেড়ে রীতিমত জনসাধারণ।" হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে পড়ল দীপক।

"ওবেলটিন যে-ই আনুক, তুমি বাবা চেকটা নিয়ে এসো।" মাতালের ভঙ্গীতে আরেকটা সিগারেট ঠুকে চলল অসিত।

একুশ

চারটা বাজলেই মিনিটে-মিনিটে ঘড়ি দেখতে স্থুরু করে অজিত। পাঁচটা বাজে না। রমেশবাবু এত কি কাগজপত্র যে ঘাঁটাঘাঁটি করেন বোঝা মুস্কিল। সত্যি বলতে কি, দশটা-পাঁচটা ব্যস্ত থাকবার মতো কাজ কোম্পানীতে নেই। অজিত কাজগুলো দেখে নিচ্ছে—তা থেকেই বলা যায় কাজের এমন কিছু স্তূপ পড়ে নেই। কারখানা দেখতে হচ্ছে অজিতের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকদের হাত চলা লক্ষ্য করা। খুবই ক্লান্তকর ব্যাপারটা। হয়ত আঁটঘাঁট জেনে নিলে উৎসাহ আসবে পরে। রমেশবাবু এখন থেকেই উৎসাহের সঞ্চার করতে চান নিতান্ত নিরুৎসাহ মুখে। অভয় দেবার অজুহাতে ভয়ও দেখান ঃ

"মনে হচ্ছে ষ্ট্রাইক করবে লোকজন—তাতে অবিশ্যি পরোয়া নেই আমার—একদল যাবে আরেকদল আস্‌বে!" দুয়ে-দুয়ে যে চার হয় এ-কথাটাই যেন রমেশবাবু প্রমাণ করে দিলেন।

"ষ্ট্রাইক? কেন? বেতন বাড়িয়ে দিতে বলে?"

"তাছাড়া আর কি? এদিকে কোম্পানী মুনফা টান্‌ছেনা একটি পয়সা—বেতন বাড়াও! যদি বলি কোম্পানীর হোক তোমাদের হবে—আরো যেন ক্ষেপে ওঠে।"

"এখনও ত আস্‌ছে সবাই।"

"এখন আস্‌বে। যেই অর্ডারগুলো কারখানায় যাবে, ওম্নি দেখবে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সবাই হল্লা করছে—কারখানায় কাকপক্ষীটিও ঢুক্‌ছে না—এ-সব আমার জানাশুনো ব্যাপার!"

"অর্ডার ত কিছু কিছু এসে গেছে, না?"

"কিছু কিছু এসেছে—" করুণ সুর ভাজতে সুরু করেন রমেশবাবু: "তবে সায়েব ব্যাটাও লাগিয়ে দিয়েছে গোলমাল!"

সেই গোলমালের ভেতরে আর অজিত ঢুক্‌তে চায় না। টেবিলের উপর পেপার-ওয়েটটা নাড়াচাড়া করতে থাকে। রিষ্টওয়াচের উপর চোখ বুলিয়ে আন্‌তে বাধ্য হয়। বাড়ি যাবার জন্যে একটা তাগিদ মন থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। জুতোটা মেঝেতে ঠুকে দেয় দু'তিনবার। 'উঠে একটু পায়চারী করে আসে। তবু পাঁচটা বাজে না।

সাতদিন হয়ে গেল গীতা ওদের বাড়িতে এসেছে। ওকে পাওয়া হয়নি মনের মতো। যতক্ষণ পেতে ইচ্ছা করে পাওয়া যায় না তার আদ্ধেক সময়ও। শুধু রাত্রিটা। সমস্ত দিনের অপরিচয়ের পর রাত্রিতে সঙ্কোচ কাটতে চলে যায় অনেকটা সময়। ঘুমুতেও হয় খানিকটা—তারপর আর কতটুকু সময় থাকে ওকে নিবিড় করে পাবার? সমস্ত দিন দিদিদের আর মার সঙ্গে সঙ্গেই আছে গীতা। পাচটায় বাড়ি ফিরে গিয়েও ওকে কাছে পাওয়া যাবে না। তবু প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকা যায়—যদি কোনো সুযোগ আসে—হঠাৎ যদি মুখোমুখি হয়ে যায় দুজন আর পাশে কেউ না থাকে! তাছাড়া গীতার উপস্থিতিময় বাড়ির আবহাওয়াটাই উষ্ণ মনে হয় অজিতের কাছে—কাছে না আসুক গীতা—চুপ করে একা বসে থাকতেও ভালো লাগে তার।

বিয়ের আগে বিয়েটা অবিশ্যি ভয়াবহ মনে হয়নি অজিতের। তবু যেন মুক্তি পায়নি তার মন। মনে হয়েছে একটা জরুরী ঘটনা এগিয়ে আস্‌ছে—অপরিচিত নূতন কিছুর আবির্ভাবের সম্ভাবনায় অস্বস্তিবোধ করেছে একেক সময়। কিন্তু ততটা আশঙ্কা আর অস্বস্তি দেখাবারও

যেন কোনো কারণ ছিলনা—তার বাড়ির স্বাভাবিক জীবনে একটু অন্যরকম ঢেউ উঠলনা তার বিয়ের দিনে—বিয়ে করতে গেল সে যেন বেড়াতে গেল মুকুন্দবাবুর বাড়ি। মুকুন্দবাবুর আয়োজনেও উৎসবের একটা অস্বাভাবিক উগ্রতা ছিলনা। অজিতের বুক কেঁপে উঠবার সুযোগ পায়নি। গীতা যখন তার হাতের উপর হাত রেখেছিল তখনও না।

গীতা তাদের বাড়ি এলো—এসে মিশে গেল, হারিয়ে গেল তাদের বাড়ির জীবনে। যেন এ-বাড়িরই পুরোনো কোনো লোক সে, দিন-কয়েক অনুপস্থিত থেকে ফিরে এসেছে। যা কিছু কৌতূহল সুনন্দারই ছিল—কিন্তু বিছানা থেকে উঠে বসবার শক্তি কই তার? সবার থমথমে চেহারায় টুটুল-টুলুও রোগা মুখগুলোকে রোগাটে করেই ঘুরে বেড়িয়েছে। শুধু এক নীহার। উৎসবের আবহাওয়াটা জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করল সে প্রাণপন—আত্মীয়পরিচিতের বাড়ি থেকে যে ক'জন মেয়ে এসেছিল তাদের সঙ্গে রঙ্গরসের টিপ্পনি কেটে ব্যর্থভাবে ঘুরঘুর করল কতক্ষণ—তারপর গীতার বিষণ্ণ মুখটা কয়েকবার লোলুপ দৃষ্টিতে দেখে অজিতের কাছে এসেই আশ্রয় নিলে।

"অসিতবাবুকে দেখছিনা যে—খবর ত তিনি জানেন—কিন্তু এলেন না কেন?" ভূমিকাটা এভাবেই সুরু হল যদিও অসিতের জন্য মোটেও উদ্বিগ্ন ছিলনা নীহার।

"হয়ত কলকাতায় নেই।" এর চেয়ে ভালো উত্তর অজিত জানেনা।

"তোমার বৌদি—দেখা যাচ্ছে তিনিও অনুপস্থিত!"

"বৌদির বাবার শক্ত অসুখ!"

"ও—" প্রসঙ্গটাতে যবনিকাপাত করে পুরোপুরি একটা দম নিয়ে নীহার বল্‌লে : "Now youngman, you stand face to face with life—"

"স্ত্রীকে ত জীবন সঙ্গিনী বলেই জানতুম—জীবন বলেত জানিনি।" তৃপ্তির একটা ছোট হাসি ছিল অজিতের মুখে।

"স্ত্রী হচ্ছে লাইফ্ ফোর্স—অবিশ্যি সে-স্ত্রীর লাইফ থাকা চাই।"

"হয়ত তাই—" অজিত অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

মনে পড়ছিল তার গীতার সঙ্গে প্রথম রাত্রির কথা। হার্টের অসুখের জন্যে নয়—ম্লান হয়ে থাকাটা যেন গীতার স্বভাবেরই একটা ধর্ম্ম। মুকুন্দবাবু নৈতিক শক্তির মন্ত্রে তাঁর পারিবারিক জীবগুলোকে মুগ্ধ করে রাখতে চেয়েছেন সমস্ত জীবন। তারি জন্যে হয়ত মুকুলের অধঃপতন। গীতার শরীরে তার ক্রিয়া হয়েছে উল্টো পথে—শরীরটাকে কতকগুলো আদর্শের ক্রীতদাস বলে ভাবতে শিখেছে গীতা—আর তাই শরীর তাকে ক্ষমা করেনি—স্বভাবের মূলে হাসির উৎস গেছে তার শুকিয়ে—হৃদপিণ্ড হারিয়ে ফেলেছে স্বাভাবিক শক্তি। হৃদপিণ্ডকে সুস্থ করে তোলবার ওষুধ হয়ত আছে—কিন্তু স্বভাবকে সুস্থ করা যায় না।

উষ্ণ আলিঙ্গনেই গীতাকে জড়িয়ে ধরেছিল অজিত—কতকটা যেন হিংস্রতায়, মন্দারের উপর হিংস্রতায়। অজিতের গলায় থরথর করে কাঁপছিল একটা অস্পষ্ট ধ্বনি : "গীতা—"

নিস্তেজ অনিচ্ছুক একটু হাসি মুখে এনে গীতা খুব ধীরে ধীরে একটি হাতে আলগা ভাবে বেষ্টন করতে চেয়েছে অজিতের শরীর। মনে হয়েছে অজিতের, বিয়ের উৎসবহীনতাই হয়ত গীতার মনে উত্তাপের উচ্ছলতা এনে দেয়নি। অবনীবাবুর মুখটা মনে পড়ছিল তার—পাথরের

মত নিরেট মুখে বসেছিলেন তিনি সমস্তদিন। গীতা হয়ত লক্ষ্য করেছে না করলেও বাড়ির নিরুৎসুক আবহাওয়াটা অন্তত বুঝতে পেরেছে সে। সে ব্যথাতেই গীতা ব্যথিত—ভেবেছে অজিত।

তারপরের রাত্রিগুলোতেও ঠিক তেমি। গীতার শরীরে কি যেন খুঁজতে চেয়েছে অজিত—কোনো ট্রেনের উদ্দাম অফুরন্ত গতি হয়ত—যা তার মনকে মুছে দিতে পারে—দিতে পারে মেধাকে মুছে—বেঁচে থাকবে অজিত শুধু একটা বোধ নিয়ে—পিপাসা নিয়ে—বালুর বিছানা যেমন পিপাসায় শুষে নেয় জল তেমনি পিপাসা নিয়ে।

সমস্ত শরীরের ব্যাকুলতা যখন অজিত ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল গীতার শরীরে—ঠাণ্ডা চোখে একটা নিবিড়তা এনে অত্যন্ত বিস্ময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে গীতা : "কী ?"

গীতার বুকের উপর মুখটাকে আরেকটু নিবিড় করে এনেছে অজিত। সেই তার উত্তর। গীতা কি জানেনা এই যে তার উত্তর ? গীতা জানে নি। নিঝুম হয়ে রয়েছে তারপর।

অজিত একটা পরিচিত উত্তাপ অনুভব করছিল দেহে। কিন্তু ট্রেনের কামরায় কি সে একা ? একটি মেয়ের মৃত মাংসের স্তূপ ছুঁয়ে কি সে বসে আছে ? প্রাণের গুঞ্জনে স্ফুরিত হবেনা, উষ্ণ হয়ে উঠবেনা আর মাংসের মৃদুতা, ত্বকের মসৃণতা ? মৃতের ছোঁওয়ায় অজিতও যে কখন মরে গেছে জানতে পারেনি। পরদিন ভোরে জেগে উঠে দেখেছে বিছানায় গীতা নেই।

কিন্তু কোথাও লুকিয়ে আছে উত্তাপ। পৃথিবীর নিরেট-কঠিন মাটি আর পাথরের নীচে আছে যেমন সূর্য্যের স্মৃতি—জলন্ত রহস্যময়তা। কঠোর প্রতিজ্ঞা করে অজিত, একদিন সে-আগুনের মুখোমুখি সে গিয়ে দাঁড়াবে। আবিষ্কার করতে হবে গীতাকে।

অজিত মানতে চায়না, যৌবনের স্বাভাবিক মৃত্যু আছে। তাকে হত্যা করা যেতে পারে। সেই অপমৃত্যুর প্রক্রিয়া চলেছে সুনন্দার জীবনে—তবু মুমূর্ষু তার ইচ্ছাকে, কামনাকে, প্রাণকে ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছে। টুটুল-টুলুর পরও এসেছে টুসকি—এদের মতো আরো কত প্রাণগ্রন্থি লুকিয়ে আছে সুনন্দার রক্তে আর মাংসে তা কে বলবে? নিজেকে অম্লান রেখে যেতে চায় যৌবন অপমৃত্যুর কাছে এগিয়ে গিয়েও। এই অপমৃত্যু ত ছুঁয়ে যায়নি গীতাকে। তবে কেন আবিষ্কৃত হবেনা গীতা? অঙ্কুরিত হয়নি গীতার মন—একদিন হয়ত হবে। হবে? যখন ফুলন্ত হয়ে ওঠবার কথা—তখন কি মাটির অন্ধকারে শিকড় মেলে দিতে পারে চারা? অজিত তা জানেনা—জানতে চায়না। আশা নিয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভালো। কিন্তু প্রশ্ন এসে উঁকি দেয়—দুহাতে ঠেলে ওদের সরানো যায় না। এমন ত হতে পারে গীতা প্যাশন-কেই চিনতে পারেনি কোনোদিন। মুকুন্দবাবুর শালীন আর সুশৃঙ্খল জীবন দিয়েই গীতার মনের স্তরগুলো তৈরী হয় গিয়েছে—পাথরচাপায় মরে গেছে তার যৌনবৃত্তি অনেক, অনেকদিন আগে। নীতির পাথর যৌনতার অঙ্কুরকে বাঁচতে দেয়নি—পারিবারিক জীবনের শান্ত সৌম্য দেবমন্দিরে দেবদাসী হয়ে থাক্‌তেই হয়ত ভালো লেগেছে গীতার। মুকুন্দবাবুর মন্থর প্রৌঢ়ত্বের অনিবার্য্য সাহচর্য্যে গীতা আজ নীলকণ্ঠ—প্রলয়ের নাচ তার পায়ে হয়ত আর আসবে না। অসম্ভব। মাথা নেড়ে অস্বীকার করে অজিত। মুকুন্দবাবুর যদি গীতাকে মেরে ফেলবার ক্ষমতা থাকে—তবে অজিতেরও ক্ষমতা আছে তাকে বাঁচিয়ে তোলবার। অজিত বাঁচিয়ে তুলবে গীতাকে। ততটুকু শক্তি তার আছে। অন্তত ততটুকু শক্তির দরকার আছে তার। সে শক্তিকে সঞ্চয় করে নিতে হবে। মন্দারের চেয়ে মহার্ঘ করে তুলতে হবে গীতাকে।

তখনও পাঁচটা বাজেনা। একটা উন্মাদনাকেই চঞ্চলতায় রূপ দেয় অজিত। রমেশবাবুর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে : "অর্ডারগুলো কালই ছাড়া হবে কারখানার, না?"

অন্যমনস্কতায় আপ্লুত হয়ে বড় বড় চোখে রমেশবাবু অজিতের দিকে তাকালেন : "কি? ও—হ্যাঁ।"

"আজ তাহলে যাওয়া যায়—"

"নিশ্চয়। তুমি চলে যাও। ক'টা চিঠিপত্র সেরে নিয়ে আমিও উঠব। তুমি বসে আছ এতক্ষণ কি করতে? আমার ছ্যাখো খেয়ালই ছিনা—নইলে আগেই বলতুম।"

অজিত খুসীতে ক্লান্ততর দেখায়।

বাইশ

অনেকদিন পর অবনীবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন মনোরমা। ভেঙে গেছে অবনীবাবুর শরীর—দুবছর পর কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে অবাক হয়ে যেত—কিন্তু তার চেয়েও আশঙ্কার যা, ভীষণ চুপ করে গেছেন তিনি। বেশি কথা অবিশ্যি তিনি কোনদিনই বল্‌তেন না—তবু লোকজন এলে কখনো তাঁর মেজাজ, ক্বচিৎ দু-এক টুকরো হাসি মনোরমার ঘর থেকেও শোনা যেত। এখনো অনেকে আসেন—মুকুন্দবাবু আর রমেশবাবু না এলেও বালিগঞ্জে সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের অভাব নেই—তাঁরা আসেন। প্রচুর কথা বলেন তাঁরা—যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে সুরু করে ইলিশমাছের চাষ পর্য্যন্ত কোনো আলাপেই তাঁদের অরুচি নেই—অবনীবাবু চুপচাপ মন দিয়ে শুনে যান, মানে প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকেন। যুদ্ধ বাধবে? না ওরা হুমকি দিয়েই শক্তি ফুরোবে এবার? স্ক্র্যাপ আয়রণ কেনা উচিত—উচিত কারখানাটাকে যুদ্ধের সুযোগের জন্যে এখন থেকেই তৈরী করা উচিত। অনেক কিছু করাই উচিত! কিন্তু কিছু করতে পারবেন কি অবনীবাবু? কিছুই যেন তিনি করতে পারেন না। কোনোদিন যে কিছু করতে পেরেছেন, মনে হয়না তাঁর। অসহায়ের মত এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকেন অবনীবাবু।

মনোরমার মুখের দিকেও অপরিচিতের চোখ নিয়েই তাকান তিনি।

"সুনির হাওয়া বদল দরকার—" আগেকার মতই একটা চেয়ারে বসে পা দোলাতে সুরু করেন মনোরমা।

"হাওয়া বদল?" আপনমনে ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে চলেন অবনীবাবু।

"হাওয়া বদল না করলে ওকি বাঁচবে ভেবেছ ?"

"বাঁচবেনা !" চেয়ারের হাতল থেকে অবনীবাবু হাত দু'টো মাথার উপর তুলে আনেন।

"নীহার এসে খোঁজ নেয়না—ঐ ত মেয়ের শরীর, তার উপর এ নিয়েও মনে অশান্তি জমে উঠ্ছে।"

"কলকাতায় নেই নীহার ?" মানুষের মনের অলিগলিগুলো যেন ভুলে গেছেন অবনীবাবু।

"কলকাতায় থাক্‌বেনা কেন ? আছে। তবু কি যে হয়েছে ওর মতিগতি—শুন্‌ছি নাকি—"

"হুঁ—" শ্লথ নীল ঠোঁটগুলো অবনীবাবু কঠিন দৃঢ়তায় চেপে ধরেন। হঠাৎ যেন সমস্ত চেতনা, সমস্ত মেধা তাঁর ফিরে আসে।

"সুনির জন্যে একটু মমতা ওর নেই—সে কথাই বল্‌ছিল সুনি আর মেয়ের সে কী কান্না—" মনোরমার দৃঢ়তাও একটু সজল হয়ে আসে।

"সুনি মরবে। আর মরে যাওয়াই ওর ভালো।"

"আমার হয়েছে সবদিকে যন্ত্রণা—আমি মরলেই হয়ত সব আগের মত হয়ে আসবে আবার !"

অবনীবাবু বুঝতে পারলেন না একটা সাদা সহজ কথার পর মনোরমার কি করে আত্মধিক্কার আস্‌তে পারে ! বিরক্তই হলেন হয়ত তিনি খানিকটা।

"কোনোদিকে তুমি চাইবেনা—কিচ্ছু দেখ্‌বেনা—আমি আর পারিনে—" মনোরমার সমস্ত চোখে মুখে ক্লান্তি ছেপে আসে।

"আমি কি করব ?" কেবল বিরক্তিই নয়, নিজের অক্ষম অবস্থাটাও অবনীবাবুর গলায় ফুটে ওঠে।

"সবই করবে।"

"কিছুই করা যায়না—তা জানো?"

মনোরমা তা জানেন। নিজে তিনি কিছুই করতে পারেননি। তাই অবনীবাবুর সাহায্য নিতে এসেছেন। সুনন্দার শরীরের উপর তাঁর হাত নেই। কিন্তু সুপ্রিয়ার এমন হল কেন? ব্রাহ্মণ বিধবাদেরও ও হার মানিয়েছে—এখন তীর্থ করতে চয়ে—হরিদ্বারের কোন সন্ন্যাসী আশ্রমের রাশি রাশি বই কিনে পড়ছে, অস্থির হয়ে উঠেছে সে-আশ্রম দেখতে যাবে! শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে শরীর—দেখলে মনে হয় বয়েস পঞ্চাশেরও বেশি। মনোরমা কি তা-ই চেয়েছিলেন? যোগিনী হয়ে থাক সুপ্রিয়া—মনে-মনেও কোনোদিন কামনা করেননি তিনি। চারদিকে মনকে ছড়িয়ে রেখে যাতে সুপ্রিয়া এই দুঃখের অবস্থাটা ভুলে থাক্‌তে পারে সে-চেষ্টাই বরং মনোরমা করেছেন। কিন্তু চেষ্টাই করেছেন তিনি—তার কোনো ফল হয়নি। কেন হয় নি—বুঝতে পারেন না। হয়ত দৈবের হাত। দৈব ছাড়া কি? সমস্ত জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি কি ভুল করতে পারেন? ভুল করেছেন বলে মনে হয়না তাঁর—তবু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। অবনীবাবুর কাছে আস্‌তে হয়।

তারপর অলকা। অলকাকে জোর করে এখানে তিনি নিয়ে আস্‌তে পারতেন—তার বেশি আর কিছুই করা যেতনা। কিন্তু কি হত তাতে? অলকার দুঃখ কি এক ফোঁটা কমে আস্‌ত? গোড়ায় হয়ত অলকার উপর খুসী ছিলনা তাঁর মন—কিন্তু অলকার শেষ চিঠিটার পর তাকে শুধু ক্ষমাই করেন নি মনোরমা, সমবেদনায় ভারি হয়ে উঠেছে তাঁর বুক। সে চিঠির কথা জানেন নি অবনীবাবু—তাঁর দুশ্চিন্তাময় হাড় ক'খানার উপর এ অশান্তির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে লাভ কি?—কিন্তু চিঠির কথাগুলো মনোরমার চোখে লেগে আছে।

এখনো তিনি তা পড়ে যেতে পারেন—পড়েনও। পড়ে তাঁর চোখ টনটন করে ওঠে—তবু না পড়ে' যেন উপায় নেই: "মা, আপনাদের কাছে আমার পাওয়ার কিছুই বাকি ছিলনা—আপনাদের যে তবু ছেড়ে আসতে হল সেই আমার দুঃখ। যাঁর কাছ থেকে দুঃখ পেলে সহ্য করা যায় না, সেই অসহ্য দুঃখের জন্যেই আমি চলে এসেছি। আপনাদের স্নেহমমতার উপর অবিচার হয়েছে—বুঝতে পারি। কিন্তু এ-ও জানি তার জন্যে একদিন আমায় ক্ষমা করবেন।" জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে মনোরমা চুপ করে থাকেন।

"উপায় নেই—এইটুকুই বুঝি—তার বেশি মাথায় আসেনা।" আবারও বলেন অবনীবাবু।

"বড় খুকী বেড়াতে যাবে বলছিল—এখানে সুনিরও যখন শরীর সারছেনা—তাছাড়া তোমার শরীরেরও বা কি অবস্থা হয়েছে—ডাক্তার যত ওষুধই দিন—ওষুধ খেয়ে ঘুম হয় কখনো? তোমারও হাওয়াবদল দরকার?"

"আমার? আমার কিছু হয়নি।" অবনীবাবুর শক্ত মন কথা কয়ে উঠল।

"ডাক্তারও ত তোমায় হাওয়াবদলের কথা বলেছেন।"

"ওরা ওরকম বলেন। আমি কোথায় যাব? কোথাও যাবনা।"

"বছরে এক আধবার সবাই বেরোয়—"

"বাতিক। ওতে শরীর সারেনা—রাস্তাঘাটের চলাফেরাতে শরীর বরং আরো ভেঙে পড়ে।"

"তুমি গেলে সুনির যাওয়াটাও হ'ত।"

"ওর শরীর সারবেনা।" ডাক্তারের মতই জবাব দিয়ে দেন অবনীবাবু।

"তাহলে খুকীর কথাই ভাবো।"

"জলপাইগুড়ি থেকে বেড়িয়ে আসুক না ক'দিন "

"দেওররা ত একটা চিঠি দিয়েও খোঁজ নেয়না—ওখানে যাবে কেন ও? বরং বল্‌লে মনে কষ্ট পাবে।"

"যেতে হয় তোমরা যাও—দরকার মনে করলে ত যাবেই।"

"তুমি ভেবেছ তোমার জন্যে একা তোমারই চিন্তা?"

"আমার জন্যে চিন্তারই বা কি দরকার?" বিরক্তি নয়, কঠোরতা নয়—অভিমানের একটু সজল বাষ্প ছুঁয়ে গেল যেন অবনীবাবুর কণ্ঠ।

মনোরমা আরেকটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিলেন।

"বড় খোকা বাড়ি আস্‌ছেনা—না?"

"বিয়ের খোঁজও নিলেনা একবার! কলকাতায় হয়ত নেই। ট্যাক্সিতে ট্র্যাঙ্ক-সুটকেশ নিয়ে সেই যে গেল আজ পর্য্যন্ত দেখা নেই।"

"কলকাতায়ই আছে।"

"আছে?

"রমেশবাবু তা-ই বল্‌ছিলেন।"

"বিয়েতে এলোনা!"

"চাকরি নিয়েছে অন্য এক কোম্পানীতে।"

"চাকরি নিয়েছে!"

"আমি যে ওর কি করলুম তা-ই বুঝতে পারছিনে!"

"সবার উপরই ওর অভিমান—কি কুগ্রহের কোপ যে ওর উপর পড়েছে—" মনোরমা আর কিছু বল্‌তে পারলেন না, আঙ্গুল দিয়ে চোখ রগড়াতে সুরু করলেন।

মনোরমার কথাগুলো যেন শুন্‌তে পাননি অবনীবাবু—আগেকার কথারই জের টেনে চল্‌লেন তিনি: "হয়ত কিছু করেছি। কিন্তু

আমি ত জান্‌তে পারলুমনা!” সেই অসহায়ের মুখ ফিরে এলো তাঁর মুখে—অসহায়ের মতোই তিনি হাস্‌তে লাগলেন।

মনোরমার সমস্ত শরীর সেই হাসির শব্দে আশঙ্কায় উৎকর্ণ হয়ে উঠল। ভেঙে পড়লে এখন আর তাঁর চল্‌বেনা। মনে হল তাঁর—স্বামীকে তিনি চিনে এসেছেন যে দীর্ঘদিনের বহু সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে—তাতে কোথাও যেন এ-হাসির শব্দ ছিলনা। মনোরমা ভয় পেলেন। কিন্তু ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইলনা তাঁর হাত পা—জ্বলে উঠল তাঁর চোখ: “ওম্নি থাকে একেক জন—ঘা দিয়ে দিয়ে যারা সংসার ভেঙে দেয়।”

“আমাকে যদি অপমান করতে হয় ও-ই ত তা সবচেয়ে বেশি পারবে!” মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে অবনীবাবু চারদিকে তাকাতে থাকেন।

“মরেও ত যেতে পারত। আমি ভাবছি ও মরে গেছে!” মনোরমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রাণপনে চোখমুখ কঠোর রেখে কোনোরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এ অভিনয়টুকুর দরকার ছিল। নইলে অবনীবাবু তাঁর স্বাভাবিকতায় ফিরে যেতে পারবেন না—বাঁচতে পারবেন না তিনি।

মনোরমা চলে গেলেন তারও অনেকক্ষণ পরে অবনীবাবুর মনে হল কি একটা কথা যেন বলা হয়নি। সে কথাটা মনে করতে লাগলেন অবনীবাবু। খুবই জরুরী কথা—কার কাছে—কার কাছে যেন শুনেছেন। কে বলে গেল? আজ বা কাল বা পর্শু কে এসেছিলেন? কারা এসেছিলেন? যতীনবাবু—অবিনাশবাবু—যতীনবাবু যুদ্ধের বিভীষিকা দেখিয়ে গেলেন—যুদ্ধের কথা নয়,—অবিনাশবাবু তাঁর নূতন বাড়ির প্ল্যান নিয়ে ভীষণ চিন্তিত আছেন—জমিটা ভালো নয়, কোনোরকমেই ঘরগুলো সব আলোবাতাস পেতে পারেনা—সে কথাও নয়। মুকুন্দবাবু—মুকুন্দবাবু এসেছিলেন অনেকদিন

পরে। অবনীবাবু হঠাৎ স্মৃতিশক্তি ফিরে পান। মুকুন্দবাবুই বলে গেলেন। যে মেমটাকে মুকুল বিলেত থেকে নিয়ে এসেছিল—তার সঙ্গেই আছে এখন অসিত। খবর পেয়েছেন মুকুন্দবাবু। অত্যন্ত আতঙ্ক নিয়ে কথাটা বলে গেলেন তিনি। শুনে সমস্তটা শরীর ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠেছিল অবনীবাবুর। আবার কখন যে কথাটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন বল্‌তে পারবেন না। আজকাল এম্নি হচ্ছে তাঁর। কোনো কথা বেশিক্ষণ মনে করে রাখতে পারেন না। কোথায় যে তা হারিয়ে যায়—খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হয়। মনোরমা যতক্ষণ ছিলেন—কথাটা খুঁজে পাননি। এখন খুঁজে বার করে সোজা তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘরময় পায়চারী করে এলেন কতক্ষণ। উত্তেজনাটাকে এবার আর হারিয়ে ফেল্‌লে চলবেনা। নেপথ্যে সরে গেলে চলবেন তাঁর। আবার এগিয়ে আস্‌তে হবে পরিবারের সামনে। মুকুন্দবাবুর ম্লান মুখটা চোখের উপর ভেসে উঠল। অসিত গেছে যাক্‌। হাতের মুঠো আলগা করে অজিতকে তিনি ছেড়ে দেবেন না। এখনো হাতের মুঠোতেই আছে অজিত—সে-মুঠো দৃঢ়তর করতে হবে। অজিত যেন পালাবার অবসর না পায়।

অবনীবাবু একটা সিগার তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরলেন।

তেইশ

সুনন্দার কাছেই প্রায় সব সময়ে বসে থাকতে হয় গীতাকে। বাইরে বেরিয়ে চলাফেরা করতে পারে না সুনন্দা—বেরুবার শক্তি নেই। কথা বলবার শক্তি ছিল আগে, এখন আর তা-ও নেই। তবু অভ্যাসের দরুণ কথা বল্‌তে চেষ্টা করে—কিন্তু খুব কম। 'কথা বলার উপলক্ষ্য চাই—তাই গীতাকে বসে থাকতে হয়। গীতা অনিচ্ছুক হয়ে ওঠেনা। এখান থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে সে? সুপ্রিয়া নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—কারু দরকার তার নেই। দরকার থাক্‌লেও গীতা সে-দরকার মিটাতে পারে না। মনোরমার পাথরের মূর্ত্তিকে ভালো লাগলেও তা নিশ্চলতাকে গীতা ব্যাঘাত করতে চায় না। তাছাড়া টুস্‌কি-টাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন মনোরমা—ওরকম কাঁচা শিশুর আদর যত্ন করা গীতা জানেনা—কি হবে মনোরমার কাছে গিয়ে! টুলু-টুটুলকে বরং পাওয়া যায় এখানে—ওদের দশপাঁচরকম কথায় ভুলে থাকা যায় সময়। তাছাড়া গীতা নিজেও চুপ করে বসে থাক্‌তেই ভালবাসে। কথার ভীড়ে হাঁপিয়ে ওঠে তার মন। নিজের ভেতরে অনেকদূর সে চলে গেছে। ফ্রয়েড একে দেখলে চম্‌কে উঠতেন—তাঁর 'ইগো' আর 'ইড্‌'-এর ভূতও এ শরীর ছেড়ে পালিয়েছে—আত্মরতির অনুভূতি বা আনন্দও নেই গীতার। যেখানে ডুবে গেছে সে সেখানে শুধু নিশ্চলতা। কোনো ঘটনা, কোনো চিন্তা, কোনো আবেগ সেখানে দাগ কাটতে পারে না। বহু-সাধনায় গৌতম-বুদ্ধ এ অবস্থাটারই সন্ধান হয়ত পেয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ অন্যমনস্ক বসে থেকে হঠাৎ যখন সচেতনতায় ফিরে

আসে গীতা—নিজেকে ভারি অদ্ভুত মনে হয় তার। মনে করতে চেষ্টা করে কি ভাবছিল সে এতক্ষণ? কিছুই না। মন যে এত ফাঁকা হয়ে উঠতে পারে নিজেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। সুনন্দার কথাগুলো নিয়ে অনেকদূর চলে যেতে পারত গীতা—কিন্তু সে-কথায়ও তার কান ছিল না। তবু অনেকদূরে চলে যেতে হয়েছে তাকে—এত দূর যে সেখান থেকে এখানকার কোনো চেহারা দেখা যায় না।

"হার্টের অসুখ শুনেছি একবার হলে আর সারেনা—" চোখ বোজা-বোজা হলেই আবার জোর করে চোখ মেলে ধরে সুনন্দা: "কি করে যে সারল তোমার তা-ইত অবাক হচ্ছি। আমারও হয়ত হার্টের অসুখই ছিল—" একটা নিশ্বাস নিয়ে নেয় সুনন্দা: "ডাক্তাররা বুঝতে পারেননি কোনোদিন—"

গীতা গভীর মনোযোগে সুনন্দার কথা শুনে যায়—মুখের উপর একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে তার আর কুৎসিত দেখায় মুখটা। সুনন্দার ভালো লাগে—একটু খুসী হয়েই আবারও বলতে থাকে সে: "তোমার শরীরও ভালো নয়—"

"আগে আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল—"

"তাহলে তুমিও সাবধান থেকো কিন্তু—"

মনোরমা এসে উপস্থিত হন। সুনন্দার মুখে রোগের স্বাভাবিক পাণ্ডুরতা নেমে আসে। তাতে বিগলিত হয় না মনোরমার মুখ। কেমন রুক্ষই যেন দেখায় তাঁকে।

"সেই কখন থেকে বসে আছ এখানে বৌমা—কি করছ বসে?" মনোরমা অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে বসেন। গীতা কিছু বলেনা—কিছু বুঝতেও পারে না যেন—তবু লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

"কি করবে আবার?" সুনন্দার গলায় রোগীর নিষ্প্রাণতা নেই: "একা থাকি—তাই বসে আছে বউ।"

"বেশত—বসে গেলত খানিকক্ষণ। এখন যাক্—অজিত হয়ত অপিস থেকে এসেছে—"

"এসেছ ত বউ গিয়ে কি করবে?"

"ওঠোত—বৌমা—যাও—" মনোরমা সুনন্দার দিকে না তাকিয়ে গীতার মুখের দিকেই তাকান।

গীতা উঠে দাঁড়ায়। যেতে তার ইচ্ছা করে না। নিজ থেকেই ইচ্ছা করে না। মনোরমা নীরবে তাকে লক্ষ্য করতে থাকেন। কাজেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয় গীতাকে।

"ভারি মুক্তি দিতে এসেছ—আমি তোমার বউকে আটকে রেখেছি কিনা!" নির্লজ্জের মত কথাটা বলে অবুঝের মত কেঁদে ফেলল সুনন্দা।

মনোরমা একটুও বিচলিত হলেন না। চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অপিস-ফেরত অজিতের অভ্যাস টুপিটাকে ব্র্যাকেটের হুকে ছুঁড়ে দিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। টাই খুলতে খুলতে আয়নায় নিজেকে খানিকক্ষণ দেখে নেওয়া চাই। চেহারাটা সব সময়ই পরিবেশন-যোগ্য থাকবে এমন কোনো কথা নেই—তবু অজিত একটি মুহূর্তের জন্যও যথাসাধ্য ফিটফাট না থেকে পারে না। মেয়েদের সামনে যেতে পুরুষদের এ-দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক। প্রেমে পড়তে সুরু করেই অজিত হয়ত এ-দুর্ব্বলতার হাতে গিয়ে পড়েছিল। এখন ওটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কারো চোখে ভালো লাগাবার জন্যে নয়, ফিটফাট থাকতে নিজের কাছেই অজিতের ভালো লাগে।

টেবিলের উপরকার অভ্যস্ত জিনিষগুলোর উপর এসময়ে তার চোখ পড়েনা—ওদিকে তাকায়ই না অজিত। কিন্তু আজ তাকাতে হল। খামে-মোড়া একটা চিঠির অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিই তার দৃষ্টিকে টেনে নিলো কিনা কে বল্‌বে? অটোসাজেশ্চন্‌? টেবিলের সামনে এগিয়ে এসে নিজেকে দেখবার আগে অজিত চিঠিটাকেই দেখতে পেল।

একটা ছোঁ মেরে তুলে নিল অজিত খামটাকে—এম্নি ক্ষিপ্রতায় যেন আর কেউ এসে ওটা তার আগে তুলে নিচ্ছিল। চিঠিতে নাম নেই। না পড়ে ফেলে দেবার উপায় ছিল না।

"আমরা কালই বোম্বে থেকে আরব সাগর পাড়ি দিচ্ছি। আমি আর আমার করাচির সেই দাদা। মনে পড়তে পারে হয়ত এ-দাদাকে তোমার। দেশে আমাদের ঠাঁই হলোনা বলেই যে পালাচ্ছি মনে করোনা। এটা আমাদের হানিমুন। দুমাস পরে ফিরে এসে ভারতবর্ষেই বসবাস করব। বাংলাদেশেও যেতে পারি। হয়ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে তখন। এক সময় আমাকে ভীরু মনে করে যে ক্ষেপে উঠেছিলে এখন নিশ্চয়ই আর সে ক্ষ্যাপামি নেই—বরং হয়ত ভাবছ ভালোই হয়েছিল। তোমার এই শান্ত নির্বিরোধ চেহারাটা আমি তখুনি দেখতে পেয়েছিলাম—বাইরের এতটা উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও। বাবাকে নিশ্চয় খুসী করতে পেরেছ এবং নিজেও নিশ্চয়ই খুসী হয়েছ এতদিনে? তা যদি হয়ে থাকো তাহলে আমিও খুসী হব।"

অজিত চিঠিটার ভাঁজে ভাঁজে ওটাকে গুটিয়ে এনে হাতে ধরে বাইরের দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ। আরব সাগরের লোণা জলের উপর মন্দারের হাসির ছটার সন্ধান করছে যেন। ড্রেসিং কুশনটার উপর বসে অজিত চিঠিটা আবার খুলে হরফগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে আন্‌ল। যা সে পড়েছে তার চেয়ে আর কিছু বেশি লেখা নেই—অক্ষরগুলোর অন্য রকম

মানে নেই। ষ্টীমারের কেবিন খুঁজে বেড়াচ্ছে অজিত। দেখা হল শেষটায় মন্দারের সঙ্গে। মন্দারের মুখ অদ্ভুত, উজ্জ্বল, বিস্ময়কর। যেন একে চেনে না অজিত। "বাঃ—চেয়ে আছ কি? চিনতে পারছ না?" মন্দার গাঢ়, ভরা গলায় কল্লোলিত হয়ে উঠল। চিনতে পারবেনা কেন অজিত—তবে হঠাৎ চিনতে পারেনি। "আপনিও যাচ্ছেন নাকি?" সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ভদ্রলোক বলে উঠলেন। ষ্টীমারটার মতোই দৃঢ়, ঝকঝকে চেহারা তাঁর। তাঁর কাছে নিজেকে মনে হল অজিতের ছোট—বামনের দেশের মানুষের মতো। সে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না—সরে আসতে সুরু করল এক পা দু'পা করে—তারপর পেছন ফিরে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে। ছুরীর ফলার মতো মন্দারের হাসির টুকরোগুলো তার পিঠে এসে বিঁধছিল। পালাতে হবে তাকে—অন্ধকারে মিশে গা' বাঁচাতে হবে। ভয়ে কাঁপছিল তার পা—তাই যেন দৌড়ুতে পারছিল না।

মেঘের মতো একটা দুঃস্বপ্নের টুকরো চলে গেল অজিতের চোখের উপর দিয়ে। কিন্তু সবটুকুই কি এর দুঃস্বপ্ন? মন্দারের কাছ থেকে কি সে পালিয়ে আসেনি? পালিয়ে এসেছে? অজিতের মনে পড়েনা। বরং মন্দারই ত পালিয়েছে তার ইচ্ছার বেড়ী কেটে দিয়ে। বিশ্বাস হয়না সে-মন্দার ছুটে যেতে পারে করাচি—তারপর তার দাদার সঙ্গে—। অজিতের ভাবনার সূত্রগুলো এখানে এসে ছিঁড়েখুঁড়ে যায়—আর সে এগোতে পারেনা। অসম্ভব—মন্দারকে দিয়ে এ-কাজ অসম্ভব। অজিত আবার চিঠিটা পড়তে চেষ্টা করে। উপরে ঠিকানা লেখা মালাবার হিলের। তবু এমন কি হতে পারেনা যে এর আগাগোড়াই বিদ্রূপ? বিদ্রূপ করাটাই মন্দারের পক্ষে স্বাভাবিক—বিদ্রোহ করা নয়। যতটুকু অজিত জানতে পেরেছে—মন্দার পুরোদস্তুর সিনিক। ভয় আর ভীরুতা

যখন ইচ্ছাকে চেপে মেরে ফেলতে থাকে—ভীরুতাকে সম্বল করেই যখন বাঁচতে হয়—সিনিক না হলে তখন আর মুখরক্ষা করা যায়না। কিন্তু সত্যি-সত্যি কি নন্দার তাই? নন্দারের কথাগুলো মনে করতে থাকে অজিত—শেষ দিনের কথাগুলো। আচ্ছন্ন মন নিয়ে নয়—কথার স্পষ্ট পরিষ্কার মানে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করল সে। "না পালিয়েও ত আমরা বিয়ে করতে পারি!"—এম্নি কোনো কথা বলেছিল কি নন্দার? হয়ত বলেছিল। সে কথার কি যে উত্তর দিয়েছিল অজিত মনে নেই। উত্তর কিছু দিতে পেরেছিল কি না তা-ই বা কে বলবে?—উত্তর কি সে দিতে পারত? কে জানে?

গীতা ঘরে আসে। অজিতের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সজাগ ছিল—পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারে কারু উপস্থিতি। চিঠিটা হাতের মুঠোয় দুমড়ে ফেলে পেছনে তাকায় অজিত। গীতার ঠোঁটে হাসির একটা পুরোণো স্মৃতির মতোই হাসি লেগে আছে। অজিত উঠে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে ট্রাউজারের পকেটে চিঠিটা সমর্পন করে হাত তুলে সে টাই খুলতে থাকে। গীতা এগিয়ে এসে জানালার কাছে দাঁড়ায়—অস্পষ্ট রেখায় মুখের একটু মাত্র অংশ দেখতে পায় অজিত। পোষাকের বাঁধাছাঁদা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনবার পরও অজিত কোনো কথা বলতে পারেনা। ভেতরের বারান্দার দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে অজিত এসে গীতার পাশ ঘেঁসে দাঁড়ায়।

"হঠাৎ আজ এলে যে এ সময়ে?" অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করে অজিত।

"এলুম।" গীতা চোখদুটো অসহায়ের মত করে তোলে।

"আজ থেকে আসবে রোজ এম্নি সময়?" অনুনয়ে যেন ক্ষতিপূরণ

করবার আবেগ ফুটে উঠল। অনেকক্ষণ অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে মাথা হেলিয়ে আনে গীতা।

"কথা বল্‌তে চাওনা কেন আমার সঙ্গে তুমি ?" গীতাকে জড়িয়ে ধরে অজিত।

"বলিত !"

"ছাই বল !"

"কি বল্‌ব ?"

"অনেক কথা—আবোলতাবোল, যা খুসী।"

একটু হেসে গীতা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অজিতের সমস্ত শরীরের উত্তাপ কেমন যেন হিম হয়ে আসে। জানালা থেকে দেয়ালের দিকে সরে আসতে চায় গীতা—অজিতও তার হাতটা তুলে নিয়ে সরে দাঁড়ায়। তারপর দরজাটা খুলে দিয়ে এসে আলনা থেকে ক্লান্ত হাতে তোয়ালেটা টেনে নেয়। অগাধ ক্লান্তি। আরব সাগরের কোনো ঢেউ তাকে মুছে দিতে পারেনা। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে অজিতের—তাড়াতাড়ি স্নান সেরে অবনীবাবুর কাছে গিয়ে তাকে বস্‌তে হবে। এতক্ষণে হয়ত তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন।

চব্বিশ

অসিতের দিকে চেয়ে থেকে মনে হচ্ছিল দীপকের অবিরতই যেন সে একটা অস্থিরতার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। অস্থিরতাটাই ওর স্বাভাবিক অবস্থা—ওটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে নিস্তেজ হয়ে থাকতে চায় সে। সাতটা থেকে মদ খেয়ে চলেছে অসিত—এখন ন'টা। এখন আর মাথাটা সোজা করে তুলে ধরতে পারছেনা—এ অবস্থায় পৌছবার জন্যেই এতক্ষণ যেন প্রাণপন করছিল। মুখ টিপে টিপে হেসে চল্‌ছিল ও—সাফল্যের হাসি। নেলী এখনো ফেরেনি—মার্কেটিং-এ গেছে। অন্তত যাবার সময় তা-ই বলে গেছে সে। ফিরে এলেও অসিতকে দেখে একটু ফিকে হাসি আস্‌বে তার ঠোঁটে—দীপককে বল্‌বে: "Sorry Dipok, had a lot of troubles all this time!" আর সে দাঁড়াবে না—হাতের মোড়কগুলো নিয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌বে। ঘাড়টা নেড়ে নেড়ে বিড়বিড় করবে অসিত তারপর নেলী চলে গেলে মুখটা তোলবার চেষ্টা করতে করতে হয়ত বল্‌বে: "কি বল্লে ও?"

"ভয় নেই—হিন্দু স্ত্রী নয়—বাপের বাড়ি চলে যাবেনা।" দীপককে বল্‌তে হবে।

"যা বলেছিস্ দীপক—ওরা মাইণ্ড করেনা। • তাই আমায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে হোটেল ঢুঁড়তেও হয়না—মস্ত সুবিধে!"

এসব কথা আর এ-দৃশ্য দীপকের মুখস্ত হয়ে গেছে। তাই একটু আগে অসিতের মুখে হঠাৎ বেসুরো একটা কথা শুনে চমকে উঠেছিল

সে। টেবিলের উপর কীল চড়িয়ে দিয়ে বলে উঠেছিল অসিত :
"Blood-sucking Bug—"

কে এই রক্তশোষা জন্তু? ভেবে চলেছিল দীপক। কে? অসিতকে জিজ্ঞাসা করবার আগে প্রশ্নটা দিয়ে সে নিজের মনকেই খোঁচাতে সুরু করেছিল।

হিংস্রতা নয়, একটা ভয় চম্‌কে উঠেছিল অসিতের চোখে।

"কে?" গ্লাস আর বোতলের ঝন্‌ঝনানি থেমে এলে জিজ্ঞাসা করেছিল দীপক।

"নিশ্চয় কেউ—জানিস্ দীপক, আমি বুঝতে পারছি—আমার সমস্ত রক্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছে!"

"সেই অশরীরী সিরিঞ্জটা কার?" দীপক একটু হাল্কা হতে চেয়েছিল।

"জানিনে—" একটা বিরাট চুমুকে নিজকে শান্ত করে আন্‌ল অসিত।

"জানিস্‌নে অথচ তোর রক্ত খেয়ে চলেছে—এমন অশরীরিদের আবির্ভাব ত এ যুগে হয়না!"

"হয়। কিন্তু যাকগে। এক ফোঁটাও ছুঁবিনে তুই?"

"আর কেন?"

"কারু গা' ছুঁয়ে দিব্যি করিসনি ত!"

"তেমন পবিত্র শরীর আমার বরাতে জুটবেনা।"

"অশুচি না হয় শুচি করে নিবি—এতটা শুচিবাই নিয়েও তা পারবিনে?"

"শুচিবাই দিয়ে কিছু করা যায়না—ওটা নিজেই একটা এফেক্ট—'কজ্' হবার মতো গুণ নেই ওর।"

"তা হলে তুই ফল্‌তে সুরু করেছিস্—"

"কাজেই—যখন ফলাতে পারিনে।"

"আমাকে ফলিয়েই ঘাবড়ে গেলি ?" অসিত উদারভাবে হেসে উঠল। "আমার চেয়েও আমার কীর্ত্তি যখন মহৎ হয়ে যায় তখন না ঘাবড়ে উপায় কি বল !"

"দীপক—তুই একটা কম্‌প্লেক্সে-এ ভুগ্‌ছিস্‌—আমি জানি—হ্যাঁ ঠিক জানি—ওটা তোর একটা কম্‌প্লেক্স—তুই ভাবিস তোর জন্যেই আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি ! হুঁ, তোর কি এতই শক্তি ছিল মনে করছিস্‌ ?"

"মদ খেলে দিব্যজ্ঞান হয় জান্‌তুম না। আমার মনটাকে তুই স্পষ্ট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিস্‌, না ?"

"লুকোবে কি করে বাবা ! অনুতাপ পর্য্যন্ত সুরু করে দিয়েছ তা কি আর বুঝিনে ! দুমাস হয়ে গেল টাকা-টা ফিরে চাইলে না। দু দু'শো টাকা— দশ-পাঁচ নয়। আর চাইলেও দিতে পারতুম না কি ?" একটা ঢেঁকুর তুলে অসিত কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নাড়তে থাকে: "একটি কানা কপারও নেই !"

তারপর বোতলটার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে নিয়ে অসিত অনর্গল মদ খেতে সুরু করে—পুতুলের মতো বসে থাকে দীপক—প্রতীক্ষা করে কখন ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে।

অসিত নিস্তেজ হয়ে পড়ে একসময়। দীপকের ইচ্ছা হয় ওকে ফেলে রেখে চলে যেতে। তবু যায়না। নেলী আসুক।

"নেলী চলে যেতে চায়—জানিস দীপক ?" স্বপ্নের ঘোরে অসিতের মুখ থেকে যেন একটা কথার ধমক বেরিয়ে আসে।

"কোথায় ?"

"লণ্ডন। তিন মাসের জন্যে অবিশ্যি—দেশটা দেখবার ইচ্ছা হয়েছে। ইচ্ছা হয়না ?"

"তুইও যাচ্ছিস তাহলে ?"

"নো—নেভার—পয়সা কোথায় ?"

"নেলীর জুটলে তোর জুটবেনা ?"

"নেলীকে আমি দিচ্ছি—কিন্তু আমাকে দেবে কে ? দিবি তুই ? না থাক্—ও টাকাটাই তোকে দেওয়া হয়নি।"

"অফিস থেকে নিয়ে নে—"

"দিতে চায়না শালারা। তিন শ টাকা মাসের শেষে দিতেই বুক জ্বলে যায় শালাদের। অথচ কাঁড়ি কাঁড়ি অর্ডার আর টাকা আস্‌ছে !" টেবিলটার উপর হাত রেখে অসিত মাথা গুঁজে দেয়।

দীপক চুপ করে তার দিকে চেয়ে থাকে কতক্ষণ। তারপর বলে : "আত্মহত্যার কোনো মানে হয়, অসিত ?"

"আত্মহত্যা—" হিক্কার মত করেই মাথা না তুলে বলে যায় অসিত।

"ওটা নেহাত একটা পচা সেন্টিমেণ্টের-এর হাতিয়ার। চারদিকের রূঢ়তায় সে হাতিয়ার একেকসময় হাতে তুল্‌তে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে ইচ্ছাকে যদি শাসন করতে না পারো তাহলে সুস্থ হয়ে বাঁচবে কি করে ? জানি সেন্টিমেণ্ট-কে ছেড়ে দিয়েও মানুষ বাঁচতে পারেনা—কিন্তু শুধু তাকে নিয়ে মেতে উঠলেও বাঁচা যায়না। আমরা হয় মরুভূমিতে হেঁটে চলেছি, নয় ত জলে ভেসে যাচ্ছি—তাই জীবন দুর্ব্বহ আর পৃথিবী দুঃসহ হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে।" ধর্ম্মযাজকের উপদেশের মতো সমস্ত ঘরটায় প্রতিধ্বনি তুলে দীপক কথাগুলো বলে চুপ করে গেল। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। কিচেন থেকে বয়ের নড়াচড়ার খুটখাট একটু শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যায়। আবহাওয়াটা অদ্ভুত লাগতে লাগল দীপকের। নিজেকেই কি সে এতক্ষণ এ কথাগুলো শোনাচ্ছিল ? অসিত ঘুমুচ্ছে ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলে ঘুমুচ্ছে। অসিতের ক্লান্ত সত্তা হয়ত ঘুমের

আশ্রয়েই খানিকটা শান্তি পায়। অবিরত যুদ্ধ করে যাচ্ছে অসিত—কোনো এক দুর্ব্বল সত্তা তার কঠিন-কঠোর সত্তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে—ক্ষতবিক্ষত হয়েও তা মরেনা, অভিশাপের মতো একটা ছায়াময় শরীর নিয়ে পেছনে চল্‌তে সুরু করে!

দীপক উঠে বয়কে খুঁজতে যায়। জানিয়ে যায় বয়কে সে চলে যাচ্ছে, সায়েব একা আছেন।

রাস্তায় এসে দীপক হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চায়। সহরের উজ্জ্বলতায় সে ফিরে এলো। গাড়ীর ভীড়, লোকের ভীড় কমে এসেছে তবু ঝক্‌ঝক্‌ করছে সহরের মূর্ত্তি। দীপক সম্মোহিতের মতই হাঁটতে সুরু করল কিন্তু তারও পেছু নিয়েছে কিসের যেন একটা ছায়াময় শরীর। Blood sucking Bug! মাথার ভেতরে প্রশ্নটা আবার ফিরে এলো দীপকের। কে নিয়ে যাচ্ছে অসিতকে অকালমৃত্যুতে টেনে? নেলী? স্ত্রীকে পাশে সরিয়ে দিয়ে নেলীকে অসিত চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে মাত্র—তাকেও পাশে সরিয়ে দেবার ক্ষমতা তার আছে। নেলী তার তত বড় শত্রু নয়। দীপক নিজেই কি? হয়ত নয়। অসিতের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে সে। অসিতের প্রয়োজনেই তাদের দুজনের এখন দেখা হয়—অসিতের নিঃসঙ্গ ভারি আবহাওয়াটা একটু হাল্কা করে দিতে চেষ্টা করে দীপক। অসিতকে দিয়ে দীপকের কোনো দরকার নেই! তাহলে আর কে? অসিতের স্ত্রী? হতে পারে। অবনীবাবু কি? হয়ত তিনিই। তিনি। চীনাদের, জাপানীদের জীবনের দিকে যেম্নি সজাগ চোখে চেয়ে থেকে তাদের মৃত পূর্ব্বপুরুষরা, অবনীবাবুও হয়ত তেম্নি চেয়ে আছেন অসিতের দিকে। ঘৃণায়, আক্রোশে তাঁর চোখ লাল। সেই রক্তচক্ষুই অসিত অনুভব করছে তার রক্তে—আর তার রক্ত শুকিয়ে উঠছে। তা-ই হয়। নিজেকে আলাদা করে নিয়ে বাঁচতে

পারছেনা কেউ—হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগে অপরের সঙ্গে গিয়ে মিশতে পারছেনা। সব জবরদস্তি। অসহ্য বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া! ঘাড় থেকে সে বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিলেই আপদ চুকে যায়না—সমস্ত জীবন তার অদৃশ্য ভারে দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। আমাদের ছোট ছোট জীবনেরই যে শুধু এই ট্র্যাজেডি তা নয়। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আজ সভ্যতার দেওয়া কতগুলো অসুস্থ বন্ধনে আর বোঝায় জর্জ্জরিত। জগদ্ব্যাপী বৃহৎ একটা ট্র্যাজেডিরই অণুপরমাণু অংশ আমাদের জীবনে বয়ে বেড়াচ্ছে। একা আজ মুক্তি চাইলেই কি আর মুক্তি আসবে? মুক্তি পাবে অসিত? অসম্ভব।

চৌরঙ্গী। দীপক দাঁড়িয়ে যায়। লাইটপোষ্টে আর হোটেলে বাল্‌বগুলো অত্যন্ত উদাসীনভাবে উজ্জ্বল। কোনোদিন তাতে একটু ছায়া ঘনিয়ে এলোনা। এই নির্বোধ উজ্জ্বলতা ভালো লাগে দীপকের। এখনো ভালো লাগে। অন্ধকারকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে সমস্ত রাত্রি আলোগুলো জ্বলতে থাকে—যে অন্ধকারে মানুষ হয়ত নিজেদের খুঁজে পায়: ব্যথাকে ডুবিয়ে দেয় মদের গ্লাসে কেউ, ব্যথাকে ছাপিয়ে কারো রক্তে ওঠে জীবনের ধ্বনি, ব্যথা জেগে উঠে গলিয়ে দেয় কাউকে হয়ত কান্নায়, কেউবা ব্যথিত হৃদপিণ্ডে শুনতে পায় মৃত্যুর পদধ্বনি। ব্যথা মানুষের জন্যে কেবলি ব্যথা জমে আছে রাত্রির স্তরে স্তরে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় তারই বিবর্ণ স্পর্শ এসে যেন লাগে দীপকের শরীরে। নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দীপক। কিছুই সে করতে পারেনা চৌরঙ্গীর রাত্রির মতই উদাসীন চেয়ে থাকতে পারে। উজ্জ্বল হয়ে উঠতেও বা ক্ষতি কি? স্মৃতি থেকে কতগুলো রাত্রিকে তুলে এনে চোখের উপর সাজিয়ে ধরে দীপক। সেসব রাত্রির দীপককে নিয়েও ক্ষতি ছিল না পৃথিবীর—আজকের এই দীপককে নিয়ে যেমন তার লাভ নেই।

দুতিনটা ফিটনওয়ালা দীপকের কানের কাছে গুণ্ গুণ্ করে গেল। চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল দীপক কিন্তু বুকের ভেতর কোথায় কোন্ সমুদ্র-সৈকতে যেন আছড়ে পড়ছিল ঢেউ-এর পর ঢেউ। তারও কি এলো মৃত্যুর জন্যে অস্থিরতা? অসিতের মতো সে-ও কি শুধু নিজেকে হত্যা করে করেই পেতে পারে শান্তি? তার জন্যেও কি আলোহাওয়ার একটু পৃথিবী নেই? অনেকদূর ঘুরে সুরুতে ফিরে এসেই কি শেষ হবে তার চলা?

একটা ছায়া এগিয়ে আসছিল। নিঃসঙ্গতায় অস্থির হয়ে উঠেছে দীপক। প্রখর দৃষ্টি দিয়ে সে-ছায়াকে বিঁধতে চেষ্টা করল।

দীপকের সামনে এসেই থেমে গেল মেয়েটি—রাস্তার ওধারে অর্থহীন-ভাবে একবার তাকাল।

ওর কাছে এগিয়ে গেল দীপক।

"যাবে?" অভ্যস্ত, সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল দীপক।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে মেয়েটি। কথা বলে উত্তর দেবার মতো নিঃসঙ্কোচ এখনো হয়ত হতে পারেনি ও। মুখে পাউডারের সঙ্গে স্নিগ্ধতাও আছে, কেবল রুক্ষতা নয়।

ওধারে ট্যাক্সিষ্ট্যাণ্ডের কাছে এগিয়ে গেল ওরা।

"লেক—" ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে দীপক। হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল ট্যাক্সিওয়ালা। মেয়েটি উঠ্ল, তারপর দীপক।

হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চল্ল ট্যাক্সি। চৌরঙ্গী তার লাইটপোষ্টের আলোগুলো যেন দীপকের চোখেমুখে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। আলো। অনেক অন্ধকারের পর আলোর এ উষ্ণতা। দীপকের রুক্ষ দেহ নরম উষ্ণতায় স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

"তোমার নাম কি?"

"যমুনা—যমুনা মুখার্জ্জি—"

"কোথায় থাকো ?"

"বাড়িতে।"

"বাড়িতে ত সবাই থাকে!" ঠোঁট দুটো হাসিতে বাঁকিয়ে তুলল দীপক।

"বালিগঞ্জে—"

"হুঁ। আর কে আছে বাড়িতে ?"

"মা—ছোট দুভাই, একটা বোন ছোট।"

"বাবা ?"

"মারা গেছেন—তিনবছর।"

"তারপরই তুমি চৌরঙ্গীতে ?"

চুপ করে রইল যমুনা। উড়ন্ত আঁচলটা বুকের উপর জড়িয়ে আন্‌ল।

"এ গল্প অনেক শুন্‌তে পাওয়া যায় আজকাল—তা জানো ?" কাৎ হয়ে দীপক যমুনার মুখের দিকে তাকাল।

"আমাদের খাবার আর উপায় ছিলনা।" শুকনো খরখরে গলায় বল্‌লে যমুনা।

"সবাই তা-ই বল্‌তে শিখেছে।"

"আমার ত বলবার দরকার ছিলনা। আপনি জিজ্ঞেস করলেন তা-ই বল্‌লুম।"

যমুনার গলায় চম্‌কে উঠল দীপক। এ-গলা অন্যরকম—একটু অন্য রকম শোনাচ্ছে। দীপক চুপ করে গেল। ভবানীপুর পার হয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সি। দুজানালায় চেয়ে আছে ওরা দুজন। চুপচাপ। দীপক অনুভব করছিল তার শরীর থেকে উত্তাপের পরমাণুগুলো ঝরে ঝরে যেন হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে। কান্নার মতো কি একটা শব্দ এলো তার কানে। কাঁদছে নাকি যমুনা ? দীপক ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল যমুনার দিকে।

"কি ?" যমুনা হাস্‌ছে।

যমুনা হাস্‌ছে ! কিন্তু হাসিটা কুৎসিত লাগলনা দীপকের চোখে। যমুনা তার হাসিকে এখনো কুৎসিত করে তুল্‌তে পারেনি।

রাসবিহারী এভিন্যুর মোড়ে গাড়ি থামাতে বল্‌লে দীপক। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে যমুনাকে ডাকলে : "এসো"—যমুনা নেমে এল। তার হাতে একটা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে দীপক বল্‌লে : "বাড়ি যাও।"

টাকাটা নিয়ে যমুনা কি করছে তা দেখবার জন্যেও দীপক আর দাঁড়ালনা—ট্যাক্সিতে উঠে চালাতে বল্‌লে আবার। লেকেই যাবে ট্যাক্সি। এই নাটকীয়তার জন্যে নয়—এম্নিতেই উত্তাপ ছিল দীপকের গায়ে। যমুনার পাশে বসে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল দীপক—তবু কি পুরোপুরি জুড়িয়ে যাওয়া যায় ! স্বাভাবিকতায় ফিরে আস্‌তে লেকের হাওয়া দরকার—প্রচুর হাওয়া। রুমালে মুখটা মুছে নিলে দীপক। হিমালয় বোকের মৃদু সুগন্ধ নেই রুমালে—লণ্ড্রির ভুষো গন্ধ।

একটা সিগারেট খুলে আঙুলে তুলে নেয় দীপক। চেয়ে থাকে সিগারেটটার দিকে। হাড়ের মত দেখায় ওটা—হাড়—সাদা শক্ত হাড়। "I am pure like a bone—" লাইনটা মনে পড়ে। কোথায় যেন পড়েছিল দীপক। কোথায়—কোথায় ?

পঁচিশ

এ সময়টাতেই অবনীবাবু একটু ঘুমুতে চেষ্টা করেন। ডাক্তার বলেছেন যখনই হোক ঘুমোনো ভালো। গল্প করতে কেউ আর এখন আসেন না। তাতে অবনীবাবুর খারাপ লাগে না—ক্লান্ত মন তাঁর বাইরের উৎপাত সহ্য করতে পারবে না; খেয়ালমাফিক মন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, এদিক-ওদিক ঘুরে আসে কতক্ষণ, অবনীবাবু তাতে অস্বস্তি বোধ করেন না। তাঁর শরীর, ক্ষীয়মাণ স্নায়ু আর নির্জীব ধমনী তার বেশি পরিশ্রম করতে নারাজ।

দরজা আর জানালায় নীল পর্দাগুলো টেনে দিয়ে গেছেন মনোরমা। তাঁরও হাত-পা ক্লান্ত, সেই ক্লান্তি অফুরন্ত ঘুমেও ফুরোতে চায় না। মনোরমার সমস্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চায় সব সময়।

নীল্‌চে মুমূর্ষু আলোর দিকে চেয়ে থেকে দু-এক মিনিটের জন্যে হয়ত চোখ বুঁজে আসে অবনীবাবুর—কিন্তু তখনো তিনি বুঝতে পারেন মন তাঁর ঘোরাফেরা করছে। চোখ মেলে দেখেন সত্যি তাই। কতগুলো দরজার সামনে হেঁটে আসে তাঁর মন। একটা দরজা বন্ধ অনেকদিন থেকে বন্ধ—এখন আর তাই সেখানে উঁকি দিতে ছুটে যায় না। কিন্তু সুপ্রিয়ার দরজা খোলা। মুখের চামড়া কুঁকড়ে গেছে, দাঁতগুলো মাড়ি থেকে খসে আস্‌তে চায়, হাত-পায়ের চামড়ায় রগগুলো ফেঁপে আছে—সুপ্রিয়া পূজার আসন থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। চোখের কোটর বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কি তার? কথা বল্‌তে চায়—বলেও কি যেন। শুনতে পান না অবনীবাবু—ফাঁকা-ফাঁপা আওয়াজ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

সত্যি ও কি সুপ্রিয়া—না কোনো ছায়া? রক্ত-মাংস উড়ে গেছে কোথায়! হাল্কা, ছায়ার শরীরেই তার সাপের মত কুঁক্‌ড়ে উঠ্‌ছে ঘৃণা—চক্‌চক্‌ করে উঠ্‌ছে চোখ ক্রুদ্ধ আক্রোশে। অবনীবাবু পালিয়ে আসেন।

পালিয়ে আসেন সুনন্দার রুগ্ন শিয়রে। মৃত, বিষণ্ণ চোখে তাকাল সুনন্দা। চোখ আছে কি? চোখের কোটরটাই বুঝি হাঁ করে আছে অবনীবাবুর দিকে। পচে, ক্ষয়ে, ঝরে গেছে সুনন্দার মাংস—বিছানায় সুনন্দার কঙ্কাল নড়ে চড়ে উঠ্‌ল। ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ। শীতের হাওয়া লাগ্‌ল অবনীবাবুর দুর্ব্বল শরীরে—ঠক্‌ঠক্‌ কেঁপে উঠ্‌ল সে-শরীর।

শব্দ। শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছেন অবনীবাবু। হাতুড়ির আওয়াজ। কারখানার আওয়াজ। ম্লান হয়ে আস্‌ছে যেন সে-আওয়াজ—চলে যাচ্ছে দূরে। অস্পষ্ট, অত্যন্ত অস্পষ্ট। তারপর আর শোনা যায় না। শুন্‌তে পাচ্ছেন না অবনীবাবু। রমেশবাবু শুন্‌তে পাচ্ছেন কি? শুনবার তাঁর চেষ্টাই নেই। ভীতু মুখটা তাঁর হঠাৎ পাথরের মতো হয়ে গেল। পাথরের একটা নৃসিংহ মূর্ত্তি দেখেছিলেন একবার অবনীবাবু—ঠিক তেম্নি। বড় বড় ঠোঁটগুলো ক্রূরতায় তেম্নি বাঁকানো। স্নায়ুর অসুখ না কি ছিল রমেশবাবুর—কোথায়? হাত-পা-ঘাড় ত তাঁর কাঁপছে না। নখ দিয়ে আঁচড় কাটছেন তিনি কারখানার দেয়ালে—গভীর দাগ পড়ছে। খসে পড়ছে—চূণ, বালি, ইঁট—হয়ত ধ্বসে পড়বে দেয়াল। রোগা, দুর্ব্বল হাত বাড়িয়ে রমেশবাবুকে ধরতে সাহস পান না অবনীবাবু। চোখের সামনে তাঁর ফার্ণেসের চিমনি চৌচির হয়ে গেল—ছিঁড়ে পড়ে গেল ক্রেনের ট্রলি—গলিত লোহার আগুন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল চারদিকে। আর্ত্তনাদ করবারও কণ্ঠ নেই অবনীবাবুর—হৃদ্‌পিণ্ডটা উপরের দিকে ঠেলে উঠে কণ্ঠনালী যেন রুদ্ধ করে দিয়েছে।

চম্‌কে চোখ মেলে তাকান অবনীবাবু। ঘাড়ে ঘামের স্রোত বয়ে

যাচ্ছে। ঘরের ফিকে নীল আভাটা বুলিয়ে নেন চোখে। বিষণ্ণতার মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসে চোখ। ফতুয়াটা ভিজে উঠেছে—গা থেকে খুলে চেয়ারের হাতলে রেখে দেন ওটা। বুকের উপর কয়েকখানা সাদা হাড়—হাড়ের সাদা রং স্বচ্ছ চামড়ার উপর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন। নিষ্প্রাণ নীল আভায় মৃত্যুর হাত যেন তাঁকে ছুঁয়ে গেল। দেয়ালে দেয়ালে অবনীবাবুর চোখ যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। নেই এখানে রমেশবাবু। সত্যি কি রমেশবাবু মূলার কোম্পানীর কাজটা ক্যালকাটা ষ্টীল কোম্পানীর কাছে বেচে দিয়েছেন? কয়েকটা টাকার জন্যে? অজিত বল্‌ছিল—শুক্‌নো, অসহায় মুখে অজিত এখানে দাঁড়িয়ে বলে গেছে সে-কথা।

আধ-বোঁজা চোখে অবনীবাবু দেয়াল থেকে অজিতকে খুঁজে খুঁজে বার করতে চান। তার সেই সাদা, ফ্যাকাসে মুখটা এখানেই কোথাও পাওয়া যাবে। সে-মুখে রক্ত নেই, প্রাণ নেই—কোথায় যাবে সে? এ-ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় অবনীবাবু তাকে আটকে রেখেছেন—তাঁর হাড় দিয়ে ছুঁয়েছেন অজিতের শরীর—রক্তমাংস সে-শরীরে থাক্‌তে পারে না। বাঁচতে দিলেই ত মৃত্যু এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়—কঙ্কালের মৃত্যু নেই।

কঙ্কালেরা অবনীবাবুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—সুপ্রিয়া, সুনন্দা, অজিত। ওরা কথা বলে না—হাওয়ার শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে শুধু। দীর্ঘ, অফুরন্ত নিশ্বাস। নিশ্বাসের পাথর স্তরে স্তরে জমে উঠেছে অবনীবাবুর বুকের উপর। ধুক্‌ধুক্‌ করে না আর হৃদ্‌পিণ্ড। মৃত্যুর ঠাণ্ডা ছোঁওয়ায়, মনে হয়, তিনি ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছেন। বাঁচতে চান হয়ত এখনো তিনি—কিন্তু কোথায় জীবন? চারদিকে কোথাও নেই জীবনের একটু ক্ষীণ স্রোত। জীবনকে তিনি চাননি। চাননি তাঁর চারদিকে জীবন বেঁচে থাক।

একটি ফোঁটা রক্তও কি তাঁর বেঁচে থাক্‌বে না? বাঁচতে কি পারল

না কেউ? অসিত? বাঁচতে কি পেরেছে সে? সমস্ত হৃদয় দিয়ে অবনীবাবু বলে উঠ্‌লেন—বাঁচতে যেন পারে অসিত। কোনো ইচ্ছা, কোনো কামনা আর তাঁর নেই—শুধু বাঁচতে পারুক অসিত। নিজের প্রাণশক্তির কাছে নইলে কি উত্তর তিনি দেবেন? কি বলবার আছে তাঁর জীবনের কঠোর প্রশ্নের উত্তরে? কিন্তু তাঁর মৃত্যুহিম ছোঁওয়া থেকে পালিয়েও যদি বাঁচতে না পারে অসিত? মুমূর্ষু রক্তের সন্তান যদি মৃত্যুর কোলেই জন্ম নেয়—যদি জন্ম নিয়ে মৃত্যুকেই খুঁজে বেড়ায়, কি করবার আছে তাঁর তখন? একটা কামনা—শুধু একটা ইচ্ছা দিয়ে কি তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পারেন অসিতকে? তবু এই দুর্ব্বল সম্বল ছাড়া ত আর কিছুই তাঁর নেই। আর কিছু নিয়েই ত তিনি প্রার্থনা জানাতে পারেন না। এ প্রার্থনা শুনে জীবন কি তাঁকে ক্ষমা করবে? ক্ষমা পাবেন তিনি আত্মার কাছে, রক্তের কাছে?

আবার চোখ বুঁজে আসে অবনীবাবুর। নীল আভায় চোখের কোটরের কোণগুলো চিকচিক করে ওঠে।

সমস্ত দিন অপিসের চেয়ারে বসে আছে অজিত—ওর যেন নড়বার শক্তিও ছিলনা। কোনো সূত্র ধরে অনেকক্ষণ ভেবে যেতেও পারছিলনা তার মন—চিন্তার ছবিগুলো জড়িয়ে এলোমোলো হয়ে যাচ্ছে। চিন্তা সে আজকাল করতে চায়না—প্রতিজ্ঞা করে—ঘটনার অতি বড় সংঘাতেও মনকে ফুলে ফেঁপে উঠ্‌তে দেবে না। কিন্তু দেখা যায় সুরক্ষিত হতে গিয়েই যেন মন তার বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়ে। গীতার দেহের প্রত্যেকটি ইঙ্গিতে বা ইঙ্গিতের অভাবে মনে তার তোলপাড় করে ওঠে চিন্তার ফেনা—টেবিলের উপর পেপার ওয়েটটা ঠিক জায়গায় না দেখ্‌লে অজস্র অসংখ্য কথা ভেবে শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ে অজিত। সাবধানী হতে

গিয়ে সে স্নায়ুগুলোকে যেন সূক্ষ্মতম অনুভূতিতে চঞ্চল হয়ে উঠতে শেখাচ্ছে। রোগীর শরীরের মতো তেতো হয়ে যাচ্ছে তার শরীর দিনদিন।

অনেক দৌড়ুদৌড়ি দেখিয়ে চারটার সময় ব্যস্ত গলায় এসে বল্‌লেন রমেশবাবু: "সাংঘাতিক শক্ত। একটু নরম হতে চায় না।"

"কি ওরা চায় কিছু বল্‌লে?" নিষ্প্রাণ গলায় জিজ্ঞাসা করে অজিত।

"চায়! চায় ত কতই। তাই বলে সব দিতে হবে না কি!"

"তাহলে একটা নতুন ব্যাচের খোঁজ করুন—আপনার খোঁজে আছে না কি বলেছিলেন।" অজিতের কথাগুলো মিনতির মত শোনায়।

"সে ঠিক হয়ে যাবে—তুমি ভেবোনা।"

"কালই যাতে কারখানা চলে সে-ব্যবস্থা করবেন না?"

"দু-একদিন যাক্ না—নতুন কাজ ত তেমন নেই—আমরা জলে পড়িনি!"

অজিত আবার কতগুলো এলোমেলো ভাবনায় ডুবে যায়। রমেশবাবুর মুখে দুশ্চিন্তার বাষ্পও লেগে নেই—ওঁর হাতে পায়ে বরং আগেকার চেয়ে বেশি শক্তি দেখা যাচ্ছে। এও কি ওঁরই কীর্তি? কে বল্‌বে! জানবার মত ইচ্ছা নেই অজিতের—সাহসই নেই হয়ত। গেটের বাইরে গিয়ে মজুরদের সঙ্গে একটা কথাও সে বল্‌তে পারবেনা, চাইতে পারবে না তাদের চোখের দিকে। রমেশবাবুই যাচ্ছেন, তিনিই কথা বল্‌ছেন—মিটমাট করতে হয় তিনিই করুন।

"যা করবার করুন তাঁহলে।" স্তিমিত কণ্ঠে কথাটা বলে' অজিত দাঁড়িয়ে যায়।

"করবার আর নেই কিছু—মানে ওদের সঙ্গে মিটমাট আর হবেনা—"

"আমি বাড়ি যাচ্ছি—জরুরী দরকার মনে করলে টেলিফোন করবেন।" স্থির হয়ে দাঁড়াতেও পারছিলনা অজিত।

পেছনের গেট দিয়ে অজিত বাইরে বেরিয়ে এলো। গাড়ি আনা হয়নি। বাড়িতেই থাকে এখন গাড়ি—অবনীবাবুর জন্যে কখন কি দরকার পড়ে তাই। ট্র্যামেই যেতে হবে। অজিত হাঁটতে সুরু করে। মনে হয় সে পালাচ্ছে। চুরি করে নয়। চুরি করেছিল বলে।

•

পর্দা সরিয়ে চোরের মতই অবনীবাবুর ঘরে এসে ঢুকে পড়ে অজিত। তার কানের পর্দায় অবিরত কে যেন হাতুড়ি পিটে চল্‌ছিল—ষ্ট্রাইক—ষ্ট্রাইক চলেছে তাদের কারখানায়! ট্র্যামের চাকা থেকে এতক্ষণ যেন এই একটা শব্দের ধ্বনিই উঠে আসছিল—ষ্ট্রাইক! কলকাতার রাস্তার বিচিত্র শব্দগুলো জুড়ে গিয়ে গিয়ে এই একটা ধ্বনিই তৈরী করে চলছিল যেন—ষ্ট্রাইক! হিম হয়ে এসেছে অজিতের রক্ত—অন্ধকারের পর অন্ধকারই এসে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে।

আশ্রয় নিতে এলো কি এ-ঘরে অজিত? কেন যে এসেছে তা যেন মনে করতে পারছিল না। বল্‌তে এসেছে কি অবনীবাবুকে ষ্ট্রাইকের কথা? ষ্ট্রাইক—মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করতে চাইল অজিত। জোরে কথা বলবার শক্তি আছে তার? নেই। অবনীবাবুর কানে কথাটা পৌঁছিয়ে দিতে পারবেনা সে।

তবু এগিয়ে এলো অজিত অবনীবাবুর কাছে। অনেক কাছে। পিরামিডের নীচে মিশরের কোনো এক মৃত রাজার মমির কাছে। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে পারত অজিত। কিন্তু কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ তার হয়ত বেরিয়ে আস্‌বেনা। দৃষ্টিকে প্রখর করে সে চেয়ে রইল অবনীবাবুর চোখের কোটরের অন্ধকারের দিকে।—অন্ধকারে কোথাও কি জলের রেখা

চিক্‌চিক্ করছে? চেয়ে রইল অজিত অবনীবাবুর বুকের উঁচুউঁচু সাদা হাড়গুলোর দিকে।

অনেকক্ষণ পর অজিত দেখতে পেল অবনীবাবুর কণ্ঠনালীতে ধুকধুক করছে একটু প্রাণ। বেঁচে আছেন তিনি। পেছন ফিরে দাঁড়াল সে—ভয়ে ওদিকে আর তাকাতে পারছিলনা। একটু শব্দেই হয়ত সে প্রাণস্পন্দন থেমে যাবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অজিত—কানে তার অবিরত হাতুড়ির আওয়াজ চল্‌ছে—ষ্ট্রাইক, ষ্ট্রাইক।